আমার একাত্তর

আনিসুজ্জামান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

ধীমান অধ্যাপক, মননশীল প্রাবন্ধিক, সমাজহিতৈষণায় নিবেদিত সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব আনিসুজ্জামান অনুপম কুশলতায় লিপিবদ্ধ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। যুদ্ধ শুরুর সময় তিনি ছিলেন চট্টগ্রামে, পরে এপ্রিলের শেষে আগরতলা হয়ে পৌঁছেন কলকাতায়। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে তিনি কাজ করেছেন, আবার বহুবিধ সাংগঠনিক বন্ধনের সুবাদে ছিলেন নানা পর্যায়ে কর্মব্যস্ত। ফলে তাঁর ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার সঙ্গে একাত্তরের প্রধান ঘটনাধারার রচিত হয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগ। এই কারণে আনিসুজ্জামানের অপূর্ব কথকতায় আমরা মুক্তিযুদ্ধে এক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর নিবিড় সম্পৃক্ততার বিবরণ ছাড়াও পেয়ে যাই মুক্তিসংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস, পাই ইতিহাসের অন্তরালবর্তী মানুষজনের সজীব পরিচয়। অসাধারণ গদ্যভাষায় অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে ব্যক্তিগত অবলোকনের যে-ছবি আনিসুজ্জামান মেলে ধরেন, নিছক স্মৃতিকথায় তা আর সীমিত থাকে না, হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের বহুমাত্রিক ইতিহাসের অনন্য আকর। সব ধরনের পাঠককে আকর্ষণ করবে এই বই, গ্রন্থপাঠের আনন্দকর অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করবে জানবার ও ভাবনার অযুত উপাদান।

ISBN 984-465-125-5

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার একাত্তর

আনিসুজ্জামান

সাহিত্য প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



প্রচ্ছদ : অশোক কর্মকার
পঞ্চম মুদ্রণ : মাঘ ১৪১৯, ফেব্রুয়ারি ২০১৩
চতুর্থ মুদ্রণ : চৈত্র ১৪১৪, মার্চ ২০০৮
তৃতীয় মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১৩, আগস্ট ২০০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : চৈত্র ১৪০৫, এপ্রিল ১৯৯৯
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪০৩, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
ISBN 984-465-125-5

মূল্য : তিনশত টাকা

প্রকাশক : মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
হরফ বিন্যাস : কম্পিউটার প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
মুদ্রক : কমলা প্রিন্টার্স, ৪১ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

ড. এ আর মল্লিক

১৯৭১এ যাঁর সহচর ছিলাম
মাত্র কদিন আগে যিনি আমাদের ছেড়ে গেলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখবন্ধ

১৯৭১এর স্মৃতি যার সঞ্চয়ে আছে, তারই কিছু বলবার মতো কথা আছে। আমি তাদেরই একজন। স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে বন্ধুদের কেউ কেউ অনুরোধ করেছিলেন আমার অভিজ্ঞতার কথা লিখে ফেলতে। লিখলে একদিকে ভালো হতো, অনেক কিছু তখন স্মৃতির কোঠায় টাটকা ছিল। তবে আমার মনে হয়েছিল, সময়ের বেশি কাছাকাছি আছি, আরেকটু দূরবর্তী না হলে ঠিকমতো দেখা হবে না, লেখাও ঠিক হবে না। তারপর যখন কালগত দূরত্ব এলো, তখন আর লেখবার সময় করে উঠতে পারি না। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী-উপলক্ষে *ভোরের কাগজে*র সাময়িকীতে ধারাবাহিকভাবে লেখার অনুরোধ জানিয়ে পত্রিকা-সম্পাদক মতিউর রহমান এবং সাময়িকী-সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ সে-বাধা দূর করার সুযোগ করে দিলেন। নইলে হয়তো এ-বই লেখা হতো না। অনেক বলবেন, তাতে কারো কোনো ক্ষতি হতো না।

আমার ডায়েরি লেখার অভ্যাস নেই, মুক্তিযুদ্ধের সময়েও ছিল না। এই রচনা মূলত স্মৃতিনির্ভর। ১৯৭১এর মে মাসের মধ্যভাগে আমি কলকাতায় পৌঁছোবার পর অনিরুদ্ধ রায় আমাকে একটা নতুন ডায়েরি উপহার দিয়েছিল। তাতে অনেকের নামঠিকানা আর দেখা সাক্ষাতের স্থানকাল লেখা আছে। তা দেখে অনেক ঘটনা ফিরে এসেছে নিজের কাছে। নানা বইপত্র থেকে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য নিয়েছি, আমার স্মৃতিও ঝালিয়ে নিয়েছি।

স্মৃতি সকলের সঙ্গেই প্রতারণা করে। আমার সঙ্গে করেনি, এমন দাবি করবো না। তবু এটা যখন আমারই স্মৃতিকথা, তখন স্মৃতির ওপরেই নির্ভর করেছি। খালেদ মোশাররফের সঙ্গে প্রথম আলাপের সময়ে তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা-প্রসঙ্গে যে-কথোপকথনের বর্ণনা আছে, কিংবা জুলাই মাসে সেনা-কর্মকর্তাদের সম্মেলনে কর্নেল ওসমানী-প্রসঙ্গে জিয়াউর রহমানের কথিত মন্তব্যের যে-উদ্‌ধৃতি দিয়েছি, কোনো কোনো মুদ্রিত বিবরণের সঙ্গে তার অমিল হবে। এই পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনতা সত্ত্বেও, আমার যা মনে পড়েছে, তা লিখেছি। এই রচনা পত্রিকায় প্রকাশের সময়ে আমার একজন শিক্ষক আমার প্রদত্ত বিবরণ সম্পর্কে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করেন। তাঁর অধিকাংশ কথাই নির্ভুল ছিল না—তাও ওই পত্রিকার পাতায় প্রতিপন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~www.amarboi.com ~

হয়েছে। তবু তাঁর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমার পরিবেশিত একটি তথ্য বাদ দিয়েছি। আরেকটি তথ্য সংশোধন করেছি জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সঙ্গে আলাপের ফলে।

তবু বলবো, সকল ভুলভ্রান্তির দায় আমার একার। আমি মুক্তিযুদ্ধের সময়কার একটা খণ্ডচিত্র অঙ্কন করেছি। তাতে আমাদের গৌরবের কথা আছে, শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহায়তার কথা আছে, নিজেদের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাও আছে। আমি কাউকে ছোট করতে চাই নি, আঘাত দিতে চাই নি। নানারকম অবস্থার চাপে মানুষ অনেক সময়ে অসংগত আচরণ করে ফেলে, সেটাই তার স্বভাব নয়। এই লেখা পড়ে যদি কেউ বা কারো স্বজনেরা ক্ষুব্ধ হন, তাঁদের কাছে আমার একটাই কৈফিয়ত : যা সত্য বলে জেনেছি তাই লিখেছি। কারো কারো কথা হয়তো বলা উচিত ছিল, কিন্তু বলা হয় নি—তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সংলাপে সাধারণত উদ্‌ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করেছি, তবে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে ইংরেজি কথোপকথনের বাংলা ভাষ্যের ক্ষেত্রে।

গত বছর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে *আমার একাত্তর* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল *ভোরের কাগজে*। সেজন্যে মতিউর রহমান ও সাজ্জাদ শরিফকে ধন্যবাদ। সে-সময়ে অনেক পাঠক আমার কাছে যেসব মন্তব্য করেছিলেন, তা ছিল আমার পক্ষে প্রেরণাস্বরূপ। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। একটি তথ্যের সত্যতা যাচাই করে দিয়েছিলেন মঈদুল হাসান-তাঁর কাছে আমি ঋণী। রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় এবং নির্ঘণ্ট-তৈরির কষ্টস্বীকার করায় মফিদুল হককে ধন্যবাদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বন্ধু ড. বিলায়েত হোসেনের কাছ থেকে বাংলাদেশ লিবারেশন কাউনসিল অফ দি ইনটেলিজেনসিয়ার দুটি প্রচারপত্র পাওয়ায় তার আলোকচিত্র সংযোজন করা সম্ভবপর হলো। তিনিও আমার ধন্যবাদভাজন। কয়েকটি ছবি নেওয়া হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংগ্রহ থেকে। জাদুঘর-কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আনিসুজ্জামান
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সকালের ফ্লাইটে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে গিয়ে পৌঁছোলাম।

সারা দেশে তখনো গণ-অভ্যুত্থান চলছে। আমরা শিক্ষকরাও তাতে যোগ দিয়েছি। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডক্টর শামসুজ্জোহা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের হাতে কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত হলে পূর্ব পাকিস্তানের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তাঁর ঘাতকদের বিচারের দাবিতে অবিরাম ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর অধ্যাপক মুহম্মদ শামসউল হক ঢাকায় চলে এসেছেন এ বিষয়ে প্রতিকারের দাবি জানাতে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিরা তাঁকে নিয়ে দেখা করেছেন চান্সেলর ও গভর্নর আবদুল মোনায়েম খাঁর সঙ্গে। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্, সাধারণ সম্পাদক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ডক্টর আবদুল লতিফ চৌধুরী, আমি যুগ্ম-সম্পাদক। আমরা তিনজনই অন্যদের সঙ্গে গেছি চান্সেলরকে আমাদের বক্তব্য জানাতে। যে ব্যাঘ্রমূর্তি মোনায়েম খাঁকে আমরা আগে দেখেছি, এখন দেখলাম, তিনি অনেক মৃদুকণ্ঠ, বুঝিবা একটু দুঃখের আভাসও ফুটে উঠছে তাঁর কথায়। প্রেসিডেন্টকে আমাদের দাবির কথা জানাতে স্বীকার করলেন তিনি, সেদিনই আবার সন্ধ্যায় যেতে বললেন। সন্ধ্যায় আমাদের সামনেই ফোন করলেন তাঁর সদর আইয়ুব খানকে। ফোন রেখে আরো দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'প্রেসিডেন্ট এখন কথা বলছেন বিরোধীদলীয় নেতা নবাবজাদা নসরুল্লাহ্ খানের সঙ্গে; আর আমি তাঁর গভর্নর—আমার টেলিফোন ধরছেন না।' তিনি আমাদের আরো জানালেন যে, জি ও সি-র সঙ্গে জোহা-হত্যার বিষয়ে তাঁর কথা হয়েছে, জি ও সি এ-সম্পর্কে স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট চেয়েছেন; কিন্তু কেন্দ্র থেকে নির্দেশ না পেলে কোনো তদন্ত করতে তাঁরা সম্মত নন। ফলে আমাদের ধর্মঘটের কর্মসূচি অপরিবর্তিত রইল। মূল আন্দোলনের সঙ্গে আমরা আগেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাত্মতা ঘোষণা করেছিলাম, তবে সে–আন্দোলনের প্রকৃতি খানিকটা বদলে যায় গোল টেবিল বৈঠকের পরে। কিছু কিছু নৈরাজ্যও দেখা দেয় এখানে-সেখানে। চারদিকে উত্তেজনা ও উদ্বেগ, ব্যর্থতার আশঙ্কার সঙ্গে বিজয়লাভের আশা। মোনায়েম খাঁ বিদায় হয়েছেন, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন আমাদের শিক্ষকপ্রতিম ড. এম এন হুদা। দেখা যাক, আমাদের দাবির ব্যাপারে উনি কী করতে পারেন।

এই পরিস্থিতিতে যে ঢাকা ছেড়ে চট্টগ্রামে গেলাম, তার কারণ একান্তই ব্যক্তিগত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের রিডারের পদের জন্যে আবেদন করেছিলাম আগের বছরে—বিভাগের অধ্যক্ষ ও আমার শিক্ষক অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের পরামর্শে। তার জন্যে সাক্ষাৎকারের সময় ধার্য হয়েছে ২৬ মার্চ সকালবেলা। সুতরাং ২৫ মার্চ সকালে চট্টগ্রামে পৌঁছে উঠলাম রেলওয়ের হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা আমার বন্ধু আবদুল আলী ওরফে খোকনের বাটালি হিলের সরকারি বাসায়। বিকেলে আমরা দুজনে গেলাম আমার কলেজ জীবনের সহপাঠী, এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কুতুবউদ্দীন আহমদ চৌধুরীর (এখন আর নেই) বাসায় চা খেতে। দেশের পরিস্থিতি আলোচনা করতে করতে বেতারে খবর শুনলাম : আইয়ুব খান দেশের সকল ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন ইয়াহিয়া খানের কাছে, শাসনতন্ত্র স্থগিত হয়েছে, সামরিক আইন জারি হয়েছে।

খবর শুনেই উঠে পড়লাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললাম, 'এরপর আর (দেশের) দুই অংশের এক থাকার কোনো অর্থ থাকলো না।' এমন কথা এর আগে আর কখনো বলিনি, বোধহয় ভাবিনি বলে। বরঞ্চ একবার উল্টো কথাই বলেছিলাম আমাদের বহু জনের শিক্ষক (পরে জাতীয় অধ্যাপক) আবদুর রাজ্জাককে : 'স্যার, আপনারা একবার দেশ ভেঙেছেন, আরেকবার ভাঙতেও আপনাদের বাধা লাগবে না। ওই ভাঙাটাই ঠিক হয়েছে কিনা, স্থির করতে পারছি না; আরো একবার ভাঙার কথা আমরা ভাবতে পারি না।'

২৬ মার্চ চট্টগ্রাম শহর থেকে বহুদূরে নানা ধরনের রাস্তা পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছোলাম ইন্টারভিউ দিতে। জানা গেলো, ভাইস চান্সেলর ড. এ আর মল্লিককে স্থানীয় সামরিক আইন প্রশাসক ডেকে নিয়েছেন ক্যান্টনমেন্টে। তাঁর ফিরে আসতে দেরি হলো। শুনলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ছাত্র–শিক্ষকদের অবিলম্বে ক্লাসে ফিরে আসতে হবে। বড়ো গ্লানিবোধ হলো। জোহার কথা মনে হলো, আমাদের অবিরাম ধর্মঘটের সংকল্পের কথা মনে হলো এবং নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হলো। যাহোক, এই অবস্থায়ও যথারীতি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হলো এবং সন্ধ্যার দিকে আভাস পাওয়া গেলো, চাকরিটা আমার হবে।

২৭ মার্চ সন্ধ্যার ফ্লাইটে ঢাকা ফিরে এলাম। গ্লানিবোধটা যেতে চায় না। ঢাকায় ফিরেই গেলাম ড. লতিফ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁরও একই অবস্থা। অন্যান্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের কারো কারো সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। আত্মগ্লানি ক্রমশ পরিণত হচ্ছে ক্রোধে, তবু কিছু করার নেই। ভালো ছেলের মতো আমরা যার যার কাজে ফিরে যাবো, দাবির কথা মুখে আনবো না, ক্ষোভ চেপে থাকবো।

দু–একদিনের মধ্যে ডাক পেয়ে ড. হুদার কাছে গেলাম। তিনি অনেক কথা বললেন। তাঁকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করে আইয়ুব বলেছিলেন, ঢাকায় যাওয়ার আগে প্রধান সেনাপতির সঙ্গে দেখা করে যেতে। কেন বলেছিলেন, তা নিয়ে তখন খুব যে ভাবিত হয়েছিলেন তিনি, তা নয়; পরে বুঝেছিলেন। ইয়াহিয়া খান বরঞ্চ তখন তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, 'উইশ ইউ লাক, ইয়ংম্যান।' তার চার–পাঁচ দিনের মধ্যেই ইয়াহিয়া ক্ষমতা নিয়ে নিয়েছিলেন, হুদা সাহেবের উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেছিলেন চটপট। ইয়াহিয়ার অভিনয়–ক্ষমতার পরিচয় সেদিন পেলেও, তিনি যে কতো কুশলী অভিনেতা, দু বছর পরে তা হাড়ে হাড়ে সকলে টের পেয়েছিলাম।

আপাতত নিজের বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ রইলাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগপত্র পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস–চান্সেলর ড. মুহম্মদ ওসমান গনির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমাকে তাঁর অপছন্দ করার অনেক কারণ ছিল। ঘরে ঢুকতেই উনি জানতে চাইলেন, কবে যাচ্ছি চট্টগ্রামে। আসন গ্রহণ করতে করতে বললাম, সে–বিষয়ে আলাপ করতেই এসেছি। আমি কি লিয়েন চেয়ে চিঠি দিতে পারি? লিয়েন পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে যথারীতি নোটিস দিয়ে পদত্যাগ করবো। ওঁর কথা থেকে বুঝলাম, পদত্যাগপত্র পেলেই উনি খুশি হবেন। 'তাই হবে স্যার' বলে চলে এলাম।

৩ জুন ঢাকা থেকে ভোরবেলায় গাড়ি চালিয়ে যোগ দিতে চললাম চট্টগ্রামে। আমার সঙ্গী দুজন : ভূঁইয়া ইকবাল—চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও বর্তমান চেয়ারম্যান, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র; আরেকজন আবদুল মান্নান ওরফে মইনু—তখন ব্যবসা করলেও এখনকার মতো প্রতিষ্ঠিত হননি। দাউদকান্দি আর চান্দিনার মাঝামাঝি জায়গায় অনেকটা নিজের দোষে দুর্ঘটনা ঘটালাম। গাড়ি নিয়ে রাস্তা থেকে ছিটকে পড়লাম নিচে ক্ষেতের মধ্যে, তার চার চাকা আকাশমুখো। সেখান থেকে আমাদের উদ্ধার করে কুমিল্লার সি এম এইচে নিয়ে গেলেন ফয়জুর রহমান আহমেদ—কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের বাবা, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ—তখন কুমিল্লায় ডি এস পি। আমার সঙ্গীদের তেমন কিছু হয়নি—এরআমার কলার বোন ভেঙেছিল। সি এম এইচে পৌঁছে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। পরে সেখান থেকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমির পরিচালক আজিজুল হকের সৌজন্যে আমাকে নিয়ে আসা হয় একাডেমির হস্টেলে। ওই ৩ জুন সকালেই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মৃত্যু ঘটে, তা জানতে পারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক পরে। কয়দিন কুমিল্লায় থেকে ঢাকায় ফিরে আসি।

নীলক্ষেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় আমাকে একদিন দেখতে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীন আহমদ, সঙ্গে বোধহয় আবদুল মমিনও ছিলেন। আমার ধারণা, তাজউদ্দীনই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু চলে যাওয়ার ঠিক আগে আমার পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে রুচি এসে আমার কানে কানে জিজ্ঞেস করলো, 'আসাদ আসেনি?' আসলে গণঅভ্যুত্থানের সময়ে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও দুটো স্লোগান মুখস্থ করে ফেলেছিল : 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো' আর 'আসাদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না।' তাদের কাছে মুজিব ও আসাদ খুব কাছের মানুষ। তাই শেখ মুজিব এসেছেন শুনে রুচি আর তার বন্ধুদের মনে হয়েছিল, তবে তো তাঁর সঙ্গে আসাদেরও আসার কথা। রুচিকে কানে কানে কথা বলতে দেখে বঙ্গবন্ধু আমার কাছে জানতে চাইলেন, সে কী বলছে। আমার জবাব শুনে সেই বিশালদেহী মানুষটি নিচু হয়ে রুচির গাল ধরে বললেন, 'ওরা আমার কাছে এই কৈফিয়ত তো চাইতেই পারে।' আমি যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। রুচির মাথায় হাত দিয়ে বঙ্গবন্ধু বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

৩০ জুন আমিও ঢাকা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম চট্টগ্রামে—এবারে সপরিবার এবং বিমানে। আমি যাওয়ায় বিমানের বাকি যাত্রীদের প্রাণসংশয় দেখা দেবে কিনা, সে-সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন গিয়াসউদ্দিন আহমদ— আমার বন্ধু, ইতিহাস বিভাগের সহকর্মী এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদ। গিয়াসের কেনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত *হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল*-এর দ্বিতীয় খণ্ডের কপিটি অনেকদিন আমার কাছে ছিল। আমি চট্টগ্রামে যাওয়ার আগে একদিন আমার বইয়ের শেলফ থেকে হিটলারের *মেইন ক্যামফ* (আমার সংগ্রাম)-এর কপিটি তুলে নিয়ে তিনি বলেছিলেন, এটা আমার বেশি কাজে লাগবে, আমিই নিলাম; *হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল* তোমার কাছে থাক। গিয়াস শহীদ হওয়ার পরে আমার বহুবার মনে হয়েছে, ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে সংগ্রামের পথ বেছে নিয়ে তিনি কি সেদিন আমার জন্যে মুক্ত বাংলা উপহার দিয়েছিলেন?

আমার চট্টগ্রামে পৌঁছোবার কয়েকদিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দেশে সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ওই বক্তৃতায় তিনি আরো কিছু বিষয়ের অবতারণা করেন এবং কয়েক মাস পরে তার কয়েকটি সম্পর্কে সিদ্ধান্তও দেন। আমাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দজনক হয়েছিল একজনের এক ভোট এই নীতিগ্রহণ—অর্থাৎ সংখ্যাসাম্য-বর্জন। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিটের অবসানও ছিল অভিনন্দনযোগ্য সিদ্ধান্ত। তাছাড়া তিনি কেন্দ্র ও প্রদেশের ক্ষমতাবণ্টনের ক্ষেত্রে যে একটা সমস্যা আছে, তা স্বীকার করেন এবং নির্বাচনের তারিখ স্থির করেন ১৯৭০এর ৫ অক্টোবর। পরে তারিখ পিছিয়ে গেলো। ১৯৭০এর ১৪ নভেম্বর ঘটলো সেই ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়। এর ভয়াবহতা আমাদের বিমূঢ় করে দিয়েছিল। উপদ্রুত অঞ্চল দেখে এসে জয়নুল আবেদিন তাঁর যে দীর্ঘ স্ক্রল অঙ্কন করেন, তাঁর উপস্থিতিতেই তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রদর্শনী হয় চট্টগ্রামে। সেখানে আমরা অনেকেই ছিলাম।

শেষ পর্যন্ত ৭ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। আমাকে প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে যেতে হলো হেয়াকু নামে এক দুর্গম জায়গায়। আমি নিজে ভোটার ছিলাম হাটহাজারী এলাকায়। সেখানে জাতীয় পরিষদ্–সদস্য পদে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী, দৈনিক *আজাদী*–সম্পাদক, অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ এবং কনভেনশন মুসলিম লীগ–প্রার্থী ফজলুল কাদের চৌধুরী। আর প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পার্শ্ববর্তী মদনহাটের আবদুল ওয়াহাব এবং তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কনভেনশন মুসলিম লীগের আলী আহমদ। ডি সি অফিসে গিয়ে নিজের ভোটটা অগ্রিম দিয়ে নাজিরহাট–নারায়ণপুর হয়ে আমি হেয়াকু পৌঁছোলাম। ভোটকেন্দ্রে ভোটের সামগ্রী ও পাহারা রেখে আমি চলে গেলাম রামগড় চা–বাগানে রাত কাটাতে। ওই বাগানের ম্যানেজার ছিলেন বন্ধু আবদুল আলীর সেজ ভাই আবদুল আউয়াল—আমাদের সুবা ভাই। পরে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে, রামগড়ে তাঁরই আশ্রয়ে ছিলাম এবং এখান থেকেই আগরতলার পথে রওনা হই।

আমি যে–কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার ছিলাম, সেই নির্বাচনী এলাকায় জাতীয় পরিষদ্ সদস্যপদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন সৈয়দ ফজলুল হক বি এসসি এবং ন্যাপের প্রার্থী ছিলেন বন্ধু আহমদুর রহমান আজমী। ভোটগ্রহণ শুরুর সময়ে সব প্রার্থীর এজেন্টই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু বেলা যত বাড়তে লাগলো, ততই আওয়ামী লীগ ছাড়া বাকি প্রার্থীর এজেন্টরা নিরুৎসাহ হয়ে চলে যেতে লাগলেন। অনেক বলে–কয়ে একজনকে আমি ধরে রাখলাম—ফলাফলের কাগজে যাতে অন্তত দুজন প্রার্থীর এজেন্টের সই থাকে। আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পাওয়া ভোটের সংখ্যাধিক্যে আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম। যাহোক, নির্বাচন–সামগ্রী ও ফলাফল নিয়ে ফিরছিলাম কড়েরহাটের পথ ধরে। কড়েরহাটের কাছাকাছি এসে গাড়ি গেলো বিকল হয়ে। অনেক চেষ্টার পরে একজন আমাকে ডি সি- অফিসে পৌঁছে দিতে সম্মত হলেন। আমি ফলাফল নিয়ে চলে এলাম—পুলিশ রয়ে গেলো জিনিসপত্র নিয়ে। পরে ডি সি–অফিসের একটি গাড়ি আমাকে বাসায় পৌঁছে দেয়।

গণ-অভ্যুত্থানের সময় থেকে নির্বাচনের সময় পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল এবং আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তবু জাতীয় পরিষদে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি (পরে মহিলা–আসনের সাতটির সবকটি) এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০র মধ্যে ২৮৮টি (পরে দশটি মহিলা–আসনের সবকটি) আসন আওয়ামী লীগ পেয়ে যাবে, এমন কথা কেউ ভাবেনি। সাধারণ নির্বাচনে এতো বড়ো ম্যান্ডেট কেউ কখনো পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। অতএব ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণীত হবে, এ নিয়ে কোনো সংশয়ের কারণ ছিল না। কিন্তু ফলাফল-প্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যেই জুলফিকার আলি ভুট্টো ঘোষণা করেন যে, তাঁর দল

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তান পিপলস পার্টির সহযোগিতা—আসলে সম্মতি—না পেলে কেউ সংবিধান প্রণয়ন করতে পারবে না। এর জবাবে তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, দরকার হলে কেবল আওয়ামী লীগের পরিষদ্-সদস্যরাই সংবিধান রচনা করবেন, কেননা সে-অধিকার জনগণ তাঁদের দিয়েছে। সংঘাতের সেই শুরু। ১৯৭১এর ৩ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যেরা শপথ গ্রহণ করলেন যে, তাঁদের প্রণীত শাসনতন্ত্রে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতিফলন ঘটবে। কী হয়, তা দেখা ও জানার জন্যে আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। নানা সন্দেহ, অবিশ্বাস, ক্ষোভ ও ক্রোধ জমতে শুরু হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসে সংঘটিত দেশব্যাপী প্রথম সাধারণ নির্বাচন। আমিও জীবনে এই প্রথমবার ভোট দেওয়ার সুযোগ পাই। এ নির্বাচনে জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা এবং পূর্ব পাকিস্তানে অভূতপূর্ব জনসমর্থনের প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের পক্ষে লক্ষ্য সাধন করা সহজ ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির বিরোধিতার কথা উল্লেখ করেছি। সেখানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের (হাজারভীর উপদল) মতো ছোট দল এবং এয়ার ভাইস–মার্শাল আসগর খানের মতো কোনো কোনো নেতার সমর্থন পেলেও ছয় দফা কর্মসূচি সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় ও অবিশ্বাস বিদ্যমান ছিল।

পূর্ব পাকিস্তানেও বিভিন্ন দল ও মতবাদীর মধ্যে আওয়ামী লীগ ও ছয় দফার প্রতি বিরূপ মনোভাব কাজ করেছিল। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ধারার রাজনীতি কাছাকাছি চলে এসেছিল। তা নাহলে ১১ দফার আন্দোলন বা ১৯৬৯এর গণ–অভ্যুত্থান হতে পারতো না। ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের স্বাক্ষরে দলের যে "নীতি ও কর্মসূচীর ঘোষণা (ম্যানিফেস্টো)" প্রকাশিত হয়, তাতে স্পষ্টই বলা হয় যে, "সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত লক্ষ্য।" এ সত্ত্বেও এই দু ধারার রাজনীতিবিদদের পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অনাস্থা প্রবল ছিল। কেউ মনে করতেন, আওয়ামী লীগ উঠতি বুর্জোয়াদের দল; কেউ বলতেন, ছয় দফা কর্মসূচি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র–প্রণোদিত; কেউ বিশ্বাস করতেন, এ দাবি উত্থাপন করে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধ পক্ষকে বিভক্ত ও দুর্বল করে দেওয়া এবং সমাজতন্ত্র–প্রতিষ্ঠায় বাধা দেওয়া এর লক্ষ্য।

অন্যপক্ষ মনে করতেন, সমাজতন্ত্রের নামে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার নামে পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের সমর্থন করা হচ্ছে। সাধারণ নির্বাচনের আগে 'ভোটের আগে ভাত' স্লোগানটা বেশ শোনা গিয়েছিল। ভোট যে ভাতের বিকল্প নয়, এ কথা সবাই বুঝতেন। কিন্তু একপক্ষ মনে করতেন যে, সামরিক শাসনের তথা পশ্চিম পাকিস্তানি ধনিক-বণিক-ভূস্বামী এবং সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের বদলে পূর্ব পাকিস্তানি নব্য ধনীরা ক্ষমতায় এলে সাধারণ মানুষের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না; অন্যপক্ষ মনে করতেন, এই স্লোগান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে পিছিয়ে দিয়ে সামরিক শাসনকে দীর্ঘতর করতে সাহায্য করবে মাত্র।

ষাটের দশকেই কোনো কোনো বাম দল সশস্ত্র বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখেছিলেন এবং তাঁদের কাছে যাঁরা শ্রেণীশত্রু বলে গণ্য হতেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু অভিযানও পরিচালনা করেছিলেন। সাধারণ নির্বাচনের পরে তাঁরা বিপ্লব আসন্ন বলে ঘোষণা করেন এবং সাংবিধানিক রাজনীতির পথ ত্যাগ করে এই বিপ্লব ত্বরান্বিত করতে সকলকে আহ্বান জানান। বামপন্থীদের অন্য অংশ এই নির্বাচনের ফলাফল জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করতে সমর্থ হবে না—এই কথা বলে দূরে সরে রইলেন। যাঁরা মধ্যপন্থী ধারার রাজনীতি করতেন, তাঁরা অনেকে নির্বাচনের ফলাফলে উৎসাহী হলেও মনে করতেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে মুজিব আপোস করবেন কিংবা আপোস করতে বাধ্য হবেন। দক্ষিণপন্থীরা প্রথমাবধি ছয় দফার বিরুদ্ধে। তাঁরা স্পষ্টই ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিপরীতপক্ষে—পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলতে তাঁরা যা বুঝতেন অর্থাৎ—ইসলামের আদর্শ স্থাপন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা যাতে বজায় থাকে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে বলেছিলেন।

তবে পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিষয়টি ক্রমাগত বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছিল। নির্বাচনের আগে মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের ঐক্যের ওপরে খুব জোর দিয়েছিলেন, কিন্তু নির্বাচনের পর তিনি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করার ডাক দেন। পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন স্বাধীন পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। ছাত্রলীগের মধ্যে থেকে স্বাধীনতার দাবি নির্বাচনের পরে প্রবল হতে থাকে। মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তাঁরা চান, ছয় দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হোক, কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাতে বাধা দিলে পূর্ব বাংলায় একটি পৃথক রাষ্ট্রগঠনের প্রয়াস নেওয়া যেতে পারে।

১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে আওয়ামী লীগ দলীয় পরিষদ্-সদস্যরা যখন ছয় দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন করবেন বলে জনসমক্ষে শপথগ্রহণ করেন, তখন তাই—জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও—তাঁরা এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীর সংকটের মুখোমুখি হন। দেশের শাসনভার ছিল সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে। প্রচলিত অস্ত্র ছাড়াও তাঁদের হাতে আরেকটা বড়ো অস্ত্র ছিল—আইনগত কাঠামো আদেশ। ওই আদেশে যেসব শর্ত ছিল, তাতে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান-প্রণয়নে ব্যর্থ হলে কিংবা সংসদে গৃহীত সংবিধান-বিলে প্রেসিডেন্ট সম্মতি না দিলে জাতীয় পরিষদ্ ভেঙে যাওয়ার কথা। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের অমন অপ্রত্যাশিত বিজয়লাভে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের অস্বস্তিবোধ অপ্রকাশ্য থাকেনি। পিপলস পার্টি তো প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জানুয়ারি মাসে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসেছিলেন ছয় দফা সম্পর্কে বিস্তারিত বুঝতে। সে সময়েই সাংবাদিকদের সামনে শেখ মুজিবকে দেখিয়ে তিনি পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করেন। আসলে আওয়ামী লীগ কতোটা ছাড় দেবে, ইয়াহিয়া তা পরখ করতে এসেছিলেন। তারপর আসেন ভুট্টো—মুজিবের ছয় দফা ও ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা করতে। তিনি সবকিছু ভেবে দেখার জন্যে আরো সময় চান এবং বেশ উলটোপালটা কথা বলেন।

একই সময়ে পূর্ব বাংলায় দেখা গেলো অতি বাম, বাম, মধ্য ও দক্ষিণপন্থীদের বিভিন্নমুখী টান। ছাত্রলীগের প্রভাবশালী একটি অংশ স্বাধীনতার দাবি জানায় এবং আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি গোষ্ঠী সে-দাবি সমর্থন করে। পরবর্তীকালে একাধিক জনের লেখা থেকে জানা যায় যে, ১৯৬২ সাল থেকে—অন্তত ১৯৬৪ সাল থেকে তো বটেই—ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে 'নিউক্লিয়াস' নামে একটি উপদল স্বাধীন ও সমাজতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা-প্রতিষ্ঠার জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা ও উদ্‌যোগ গ্রহণ করতে থাকেন। কেউ বলেন, এঁদের প্রতি মুজিবের সমর্থন ছিল না, তবে তিনি এঁদের বাধা দেননি; কেউ বলেন, ১৯৬৯ সাল থেকে তিনি এই সশস্ত্র দলের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। তবে এসব খবর তখন আমার জানা ছিল না। ড. কামাল হোসেন পরে লিখেছেন যে, ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতাদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বারকক্ষে এক বৈঠকে একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি এবং তার সম্ভাব্য সামরিক প্রতিক্রিয়ার দিকটিও আলোচিত হয়। আলোচনাশেষে কামাল হোসেনকে অনুরূপ ঘোষণার একটি খসড়া তৈরি করতে বলা হয় এবং আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার পাঠ সামনে রেখে তিনি একটি খসড়া প্রণয়ন করে ১০ ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গবন্ধুকে দেন। এই খসড়া প্রণয়নের কাজে তাজউদ্দীন আহমদও জড়িত ছিলেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি কী হবে, সে বিষয়ে একটি খসড়া তৈরির দায়িত্ব এককভাবে তাজউদ্দীনের ওপর অর্পিত হয়। এসব কথাও তখন আমার পক্ষে জানা সম্ভবপর ছিল না। চট্টগ্রামে বসে আমি কেবল তর্ক শুনছি এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত ও মৌখিকভাবে রটিত ঘটনার বিবরণ জানছি। বঙ্গবন্ধুর প্রভাব তখন অসীম : তবু

তিনি হঠকারী না আপোসকামী, ক্ষমতালিপ্সু না জনসেবক, বিদেশের উস্‌কানিতে পাকিস্তান ভাঙতে চান না পূর্ব বাংলার স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখতে চান—সে-সম্পর্কে নানা মহলের নানা মত। আমার কেবল মনে হচ্ছিল যে, তিনি প্রভাবশালী বলেই প্রকাশ্যে ও গোপনে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী নিজেদের ইচ্ছা তাঁর ওপরে আরোপ করতে চাইছেন; তাঁর দলেরই একেক অংশ নিজেদের মত ও কর্মপন্থাকে বঙ্গবন্ধুর অভিপ্রায় বলে চালিয়ে দিচ্ছেন।

সাংবাদিকদের কাছে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে অভিহিত করলেন পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রীরূপে, আবার এ কথাও বললেন যে, সংবিধানের বিষয়ে দেশের দুই অঞ্চলের নেতাদের মতৈক্য হওয়া প্রয়োজন। তাঁর কথায় ভুট্টো আশ্বস্ত হলেন যে, পিপলস পার্টির সম্মতি ছাড়া কিছু হবে না। নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী সংবিধান-প্রণয়নের অধিকার ঘোষণা করেও বঙ্গবন্ধু আশ্বাস দিলেন যে, কারো ওপর কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না এবং যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব ও সংশোধনী মেনে নিতে তাঁর আপত্তি থাকবে না। বঙ্গবন্ধু যেন আপোস না করেন, এজন্যে আবার তাঁর ওপরে চাপ সৃষ্টি করা হতে থাকলো। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার জন্য তিনি পালটা চাপ দিলেন ইয়াহিয়াকে। ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করলেন ঢাকায়, ৩ মার্চে। ভুট্টো সঙ্গে সঙ্গেই জানালেন, তাঁর দল অধিবেশনে যোগ দেবে না। তর্ক-বিতর্ক আহ্বান-প্রত্যাখ্যান ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিন্দা-ক্ষোভ দাবি-ঘোষণার পালার মধ্যে ১ মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন।

আমি যে কিছুই করিনি, তা নয়। আপনারা কি জানেন যে, চট্টগ্রামে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এই অধমের? সেকথা ইতিহাসে লেখে না। সেজন্যেই তো স্মৃতিকথা লেখার দরকার হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি সকালে আমাদের পারিবারিক বন্ধু আজহার সুফিয়ানীর শিশুসন্তানের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে স্ত্রী বেবীকে নিয়ে আমার ফোকসওয়াগেন চালিয়ে চট্টগ্রাম শহরের দিকে রওনা হই। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর সড়ক বলে যে অপরিসর আঁকাবাঁকা রাস্তা তখন ছিল, তাতে প্রবেশ করে দেখি, সামরিক বাহিনীর একটি গাড়ি লাল পতাকা উড়িয়ে আসছে, তার পেছনে আসছে একটি ট্যাংক। আমার গাড়ি দেখামাত্র লাল পতাকাওয়ালা গাড়ি থেকে একজন ইশারা দিল সরে যেতে। কিন্তু আমার বাঁ দিকে বড়ো নালা, শুকনো হলেও অগভীর নয় এবং দীর্ঘ। যতোটা পারলাম বাঁয়ে চেপে গাড়ি দাঁড় করালাম। লাল পতাকা চলে গেল, তারপরই ট্যাংকটা আমার গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়ে, ডান দিকের ফেন্‌ডার দুমড়ে দিয়ে, কিছু দূর গিয়ে থামলো। কিংকর্তব্য স্থির করার আগেই দুই সেনানী আমার কাছে এসে কৈফিয়ত চাইলো, তাদের একসারসাইজের সময়ে কেন আমি ওই রাস্তায় ঢুকেছি। আমি বললাম, এই রাস্তায় যান-চলাচল বন্ধের কোনো বিজ্ঞপ্তি নেই, চিহ্ন নেই; আমি

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শহরে যাবার এটাই একমাত্র পথ এবং রাস্তাটাও বিশ্ববিদ্যালয়ের। তারা বলল, দু নম্বর রাস্তায় লাল পতাকা দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম, এটা এক নম্বর রাস্তা। তারা বলল, তুমি কি জানো যে, ইচ্ছে করলেই ট্যাংক থামানো যায় না, ট্যাংকের নিচে গাড়িসুদ্ধ তোমাকে পিষে ফেললেও আমাদের কিছু হতো না। আমি বললাম, তোমাদের উচিত ছিল রাস্তায় ঢোকার মুখে বাধা দেওয়া। তারা বললো, ভাগ্যের জোরে তুমি বেঁচে গেছো—একে দোষ করেছ, তার ওপরে আবার তর্ক!

আর তর্ক না করে শহরে চলে গেলাম এবং জানাজা পড়ে খোকনের বাসায় গিয়ে টেলিফোন করলাম ক্যান্টনমেন্টে। সি ও ব্রিগেডিয়ার এম আর মজুমদার চট্টগ্রামে নেই জেনে চাইলাম তাঁর দু নম্বরকে। শুনলাম, তিনি কর্নেল এইচ এস শিগরি। নিজের পরিচয় দিয়ে তখনই দেখা করতে চাইলে তিনি তাঁর কোয়ার্টারে যেতে বললেন। গেলাম এবং যথারীতি নালিশ জানালাম। তিনি কাকে যেন ফোন করলেন। তারপর বললেন, সকালে তোমাদের এলাকায় একসারসাইজ হওয়ার কথা, কিন্তু রাস্তার মুখেই যান–চলাচল নিষেধ করে বোর্ড থাকারও কথা। যারা গেছে, তারা ফেরেনি। আমি তো তোমার গাড়ি চাক্ষুষ করলাম, আমি দুঃখ প্রকাশ করি। তবে বড়োরকম বিপদ যে হয়নি, সেজন্যে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া। তুমি লিখিতভাবে নালিশ করো, আমরা ব্যবস্থা নেবো। দুপুরে খেয়ে যাওয়ার জন্যে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন। কর্নেল জানালেন, তাঁর বাড়ি বালটিস্তানে; তাঁদের ভাষা নিয়েও দু-চার কথা হলো। আমরা তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে কেবল ঠাণ্ডা পানীয় খেয়ে চলে এলাম। পরদিন লিখিত নালিশ জানালাম এবং দুদিন পরে জবাবও পেলাম, বিষয়টা দেখা হচ্ছে। সেদিন যাঁর সৌজন্যে প্রীত হয়ে চলে এসেছিলাম, ২৬ মার্চের পরে তিনি চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

১ মার্চে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে আমরা শেষ পর্ব এম এ পরীক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছিলাম। পরীক্ষা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, বহিরাগত সদস্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অভ্যন্তরীণ সদস্য ড. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল আর আমি। পরীক্ষার্থীরা আসছে–যাচ্ছে, এরই মধ্যে বাইরে স্লোগান এবং উত্তেজিত কয়েকজন নেতা–গোছের ছাত্রের প্রবেশ। তারা বললো, প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেছেন, এর প্রতিবাদে সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে; বঙ্গবন্ধু সহকর্মীদের নিয়ে সভা করছেন, খানিক পরে কর্মসূচি পাওয়া যাবে। আমরাও সামান্য পরামর্শের পর পরীক্ষা স্থগিত করে দিলাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, অফিসার্স এসোসিয়েশন ও কর্মচারী সমিতি প্রেসিডেন্টের ঘোষণার নিন্দা করে বিবৃতি দিলো। সন্ধ্যার প্রায় কাছাকাছি সময়ে ক্যাম্পাসে খোলা জায়গায় এক সভা অনুষ্ঠিত হলো। ততক্ষণে মার্চের প্রথম সপ্তাহের আন্দোলনের যে–কর্মসূচি বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা আমরা পেয়ে গেছি। মূলত প্রেসিডেন্টের কাজের নিন্দা, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা এবং আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বক্তৃতা দিলেন শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। সৈয়দ আলী আহসান, গণিত বিভাগের মোহাম্মদ ফজলী হোসেন, মযহারুল ইসলাম ও আমি ছিলাম বক্তাদের মধ্যে।

বক্তৃতা দিয়েই মযহারুল ইসলাম ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন—কোনোমতে যদি রাজশাহীতে ফিরে যেতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে। আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন চট্টগ্রামের বাইরে ছিলেন। তাঁদের জন্যে তাঁদের পরিবার-পরিজন খুব উদ্বেগের মধ্যে রইলেন। আমার মনে পড়ে, রসায়ন বিভাগের ড. এ কে এম শামসুদ্দীন আহমদ অত্যন্ত কষ্ট করে, অনেক পথ পায়ে হেঁটে, তিনদিন পরে রাজশাহী থেকে চট্টগ্রামে ফিরে আসেন।

বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত কর্মসূচি-অনুযায়ী ২ মার্চ কেবল ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা প্রদেশে ধর্মঘট পালন এবং ৭ মার্চ ঢাকায় জনসভা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কার্যত ইয়াহিয়ার ঘোষণার প্রতিবাদে ১ মার্চ থেকেই একরকম ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। স্থানীয় নেতারা ২ তারিখে চট্টগ্রামেও ধর্মঘট আহ্বান করেন এবং তা খুব সফল হয়। তবে ৩ তারিখে, প্রদেশব্যাপী ধর্মঘটের দিনে, চট্টগ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের পতাকা পোড়ানোর পরে, এবং ৪ তারিখে বাঙালি-বিহারি সংঘর্ষ হয়। মনে করা হয় যে, দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত অবাঙালি কর্মকর্তাদের কেউ কেউ এতে উস্কানি দিয়েছিলেন, অবাঙালি সেনা-কর্মকর্তারাও তার মধ্যে ছিলেন। প্রথম আক্রমণটা করে বিহারিরাই, তবে তথাকথিত বিহারি এলাকাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বেসামরিক প্রশাসনের আহ্বান ব্যতিরেকেই সামরিক বাহিনীর একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে বেপরোয়া গুলি চালায় এবং বাঙালিরা প্রধানত শিকার হয় তারই। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনের চেষ্টায় দেরিতে হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হয় কিন্তু তার মধ্যেই বহুজন হতাহত হয়। আহতদের রাখার মতো জায়গা হাসপাতালে ছিল না। খবর পেয়ে আমরা ব্লাড ব্যাংকে রক্তদানের সিদ্ধান্ত নিই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী মেডিক্যাল অফিসার ডা. কে এম আখতারুজ্জামানের সক্রিয়তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আমাদের ব্যক্তিগত গাড়িতে বহুসংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে রক্তদান করতে যাই। একটি ছাত্র আমার সামনেই ডা. আখতারুজ্জামানকে অনুরোধ করেছিল যে, তার রক্ত যেন শুধু আহত বাঙালিকেই দেওয়া হয়। এ কথার জন্যে তাকে আমি তিরস্কার করি। সে মাথা নিচু করে থাকে, তার কথা প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের ক্ষোভ ও ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল এবং যুক্তি ও শুভবুদ্ধি সব সময়ে কাজ করছিল না।

১ মার্চে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণার পরে পূর্ব বাংলার বেশির ভাগ মানুষই আর পাকিস্তানের অখণ্ডতায় আস্থা রাখতে পারেনি। সকলেরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হচ্ছিল, নিজের হাতেই নিতে হবে নির্ভরতার চাবি। সারা দেশ তাকিয়ে রইল বঙ্গবন্ধুর দিকে। মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামের মতো দক্ষিণপন্থী এবং অতি বাম দু-একটি দল ছাড়া পূর্ব বাংলার আর সব রাজনৈতিক দল—যারা কিছুদিন আগেও আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে এবং নির্বাচনে তাদের প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তারাও—শেখ মুজিবের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদরাও অনেকে মুজিবের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সমর্থন জানান।

মার্চের প্রথম সপ্তাহ জুড়েই চট্টগ্রামে ধর্মঘট চলে। ২ তারিখ থেকে চট্টগ্রামের মতো ঢাকায় এবং পূর্ব বাংলার আরো কোনো কোনো জায়গায় বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা হয়। ৩ থেকে ৫ তারিখের মধ্যে সেনাবাহিনীর গুলিতে নানা জায়গায় অনেক আন্দোলনকারী নিহত হন। কিন্তু বেসামরিক প্রশাসন আর সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলো না। ২ তারিখে ঢাকায় ছাত্রলীগ-নেতারা বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে এবং ৩ তারিখে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ-প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। মার্চের ৩ তারিখে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় জাতীয় নেতাদের বৈঠক এবং ৬ তারিখে আবার জাতীয় পরিষদ্ আহ্বান করেন ২৫ মার্চে। ৩ মার্চ টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে আমরা অপেক্ষা করি ৭ মার্চের জন্য। সেদিন বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেবেন রেসকোর্স ময়দানে—এই ভাষণ নির্ধারণ করবে সাত কোটি বাঙালির ভাগ্য। আবেগে-উৎকণ্ঠায় আমরা প্রতীক্ষায় রইলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



অধীর আগ্রহ ও গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে ৭ মার্চ দুপুর থেকে রেডিও সেটের সামনে বসে রইলাম। কথা ছিল, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসমাবেশে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা সরাসরি সম্প্রচার করা হবে বেতারে। কিন্তু তা হলো না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বসে আমাদের উদ্‌বেগ আরো বাড়লো।

ঢাকার খবর জানতে মার্চের ১ ও ৩ তারিখ অধিক রাতে ফোন করেছিলাম আমার শিক্ষক মুনীর চৌধুরীকে। ৭ তারিখ গভীর রাতে আবার তাঁকে ফোন করলাম। টেলিফোন বাজামাত্রই তিনি ধরলেন, তাঁর কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা। হ্যাঁ, উনি গিয়েছিলেন রেসকোর্সে বক্তৃতা শুনতে। সে-বক্তৃতার কথা বললেন, জনসমুদ্রের বিবরণ দিলেন, মানুষের প্রতিক্রিয়ার কথা জানালেন। আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম যে, বিকেলের অভিজ্ঞতা তখনো তাঁকে সম্মোহিত করে রেখেছে। তাঁর সঙ্গে জীবনে সেই আমার শেষ কথা।

ক্যাম্পাসের অনেকের সঙ্গেই চট্টগ্রাম শহর ও ঢাকার বন্ধু-বান্ধবদের কথা হচ্ছিল টেলিফোনে। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা তাৎক্ষণিকভাবে সম্প্রচার করা যায়নি বেতারে। তবে, জানা গেল, এর প্রতিবাদে বেতারের বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কাজকর্ম বন্ধ করে দেন এবং পরে রফা হয় যে, বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার যে-রেকর্ড করা হয়েছিল, তা বেতারে প্রচারিত হবে পরদিন সকালে।

৭ মার্চের বক্তৃতা তাই আমরা শুনতে পেলাম ৮ মার্চে। কী অসাধারণ ভাষণ! সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। বঙ্গবন্ধু যখন বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', তখনই মনে হলো, পৃথিবীর বুকে একটি নতুন জাতির জন্ম হলো।

বেলা ১১টার দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সভা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে—আমাদের কোনো মিলনায়তন ছিল না বলে—বাণিজ্য বিভাগের একটি ক্লাসরুমে। ভাইস-চান্সেলর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. এ আর মল্লিক সভাপতিত্ব করলেন। ছাত্র–শিক্ষক–কর্মকর্তা–কর্মচারীদের অনেকে যোগ দিলেন, বসার জায়গার অভাবে বহুজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বক্তৃতা শুনলেন। সভাপতি ছাড়াও বাংলাদেশের স্বাধীনতা–সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বক্তৃতা দিলেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক আবদুল করিম, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, ফজলী হোসেন, আরো কেউ কেউ। আমিও কিছু বলি। সভায় গঠিত হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ। ডা. মাহফুজুর রহমানের *বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম* (চট্টগ্রাম, ১৯৯৩) বইটি দেখে মনে পড়ছে, এর যুগ্ম আহ্বায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন গণিত বিভাগের ফজলী হোসেন ও বাংলা বিভাগের মাহবুব তালুকদার। সদস্য ছিলাম বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ও আমি, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আবদুল করিম ও রফিউদ্দিন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ড. এখলাসউদ্দীন আহমদ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ড. এম. বদরুদ্দোজা, চারুকলা বিভাগের রশিদ চৌধুরী, অর্থনীতি বিভাগের হুজ্জাতুল ইসলাম লতিফী, রেজিস্ট্রার মুহম্মদ খলিলুর রহমান, ডেপুটি রেজিস্ট্রার আবু হেনা মোহাম্মদ মহসীন ও সহকারী ইনজিনিয়ার সুধীররঞ্জন সেন। এর মধ্যে এখলাসউদ্দীন আহমদ ও রশিদ চৌধুরী লোকান্তরিত, বদরুদ্দোজা ও রফিউদ্দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী; অধ্যাপক আবদুল করিম ও অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সুধীররঞ্জন সেন খুব বিপদ্‌গ্রস্ত হন এবং শামসুর রহমান নাম নিয়ে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হন। স্বাধীনতালাভের পর তিনি আবার আগের নামে কাজে যোগ দেন। পরে কর্মচ্যুত হয়ে অন্যত্র চাকরি নেন এবং অকালমৃত্যু বরণ করেন। আমার যতোদূর মনে পড়ে, ভাইস–চান্সেলরকে আমরা ইচ্ছে করেই কমিটির বাইরে রেখেছিলাম, ছাত্রদেরও অন্তর্ভুক্ত করিনি। ছাত্র–সংগঠনগুলো বেশির ভাগই মিলিতভাবে কাজ করছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং যোগাযোগ রক্ষা করছিল চট্টগ্রাম শহরভিত্তিক চট্টগ্রাম জেলা সংগ্রাম পরিষদ এবং স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে।

৮ মার্চ বিকেলেই চট্টগ্রাম শহরে অধ্যাপক আবুল ফজলের বাসভবন 'সাহিত্য নিকেতনে' স্থানীয় সংস্কৃতিসেবীদের এক স্বতঃস্ফূর্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। যতজনকে সম্ভব মুখে মুখে সভার খবর জানানো হয় এবং তাৎক্ষণিক সাড়া পাওয়া যায়। আবুল ফজলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় যোগ দেন ভাইস–চান্সেলর ড. এ আর মল্লিক, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা বিভাগের ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী, মোহাম্মদ আবু জাফর ও মাহবুব তালুকদার, শিল্পী রশিদ চৌধুরী, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক্ষেত্রের বিশিষ্ট সংগঠক ডা. কামাল এ খান, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ, প্রকাশনা–প্রতিষ্ঠান বইঘরের স্বত্বাধিকারী সৈয়দ মোহাম্মদ শফি, চট্টগ্রামের সংস্কৃতিক্ষেত্রে সুপরিচিত মাহবুব হাসান, তারেক সোবহান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও সি এম রোজারিও, আমি এবং আরো অনেকে, বিশেষ করে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র–সংসদের (ডাকসু) সাধারণ সম্পাদক (পরে শহীদ) আবদুর রবসহ বহু ছাত্র ও তরুণ সংস্কৃতিকর্মী। স্বাধীনতা–সংগ্রামে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিসেবীদের একত্র করে কাজ করার উদ্দেশ্যে 'শিল্পী–সাহিত্যিক সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংঘ' নামে একটি শিথিল ধরনের সংগঠন এই সভায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ডা. মাহফুজুর রহমানের বইতে সংঘের যেসব কর্মকর্তার নাম পাচ্ছি, তা এরকম— পৃষ্ঠপোষক : আবুল ফজল, সভাপতি : সৈয়দ আলী আহসান, সহ–সভাপতি আমি ও কামাল এ খান, সম্পাদক : মমতাজউদ্দীন আহমদ, সহ–সম্পাদক : সৈয়দ মোহাম্মদ শফি, কোষাধ্যক্ষ : তাহের সোবহান, সমন্বয়কারী : মাহমুদ শাহ কোরেশী। সংঘের প্রথম কর্মসূচি হিসেবে সভার পরই একটি মিছিল করার প্রস্তাব ওঠে। তখনই মিছিল করার ব্যাপারে সৈয়দ আলী আহসান মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন, বোধহয় তিনি আরো সতর্কতার সঙ্গে কাজ করার এবং হঠকারী কিছু না করার কথা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য নিয়ে হঠাৎ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই বিতর্কের মধ্যেই আবুল ফজল ও এ আর মল্লিক দোতলা থেকে রাস্তায় নেমে আসেন এবং তখনই অন্যেরা তাঁদের পেছনে এসে দাঁড়ান। আলী আহসান সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে আমি, কোরেশী ও রশিদ চৌধুরী মিছিলের সম্মুখভাগে জায়গা নিই। মিছিল করে সেদিন আমরা 'সাহিত্য–নিকেতন' থেকে নিউ মার্কেট পর্যন্ত যাই।

প্রতিরোধ–সংঘের আহ্বানে বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। হরিপ্রসন্ন পাল, তেজেন সেন, শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, প্রবাল চৌধুরী, প্রণোদিত বড়ুয়া, এ কে মান্নান, রাজিয়া শহীদ, চমন আফরোজ কামাল, শেফালী ঘোষ, জুলিয়া মান্নান, কল্যাণী ঘোষ, উমা চৌধুরী, সালমা চৌধুরী প্রমুখ শিল্পী গানের একটা ভালো স্কোয়াড গড়ে তোলেন এবং সভা–সমাবেশে সঙ্গীত পরিবেশন করা ছাড়াও ট্রাকে করে উদ্দীপনামূলক গান গেয়ে নিয়মিত শহর পরিভ্রমণ করেন। মমতাজউদ্দীন আহমদ, মাহবুব হাসান, শফি আহমদ (শফিকুর রহমান?), হাবিবুর রহমান, আসাদুজ্জামান, সি এম রোজারিও, মোহাম্মদ ফরিদ, সুলতানুল আলম, (এখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক) দানীউল হক ও আরো কয়েকজন একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করার আয়োজন করেন এবং পরে তাঁরাও ট্রাকের ওপরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় নাটকের অভিনয় করেন। 'বাঙলায় বিদ্রোহ' নামে একটি অ্যালবাম প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন চিত্রশিল্পীরা। রশিদ চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, মিজানুর রহিম, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, আনসার আলী ও সবিহ্ উল–আলমের একটি করে ছাপচিত্রের এই সংগ্রহের পরিচয়লিপি রচনা করেন মাহমুদ শাহ কোরেশী। তরুণ লেখক ও উৎসাহীদের উদ্‌যোগে ছোট বড়ো অসংখ্য রচনা–সংকলন প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে শাহ আলম নিপুর সংকলনটির কথা মনে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ছাত্র শওকত হাফিজ খান রুশনী কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় *বাংলাদেশ* নামে একটি পত্রিকাও কয়েকদিন প্রকাশ করে।

সকলেই কিছু না কিছু করতে চাইছিলেন দেশের জন্যে। রোজই এক বা একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল—রাজনৈতিক দলের, ছাত্র-সংগঠনের, শ্রমিক-ইউনিয়নের, আইনজীবী ও অন্য পেশাজীবীদের, স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রদের, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সরকারি কর্মচারীদের, নারীদের। সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে বোধহয় চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের শিক্ষকেরা প্রথম স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সভা করেন। এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য কলেজের শিক্ষকেরা এবং সরকারি কর্মচারীরা এগিয়ে আসেন। রেলওয়ে অফিসারদের মতো সরকারি কর্মকর্তারা অনেকটা প্রকাশ্যেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্যেও স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি শুরু হয়।

নারী-সমাজের সক্রিয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহিলা আওয়ামী লীগ, মহিলা পরিষদ্ ও মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্‌যোগে আলাদা আলাদা সভা হয় কয়েকদিন পরে পরে। তাছাড়া মহিলা পরিষদ্ ও মহিলা আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্‌যোগে ১৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ। এতে ঢাকা থেকে প্রধান অতিথি হয়ে যান বেগম সুফিয়া কামাল, বিশেষ অতিথি হয়ে মালেকা বেগম। সভানেত্রীত্ব করেছিলেন উমরতুল ফজল, বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডা. নূরুননাহার জহুর, কুন্দপ্রভা সেন, মুশতারী শফী, হান্নানা বেগম। বক্তৃতা দিয়েই এঁরা ক্ষান্ত ছিলেন না, প্রত্যেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন আন্দোলনকে জয়যুক্ত করতে।

বিভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠে প্রতিরোধ-কমিটি, কোথাও কোথাও প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র। স্টেশন রোডের ডাক বাংলোয় স্থাপিত হয় চট্টগ্রাম সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদর দপ্তর। এই সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আমরাও কাজ করেছি। সদর দপ্তর ছাড়া শহরের বিভিন্ন স্থানে আরো কিছু সংযোগ-কেন্দ্র গড়ে ওঠে। আওয়ামী লীগের প্রধান নেতারা ও ছাত্রলীগের নেতারা এ সবের তত্ত্বাবধান করতেন, তবে এঁদের বাইরেও অনেকে এসব দপ্তর ও কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত হন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ ইবরাহিম (সম্প্রতি হজ করতে গিয়ে ইন্তেকাল করেন) ও সাধারণ সম্পাদক আবদুর রব ১০ মার্চে একটি বিবৃতি দিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তা ও সদস্যদের আহ্বান জানান এই বলে যে, তাঁরা যেনো কোনো অবস্থায়ই অস্ত্র সমর্পণ না করেন। তখনকার পরিস্থিতিতে এ ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

'সাহিত্য-নিকেতনে' আমরা আবার সভা করি ১২ মার্চে। এবারে আলোচনার বিষয় ছিল চট্টগ্রাম বেতার-কেন্দ্রের অনুষ্ঠানের ধারা। ৮ মার্চ থেকে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র কেবল ঢাকা বেতার বা রেডিও ঢাকা বলে পরিচয় দিচ্ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেলিভিশনে প্রচারিত হচ্ছিল 'আমার সোনার বাংলা' গান এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে উদ্দীপক সব অনুষ্ঠান। কিন্তু এই পরিবর্তনের কোনো ছাপ চট্টগ্রাম বেতার-কেন্দ্রের ওপর পড়েনি। সেদিন আমরা চট্টগ্রাম বেতারের অনুষ্ঠানমালার সমালোচনা করি এবং চলমান আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের দাবি জানাই। আমাদের দাবি মানা না হলে আমরা বেতারের অনুষ্ঠান বর্জন করবো এবং বেতার-ভবনের সামনে বড়োরকম বিক্ষোভের আয়োজন করবো বলেও জানিয়ে দিই। এতে কাজ হয়। চট্টগ্রাম বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক নাজমুল আলম সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে শুরু করেন। অনুষ্ঠানের পাণ্ডুলিপি খুঁটিয়ে দেখা—বেতারের পরিভাষায় যাকে বলে ভেটিং—তা একরকম উঠে যায়। এ সময়ে আমি দুটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলাম। একটি ছিল বোধহয় বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদী চেতনার ধারা সম্পর্কে, অন্যটি ছিল আমাদের সাম্প্রতিক কবিতা-বিষয়ে। আমি কোনোটার জন্যেই পাণ্ডুলিপি তৈরি করিনি। সাম্প্রতিক কবিতার অনুষ্ঠানে সিকান্‌দার আবু জাফরের 'বাংলা ছাড়ো' এবং অন্য কবির অনুরূপ ভাবের রচনা আবৃত্তি করা হয়েছিল।

প্রতিরোধ-সংঘের উদ্‌যোগে শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবী সমাবেশ হলো ১৫ তারিখে, লালদিঘির ময়দানে। ময়দান উপচে পড়েছিল লোকে। আবুল ফজলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তৃতা করেন ড. এ আর মল্লিক, সৈয়দ আলী আহসান, নাজমুল আলম, মমতাজউদ্দীন আহমদ, মাহমুদ শাহ্ কোরেশী ও আমি। ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতা দেয় চাকসুর সাধারণ সম্পাদক আবদুর রব এবং ছাত্র ইউনিয়নের চট্টগ্রাম জেলা-সভাপতি (এখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক) মাহবুবুল হক। আলী আহসান সাহেবের বক্তৃতার সময়ে কিছু গোলযোগ হয়—আইয়ুব খানের আত্মজীবনীর বঙ্গানুবাদ তিনি সম্পাদনা করেছিলেন বলে অনেকের মনে ক্ষোভ ছিল, স্বাধীনতা-আন্দোলনে তাঁর সংস্রবের আন্তরিকতা সম্পর্কে অনেকে সন্দিহান ছিলেন। গোলযোগ থামাতে সমর্থ হন মমতাজউদ্দীন আহমদ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে। বক্তৃতার পালা শেষ হওয়ার পরে হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান, তারপরে মমতাজউদ্দীন-রচিত ও পরিচালিত নাটক *এবারের সংগ্রাম*। সম্পূর্ণ নাটকটিই লেখা হয়েছিল সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে, তার একটা বিশেষ আবেদন তাই ছিল।

আমি এই সভায় বক্তৃতা করতে উঠবো, এমন সময়ে (মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন) গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত বখতিয়ার নূর সিদ্দিকী আমাকে ডেকে বলেন, তাঁরা একটু আগেই জানতে পেরেছেন যে, কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তের কথা না জানলেও আমার যা বলার বলতাম, তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই খবর পেয়ে আমি খুব স্বস্তি ও আনন্দ বোধ করি।

লোকচক্ষুর অন্তরালে আরো কিছু ঘটনা ঘটছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। কাউন্সিল অফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাসট্রিয়াল রিসার্চের চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ড. আবদুল হাই—যিনি হুমায়ুন নামে অনেকের কাছে পরিচিত ছিলেন, তিনি—বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে যোগাযোগ করেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হকের (সাম্প্রতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা) সঙ্গে। আমাদের ল্যাবরেটরিতে মলোটভ ককটেল তৈরি করা এবং বিশ্বাসভাজন ও সাহসী কিছু ছাত্রকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সম্ভাব্যতা যাচাই করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। শামসুল হক সাহেব এ বিষয়ে আলাপ করেন ভাইস চান্সেলর ড. মল্লিকের সঙ্গে। ড. মল্লিক তাঁকে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করেন। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ড. এখলাসউদ্দিন আহমদ (এখন লোকান্তরিত) ও রসায়ন বিভাগের ড. মেজবাহউদ্দীন আহমদ (এখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) যৌথভাবে মলোটভ ককটেল বানানোর চেষ্টা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে। এজন্যে কাঁচের বোতল আনানো হয় কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয় থেকে। বোতলের কাঁচ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় পুরু, তাই যথাসময়ে বিস্ফোরিত হতো না। এই কারণে প্রাথমিক পরীক্ষার পরে এই প্রয়াস পরিত্যক্ত হয়। ইউ ও টি সি-র ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন অর্থনীতি বিভাগের অধ্যক্ষ ড. এম এ আতহার (এখন মরহুম)। ড. মল্লিক তাঁকে বলেন, প্রশিক্ষণের জন্যে ছাত্র বাছাই করে দিতে এবং ইউ ও টি সি-র ডামি রাইফেলগুলো সক্রিয় করার চেষ্টা করতে। কিছু ছাত্র বাছাই করা হয় বটে, কিন্তু ডামি রাইফেল সক্রিয় করা সম্ভবপর হয়নি। অল্প কয়েকটি রাইফেল ও গ্রেনেড জোগাড় করে নিতান্ত অল্পকালের জন্যে এসব ছাত্রকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল ক্যাম্পাস-সন্নিহিত পাহাড়গুলোর মধ্যভূমিতে।

একই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শামসুল আলমের (এখন অবসরপ্রাপ্ত) কাছে ঘন ঘন আসতেন চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ডা. আবু জাফর (মরহুম)। তাঁরা আত্মীয় ছিলেন কিনা জানি না, তবে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং একসঙ্গে কন্ট্রাক্ট ব্রিজ খেলতে ভালোবাসতেন। ডা. জাফর ছিলেন আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট সমর্থক এবং দলীয় নেতাদের বিশেষ আস্থাভাজন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তিনি বিশেষ যোগাযোগ রেখেছিলেন ই পি আরের ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের (পরে মেজর, বীর-উত্তম ও অবসরপ্রাপ্ত, বর্তমানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) সঙ্গে। প্রথমদিকে কেবল খবরাখবর আদান-প্রদান করতে এলেও ডা. জাফর শামসুল আলমের বাসায় সশস্ত্রবাহিনীর কর্মকর্তাদের এক সভার আয়োজন করেন ক্যাপ্টেন রফিকের পরামর্শে। ক্যাপ্টেন রফিকের *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে* (চতুর্থ সংস্করণ; ঢাকা, ১৯৯১) থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৭ মার্চ সন্ধ্যায় তিনি সেনাবাহিনীর কয়েকজন তরুণ বাঙালি অফিসারকে আমন্ত্রণ জানান তাঁর সারসন রোডের বাসায়। তাঁরা এলে তিনি জানতে চান যে, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্যে তাঁরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গ্রন্থাগারিক শামসুল আলমের বাসায় যেতে সম্মত কিনা। সবাই সম্মতি জানালে একটি গাড়িতে ডা. জাফর, আওয়ামী লীগ-নেতা আতাউর রহমান কায়সার ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন রফিক এবং অপর একটি গাড়িতে ক্যাপ্টেন অলি আহমদ (পরে কর্নেল, বীর বিক্রম, অবসরপ্রাপ্ত ও মন্ত্রী), ই পি আরের ক্যাপ্টেন হারুন আহমেদ চৌধুরী (পরে মেজর জেনারেল, বীর উত্তম ও অবসরপ্রাপ্ত), ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী (পরে ব্রিগেডিয়ার ও অবসরপ্রাপ্ত), লেফটেন্যান্ট শামসের মবিন চৌধুরী (পরে মেজর, বীর বিক্রম, অবসরপ্রাপ্ত ও রাষ্ট্রদূত) যান শামসুল আলমের বাসায়। সেখানে আধ ঘন্টা ধরে সেনা-কর্মকর্তারা পরিস্থিতি আলোচনা এবং সম্ভাব্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আলোচনার সময়ে বাসার চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন ডা. জাফর ও আতাউর রহমান কায়সার।

তখন সারা দেশে বয়ে যাচ্ছিল অস্থির সময়। দেশের প্রাণকেন্দ্র ঢাকায় বইছিল ঝোড়ো হাওয়া। ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে সবাই জেনেছে স্বাধীনতার ঘোষণা বলে। এর দিন দশেক পরে এক বক্তৃতায় মওলানা ভাসানী বলেছিলেন যে, 'মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, এ ব্যাপারে মতানৈক্য নেই।' সেই ঘোষণার সঙ্গে আমরা পেয়েছিলাম নতুন কর্মসূচি। ৩ মার্চ থেকে যে সত্যাগ্রহ শুরু হয় তা ৭ মার্চের পরে নেয় অহিংস অসহযোগের রূপ। সেই অসহযোগের কালে সেনানিবাস আর গভর্নর-ভবনের বাইরে কোথাও সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল না, সবকিছু চলেছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী যে গভর্নর টিক্কা খানকে শপথ-বাক্য পড়াতে অস্বীকার করেন, তা সারা পৃথিবীতে সংবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশময় বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সর্বস্তরের মানুষ, সরকারি কর্মচারীরাও শরিক হন তাদের সঙ্গে। শিল্পী-সাহিত্যিকেরা আয়োজন করেন বিক্ষোভ, মিছিল ও সমাবেশের, বর্জন করেন সরকারি খেতাব। কর্নেল ওসমানী ও মেজর জেনারেল মজিদের নেতৃত্বে সাবেক সৈন্যরা শপথ নেন দেশের জন্যে লড়াই করার। সকলেই আহ্বান জানাচ্ছে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার।

AMARBOI.COM

১৪ মার্চ ভুট্টো দাবি করলেন, দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে পৃথকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। এই প্রস্তাব পাকিস্তানের ধারণাগত ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করে। সে-বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং ১৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একান্তে বৈঠক করেন। পরদিন আলোচনা হয় একপক্ষে বিচারপতি কর্নেলিয়াস, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল পীরজাদা ও কর্নেল হাসান এবং অন্যপক্ষে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ ও ড. কামাল হোসেনের মধ্যে। মেজর সিদ্দিক সালিকের *উইটনেস টু সারেন্ডার* বইতে লেখা হয়েছে যে, ওই রাতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে জেনারেল টিক্কা খান সাক্ষাৎ করতে গেলে ইয়াহিয়া তাঁকে বলেন, 'হারামজাদা গোলমাল করছে, তোমরা প্রস্তুত হও।' রাত ১০টায় টিক্কা ফোন করেন জি ও সি মেজর-জেনারেল খাদিম হোসেন রাজাকে 'খাদিম, তোমরা এগোতে পারো।' পরদিন সকালে জি ও সি-র দপ্তরে মেজর-জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ও মেজর-জেনারেল রাও ফরমান আলি মিলিত হন। অফিস-

প্যাডের হালকা নীল কাগজে পেন্সিলে সুন্দর হস্তাক্ষরে রাও রচনা করেন "অপারেশন সার্চলাইট"—বাঙালি নিধনযজ্ঞের পরিকল্পনা। কিছু কিছু পরিবর্তন করে জেনারেল টিক্কা খান ও পাকিস্তান সেনাবাহিনী-প্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ খান ২০ মার্চ বিকেলে এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পরে—বোধহয় ২৩ মার্চে—তা অনুমোদন করেন। ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে তা-ই বাস্তবায়িত করা হয়।

এর মধ্যে লোক-দেখানো আলোচনা চলতে থাকে একদিকে, অন্যদিকে বিমানে করে পশ্চিমাঞ্চল থেকে আসতে থাকে সৈন্য। একদিকে তৈরি হচ্ছে আক্রমণের পরিকল্পনা, অন্যদিকে উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠক বসছে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট বলছেন, আলোচনার অগ্রগতি ঘটছে। তার মধ্যে এসে পৌঁছোন ভুট্টো—তিনিও পৃথক বৈঠক করেন ইয়াহিয়ার সঙ্গে।

কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠতে থাকে। ১৮ মার্চে ই পি আরের দুজন নায়েব-সুবেদার বিক্ষোভরত বাঙালিদের ওপর গুলি চালাবার আদেশ মানতে অস্বীকার করেন (২৫ মার্চের পরে তাঁদের হত্যা করা হয়)। ১৯ মার্চে জয়দেবপুরে সেনাবাহিনীর পাকিস্তানি সদস্যদের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ ঘটে এবং সেখানকার সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যেরা অস্ত্র-সমপর্ণ করার আদেশ অগ্রাহ্য করেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আবার স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ২৩ মার্চ পাকিস্তান-দিবস উদ্‌যাপিত হয় প্রতিরোধ-দিবসরূপে, এদিনে উড্ডীন হয় বাংলাদেশের নতুন পতাকা, গাড়িতে সেই পতাকা লাগিয়ে বঙ্গবন্ধু যান ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা করতে।

২৪ মার্চ চট্টগ্রামে লালদিঘি ময়দানে আহূত হয় বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ-সভা। স্ত্রী এবং দুই শিশুকন্যা নিয়ে আমি গাড়ি চালিয়ে আসি রেলওয়ে হাসপাতালে খোকনের ২২ তারিখে জাত পুত্রকে (তীব্র আলী) দেখতে। সবাইকে হাসপাতালে রেখে যাই ময়দানে। সেখানে সভাপতিত্ব করেন ড. এ আর মল্লিক, বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক আবদুল করিম, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম চৌধুরী ও অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ। বহু মানুষ জমায়েত হয়েছিল এই সভায়, হয়তো আরো অনেকে বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু সভা চলার সময়েই খবর এসে পৌঁছোয় যে, *সোয়াত* জাহাজ থেকে পাকিস্তানিরা অস্ত্র খালাসের চেষ্টা চালাচ্ছে এবং তাদের বাধা দেওয়ার জন্যে হাজার হাজার মানুষ বন্দর-এলাকা ঘিরে রেখেছে ও শহরের বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড বসানো হচ্ছে। সভা স্থগিত করে যে যার জায়গায় ফিরে আসতে চেষ্টা করেন সকলে। আমি রেলওয়ে হাসপাতালে এসে স্ত্রী-কন্যাকে গাড়িতে নিয়ে কোনোমতে ক্যাম্পাসে গিয়ে পৌঁছোই। কিন্তু আমাদের সহকর্মীরা তখনো ফিরে আসতে পারেননি। যেমন, সৈয়দ আলী আহসান্ সভাস্থল থেকে তাঁর ছোট মেয়ে নাসরিন ও জামাই মাহমুদ শাহ্ কোরেশীকে তাঁদের শহরের বাসভবন থেকে তুলে নিয়ে যখন ক্যাম্পাসে ফেরার চেষ্টা করেন, তখন সেনানিবাসের কাছে গাছ কেটে

AMARBOI.COM

ও ট্রাকের সারি দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সেনানিবাসের উল্টোদিকের গ্রামের মধ্যে দিয়ে তিনি আসতে বাধ্য হন এবং গাড়ি চলার অনুপযোগী পথ ধরে আসতে তাঁর অনেক রাত হয়ে যায়। মোহাম্মদ শামসুল হক ও গণিত বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক রশীদুল হক ওই পথ ধরে ফেরেন গভীর রাতে। ড. মল্লিক ফেরেন রাঙ্গুনিয়া হয়ে। যতোদুর মনে পড়ে, কেউ কেউ ওই রাতে শহরে থেকে যান এবং বহু কষ্টে পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীও সে-রাতে শহরে পিত্রালয়ে রয়ে যান এবং পরদিন ফোন করে তাঁর অর্ডারলি-পিয়ন সিরাজ মিয়াকে (সে গাড়ি চালাতে জানতো, এখন বিশ্ববিদ্যালয়েরই নিয়োগপ্রাপ্ত ড্রাইভার) দিয়ে আমার গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে বলেন তাঁকে আনতে। সিরাজ স্থানীয় লোক, পথঘাটের খুঁটিনাটি তার জানা ছিল। সে নিরাপদে নিয়ে এলো মোহাম্মদ আলীকে।

২৪ তারিখে দেশের নানা জায়গায় সেনাবাহিনী গুলি চালনা করে। সৈয়দপুরে ১৫ জন মারা যায়। জি ও সি মেজর-জেনারেল খাদিম চট্টগ্রামে এসে সেনানিবাসের সি ও ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে সঙ্গে করে ঢাকায় নিয়ে যান আর রেখে যান অপারেশন সার্চলাইটের কপি। ২৫ তারিখে *সোয়াত* জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে বাধা দিতে গিয়ে সামরিক বাহিনীর গুলিতে চট্টগ্রামে মারা যায় ২০জন। এর প্রতিক্রিয়ায় চট্টগ্রামে বহু বেসামরিক অবাঙালির বাড়িঘর আক্রান্ত হয়। ২৫ তারিখে ইংরেজি বিভাগের প্রভাষিকা লিলি ইসলাম বিপন্ন অবস্থায় নাসিরাবাদ আবাসিক এলাকা থেকে টেলিফোন করে সাহায্যপ্রার্থনা করেন আমার, চেয়ে পাঠায় আমার গাড়ি। আমি বলি, গাড়ি গেছে মোহাম্মদ আলীকে আনতে, এ-অবস্থায় আমি যাবোই বা কী করে আর কীই বা সাহায্য করতে পারি। লিলি, মনে হয়, আমার কথা বিশ্বাস করেনি সবটুকু। আর্তকণ্ঠে সে বলতে থাকে, আমাদের মেরে ফেলবে, মেরে ফেলবে, কেউ রক্ষা পাবো না। আপনি সাহায্য করবেন না, কিছু করবেন না? ওই অবস্থায় কী করে তাকে বোঝাই যে আমার অপারগতা ঔদাসীন্যজনিত নয়, জাতিবৈরজনিত নয়। লিলির এই কাতরতা অনেকদিন আমাকে তাড়না করেছিল। বহু পরে জানতে পারি, কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির সমষ্টিগত চেষ্টায় তারা সবাই বেঁচে গিয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু সেদিন সারা দেশে ধর্মঘট পালনের দিন ধার্য করেন ২৭ মার্চ। শহরের সঙ্গে সেই ২৪ রাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার সড়ক-যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। আমরা গভীরতর উৎকণ্ঠার আবর্তে নিক্ষিপ্ত হই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪.

২৫ মার্চ রাত এগারোটার দিকে ভাইস-চান্সেলর ড. মল্লিক বাসায় ফোন করে বললেন তাঁর অফিসে যেতে। সেখানে গিয়ে বুঝলাম, তিনি আরো অনেককে খবর দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রেজিস্ট্রার মুহম্মদ খলিলুর রহমান, আমার সঙ্গে ইংরেজি বিভাগের ওসমান জামাল। একে একে আরো জড়ো হলেন সৈয়দ আলী আহসান, আবদুল করিম, মোহাম্মদ শামসুল হক, রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী, ফজলী হোসেন ও মাহবুব তালুকদার। ড. মল্লিক বললেন, চট্টগ্রাম শহর থেকে অজ্ঞাতপরিচয় কোনো ব্যক্তি তাঁকে টেলিফোন করে জানিয়েছেন যে, ঢাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছে, পথে পাকিস্তানি সেনারা নেমে পড়েছে এবং শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হয়েছেন। খবরটা যাচাই করা দরকার। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় আমরা যে-যার পরিচিত জনের কাছে সংবাদ নেওয়ার চেষ্টা করলাম। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট সাংবাদিক মঈনুল আলম হেসেই খবরটা উড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'বঙ্গবন্ধু এমন জায়গায় আছেন যে কেউ তাঁর কাছে পৌঁছোতে পারবে না।' তিনি এতো নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, শেষে রহস্য করে বললেন, 'শেখ সাহেব যদি গ্রেপ্তার হয়ে থাকেন তো হয়েছেন, আমি এখন ঘুমোতে যাই।' ঢাকায় আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীকে পাওয়া গেলো তাঁর বাসায়। জানালেন, একটু আগে *পূর্বদেশ* থেকে তিনি ফিরেছেন, অস্বাভাবিক কিছু ঘটার খবর পান নি। *ইত্তেফাক* অফিস থেকে কেউ বললেন, ট্যাঙ্ক বেরিয়েছে বলে তাঁরা শুনেছেন, দূরে দু-এক জায়গায় আগুনের আভার মতো দেখা যাচ্ছে, তার বেশি কিছু জানা নেই। আরেক সূত্র বললেন, কারফিউ জারির গুজব শোনা যাচ্ছে, তবে কেউ যে তেমন ঘোষণা শুনেছে, তা জানা যায় নি। এক ফাঁকে ড. মল্লিক পেয়ে গেলেন তাঁর আত্মীয় কুমিল্লার ডি সি শামসুল হক খানকে। তিনি কেন জানি বিপন্ন বোধ করছিলেন।

পরে জানতে পারি, ওই রাতেই পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে যায় এবং হত্যা করে।

চট্টগ্রাম এবং ঢাকায় যেসব টেলিফোন নম্বরে আমরা যোগাযোগ করতে চেয়েছিলাম, তার বেশির ভাগই ব্যস্ত ছিল। নেতৃস্থানীয় অনেককেই বাসায় পাওয়া গেলো না। আমরা বুঝতে পারছিলাম যে, সবাই খোঁজ-খবর নিচ্ছেন এবং ভয়ানক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। রাত বারোটায় বা তার পরপরই ঢাকার সঙ্গে আমাদের টেলিফোন-যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেলো। আমাদের আশঙ্কা যে সত্যে পরিণত হতে যাচ্ছে, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ রইলো না।

তবু আমরা বহুক্ষণ ভাইস-চান্সেলরের অফিসে বসে রইলাম, যদি কোনো খবর কেউ জানায়, এই আশায় এবং ওই মুহূর্তে সকলে একসঙ্গে থাকলে বল পাওয়া যায়, সেই ভরসায়। স্থির হলো, সকালে আবার আমরা এখানেই মিলিত হবো এবং প্রকৃত অবস্থা জানার চেষ্টা করবো।

২৬ মার্চ খুব ভোরে আবদুল আলী ওরফে খোকনের ফোন পেলাম। সে কথা বলছে সি আর বি পাহাড় থেকে। ই পি আরের ক্যাপ্টেন রফিক আগের রাতে স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ শুরু করেছেন এবং ওই মুহূর্তে তিনি তার সামনেই আছেন। এই খবর দিয়ে আলী টেলিফোন তুলে দিল ক্যাপ্টেন রফিকের হাতে। তাঁর সঙ্গে তখন আমার পরিচয় ছিল না, টেলিফোনেই প্রথম সম্ভাষণ। তিনি বললেন, তাঁরা আমরণ লড়াই করবেন, একথা যেন সবাইকে জানিয়ে দিই। বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার সংলগ্ন সেনানিবাস সম্পর্কে তিনি জানতে চাইলেন। সেনানিবাসের দিকে আমরা যেন যতোটা সম্ভব সতর্ক দৃষ্টি রাখি এবং বড় রকম কোনো চলাচলের আভাস পেলে আলীর মাধ্যমে তাঁকে যেন জানাই।

সকাল বেলায় রেডিও খুলে শুনতে পেলাম ভারি গলায় উর্দু-ঘেঁষা বাংলা উচ্চারণে কেউ এক-দুই করে সামরিক আইনের বিধির ফিরিস্তি পড়ে শোনাচ্ছে। যতোগুলো কেন্দ্র ধরতে পারলাম, তাতে ঢাকার অনুষ্ঠানই রিলে করা হচ্ছে। দেশে যে কী ঘটেছে, তা বুঝতে বাকি রইলো না।

খানিক পরে ভাইস-চান্সেলরের অফিসে জড়ো হওয়ার পর জানা গেলো, আওয়ামী লীগ-নেতা এম আর সিদ্দিকীর সঙ্গে এবং খুব সম্ভব, এম এ হান্নানের সঙ্গেও, টেলিফোনে কথা হয়েছে ড. মল্লিকের। এভাবেই ঢাকা ও চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন এবং আগের সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু যে এম আর সিদ্দিকীকে প্রতিরোধ-সংগঠনের আহ্বান জানান, তাও তিনি শুনতে পান। এই সূত্রেই জানা গেলো যে, উত্তেজিত জনতা চট্টগ্রাম শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং পাকিস্তানি সেনাদের চলাচল রোধ করার জন্যে তারা ক্যান্টনমেন্টের প্রবেশ-পথ একরকম বন্ধ করে রেখেছে। ক্যাপ্টেন রফিকের সঙ্গে আমার কথোপকথনের বিষয় নিয়ে আমরা সকলে আলাপ করি। তারপর যোগাযোগ করা হয় সি এস আই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর–এর চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ড. আবদুল হাইয়ের সঙ্গে। স্থির হয় যে, তিনি এবং তাঁর এক সহকর্মী দুরবিন দিয়ে ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাদের জানাবেন। চট্টগ্রাম শহরে সংগ্রাম পরিষদের সদর দপ্তরের সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ স্থাপন করি। সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরা পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণে ক্ষুব্ধ ও তিক্ত হলেও প্রতিরোধের সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন।

এর কয়েকদিন আগে ঢাকা থেকে আমার শ্যালক আজিজুল ওয়াহাব তার স্ত্রী রুবা ও কয়েক মাস বয়সের কন্যাকে নিয়ে আমার বাসায় উঠেছিল। বন্দর থেকে কিছু মাল ছাড়ানো ছিল তার উদ্দেশ্য, তবে একই সঙ্গে কলা বেচা ও রথ দেখার লক্ষ্যে স্ত্রী–কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল গাড়িতে করে। আজিজ সকালেই মনে করিয়ে দিল যে, কিছু অত্যাবশ্যক জিনিস, বিশেষত, শিশুদের জন্যে গুঁড়ো দুধ, এখনই কিনে রাখা দরকার। ভাইস–চান্সেলরের অফিস থেকে বেরিয়ে তাই হাটহাজারী বাজারে গেলাম কিছু কেনাকাটা করতে। গিয়ে দেখলাম, আরো অনেকেই এসেছেন একই উদ্দেশ্যে। তবে মাসের শেষ এবং ব্যাংক বন্ধ বলে অনেকের কাছেই টাকা–পয়সা যথেষ্ট ছিল না। তাই বাজার উজাড় হয়ে যাচ্ছিল না। তবে মজুত কম বলে পেট্রোল পাম্প থেকে গাড়িপ্রতি অল্প করেই পেট্রোল দেওয়া হচ্ছিল। বাজার করার সুযোগে হাটহাজারী থানায় গিয়ে কর্তব্যরত পুলিশদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিলাম। রাজারবাগের খবর তাৎক্ষণে তাঁরা পেয়ে গেছেন, ফলে সকলেই বেশ উদ্‌বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত।

বেলা তিনটের দিকে সংগ্রাম পরিষদের সদর দপ্তর থেকে ছাত্রলীগের এককালীন নেতা ও প্রতিরোধ–সংগ্রামের কর্মী রফিকুল আনোয়ার বাসায় আমাকে ফোন করে বলেন একটা জরুরি বার্তা লিখে নিতে। আমি কাগজ–কলম নিয়ে বসি এবং তিনি যেমন যেমন বলেন তেমনটিই লিখে নিই। এটাই ছিলো বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা–ঘোষণা—ভাষ্যটা ছিল ইংরেজিতে। রফিকুল আনোয়ার অনুরোধ করেছিলেন, আমি যেন এটা ক্যাম্পাসে প্রচার করার ব্যবস্থা করি। তা করতে গিয়ে জানতে পারলাম যে, এরই মধ্যে চট্টগ্রাম বেতারের ফ্রিকোয়েন্সিতে স্বাধীন বাংলা বেতার–কেন্দ্রের অনুষ্ঠান থেমে থেমে শোনা যাচ্ছে এবং সেই বেতার–কেন্দ্র থেকে এম এ হান্নান একই ঘোষণার বাংলা পাঠ পড়ে শুনিয়েছেন। যখন বার্তাটি আমি লিখে নিই তখন গভীর বেদনার মধ্যেও রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম। স্বাধীন বাংলা বেতার–কেন্দ্রের কথা জেনে আবার রোমাঞ্চ ও আশার সঞ্চার হলো।

সন্ধ্যায়, আমাদের একত্র হওয়ার সময়ের আগেই, ভাইস–চান্সেলর আবার এত্তেলা পাঠালেন। তাঁর অফিসে গিয়ে শুনলাম, রাঙামাটির ডি সি এইচ টি ইমাম টেলিফোনে তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, সীমান্ত–অঞ্চল থেকে ই পি আরের বাঙালি সদস্যদের পাঠানো হচ্ছে চট্টগ্রাম সেনানিবাস ঘিরে রাখার জন্যে। বিশ্ববিদ্যালয়–ক্যাম্পাসেই তাঁদের বেজ ক্যাম্প করে দিতে হবে। অর্থাৎ খাওয়া–দাওয়া, চলাফেরা

এবং সংবাদ-সংগ্রহের সমুদয় ব্যবস্থা করতে হবে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল দুটিমাত্র হল এবং আলাওল হলের প্রোভোস্ট ছিলেন রফিকুল ইসলাম চৌধুরী আর আমি এ এফ রহমান হলের। তাৎক্ষণিক দায়িত্ব তাই আমাদের দুজনের ওপর পড়লো। আমি হলে গিয়ে হাউজ টিউটর এবং কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আবার ভাইস-চান্সেলরের অফিসে ফিরে এলাম।

নায়েক-সুবেদার আবদুল গনির নেতৃত্বে সৈন্যেরা এলেন—তবে প্রত্যাশিত সময়ের অনেক পরে। সকলের বিশ্রাম ও খাবারের ব্যবস্থা হলে সুবেদার গনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিপ নিয়ে গন্তব্য এলাকা পরিদর্শন করলেন এবং ভাইস-চান্সেলরের অফিসে এসে আমাদের সাহায্য নিয়ে এলাকার একটা ম্যাপ তৈরি করে কৌশলের দিকটা বিবেচনা করতে থাকলেন। সেইসঙ্গে যুদ্ধজয় সম্পর্কে তাঁর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসও প্রকাশ পেল। এঁদের আগমনবার্তা আমরা শহরে সংযোগরক্ষাকারীদের জানিয়ে দিলাম। ড. হাইয়ের সঙ্গেও খবর আদানপ্রদান হলো।

ই পি আরের আগমনবার্তা বিদ্যুদ্বেগে ছড়িয়ে গেলো। আশপাশের গ্রামবাসী সেই রাত থেকেই চাল-ডাল, তরি-তরকারি, হাঁস-মুরগি, ফল-মূল নিয়ে আসতে থাকলেন। শামসু নামে এক গ্রামবাসী দুরধিগম্য পথে গাড়ি চালাবার দায়িত্ব নিতে চাইলো এবং তাকে সে কাজ দেওয়াও হলো (স্বাধীনতার পর তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মে নিয়োগ করা হয় এবং কিছুকাল আগে তার অপমৃত্যু ঘটে)। প্রত্যেকেই যথাসাধ্য করতে চাইলেন। ওই রাতেই আমাদের এলাকার প্রাদেশিক পরিষদ্-সদস্য আবদুল ওয়াহাব এলেন, আমাদের এবং সৈন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন।

সেই রাত থেকেই সেনানিবাসের দুপাশ ঘিরে ই পি আর মোতায়েন হলো। ভাইস-চান্সেলরের অফিস পরিণত হলো এক ধরনের সমর-দপ্তরে। ড. মল্লিক স্বভাবত অধিনায়কত্ব গ্রহণ করলেন সহজেই এবং আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো তাঁর সার্বিক সহকারীর। বোধ করি, পরদিন তাঁর সাংকেতিক নামকরণ হয় ড্যানিয়েল। যাঁদের সঙ্গে আমাদের জরুরি যোগাযোগের দরকার তাঁদের সাংকেতিক নামও মল্লিক সাহেবকে জানানো হয়। তবে সাংকেতিক নামকরণের কারণ যে গোপনীয়তা-রক্ষা, তিনি প্রায়ই তা বিস্মৃত হতেন। একদিন সাংকেতিক নামে এস পি শামসুল হককে (এর কয়েকদিন পরই শহীদ হন) না পেয়ে তিনি আসল নামে তাঁকে খোঁজ করেন এবং টেলিফোন যিনি ধরেছিলেন তাঁকে অকপটে জানিয়ে দেন, 'আমি ড্যানিয়েল বলছি, ড. মল্লিক, চিটাগং ইউনিভার্সিটির ভাইস-চান্সেলর।'

শিক্ষক ও অফিসারদের মধ্যে নানারকম দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। হাটহাজারীর দুটি পেট্রোল পাম্পের মালিককে ডেকে বলা হয় যে, তাঁরা যেন কেবল ড. করিমের স্বাক্ষর করা চিরকুট-অনুযায়ী গাড়িতে পেট্রোল দেন এবং নগদ দেওয়া সম্ভব না হলে যেন বাকিতে দেন। তাঁরা শেষ পর্যন্ত তা করেছিলেন, তবে চিরকুটে স্বাক্ষর থাকার জন্যে পরে ড. করিমকে কিছুটা বিপদগ্রস্ত হতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক এবং ইউ ও টি সির লেফটেন্যান্ট মুহাম্মদ ইনাম-উল হক (এখন কুষ্টিয়ার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) ছাত্রদের নিয়ে একটা সশস্ত্র দল গঠন করে প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করেন প্রথম কয়েকদিন। ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয় শারীরিক প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক আ স আ জহুরুল হোসেনকে। অচিরেই ক্যাম্পাসের বিদ্যুৎ সংযোগ চলে যায়। দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম, রাতে ভূতুড়ে পরিবেশ। বেশি রাত হলে টেলিফোন অপারেটররাও এক্সচেঞ্জে থাকতে ভয় পেতেন।

২৭ মার্চে জানা গেলো, স্বাধীন বাংলা বেতার-কেন্দ্র থেকে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। আমি নিজে অবশ্য সে ঘোষণা শুনিনি, তবে ক্যাম্পাসে অনেকেই শুনেছিলেন। এ সংবাদে আমরা সবাই খুব উল্লসিত হলাম, প্রেরণা ও ভরসা লাভ করলাম। ড. মল্লিক অবশ্য বললেন যে, মেজর জিয়া নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা করেছেন— এতে দেশ-বিদেশে ভুল বোঝাবুঝি হবে। তিনি অনেক কষ্টে হান্নানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে কথাটা বলেন। তখনই জানা যায় যে, চট্টগ্রামের রাজনৈতিক নেতাদেরও একই প্রতিক্রিয়া হয়েছে। পরে শুনতে পাই যে, সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ কে খান একটা নতুন খসড়া রচনা করে দেন এবং মেজর জিয়া তা বেতারে পাঠ করেন ২৮ মার্চে। এই ভাষণে জিয়া বলেছিলেন যে, তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে। এই ঘোষণাটি বেতারে আমি শুনেছিলাম।

সম্ভবত ২৭ মার্চেই স্বাধীন বাংলা বেতার-কেন্দ্র থেকে ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়া (এখন মেজর-জেনারেল) আহ্বান জানান, পাক-সেনাদের প্রতিরোধ করার জন্যে যার যা অস্ত্রশস্ত্র আছে, তা নিয়ে লালদিঘিতে সমবেত হতে। আগের দিন থেকেই চট্টগ্রামের আকাশে মাঝে মাঝেই বিমানবাহিনীর উড়োজাহাজ দেখা যাচ্ছিল। বেতারের ঘোষণা শুনে ড. মল্লিক বললেন, লালদিঘিতে সবাই একত্র হলে নির্ঘাৎ এয়ার স্ট্রেফিং হবে এবং বহু লোক অকারণে মারা যাবে। তিনি কালুরঘাটে ফোন করেন এবং ক্যাপ্টেন ভূঁইয়াকে কিংবা বেতার কেন্দ্রের কাউকে বিপদের ঝুঁকিটা বুঝিয়ে এই ঘোষণা বাতিল করাতে সমর্থ হন।

শত্রুসৈন্যের অভিযানের মুখে ২৮ মার্চ থেকে স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধরত সেনারা পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করে। কোনো কোনো সংযোগ-ক্ষেত্রের সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন হতে আরম্ভ হয়। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় এইদিন আমাদের বন্ধু ও রেলওয়ের জনসংযোগ-কর্মকর্তা আতাউর রহমান (পরে শহীদ হন) রেলওয়ে হাসপাতাল থেকে আবদুল আলীর স্ত্রী ও পুত্রকে সরিয়ে নিয়ে যান নিরাপদ আশ্রয়ে। আলী রয়ে যায় বাটালি পাহাড়ের বাসায় কন্যা দিশাকে নিয়ে। পরে তাদেরকেও বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যেতে হয়েছিল। অবর্ণনীয় দুর্দশাভোগের পর স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে তার অনেক সময় লেগেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভবত ২৮ তারিখ গভীর রাতে খবর পাওয়া গেলো যে, ক্যাম্পাসের ভেতরে একজন পাকিস্তানি সেনা–কর্মকর্তার লাশ কেউ ফেলে গেছে। খবরটা আনলেন নূরুল আমিন— একজন সাবেক সৈনিক (স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মে যোগ দিয়েছিলেন)। তিনি এ সময়টা খুব আসা–যাওয়া করতেন—তাঁর আনুগত্য সম্পর্কে কারো কারো মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। তাঁর ধারণা হলো শিয়ালভূক্কায় এঁকে মেরে কেউ এখানে ফেলে গেছে। সেই রাতেই তাঁকে কবর দেওয়া হলো ক্যাম্পাসে। আমরা কয়েকজন মাত্র বিষয়টা জানলাম। চট্টগ্রাম দখল করার পরে পাক–সেনারা ওই কর্মকর্তা বা তার দেহাবশেষের খোঁজে কিন্তু ঠিকই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিল।

ড. মল্লিক বেশ অবিচলিতভাবেই তাঁর নতুন ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিলেন, বোধহয় খানিকটা উপভোগও করছিলেন। একদিন বেলুচ রেজিমেন্টের এক বাঙালি মেজর পালিয়ে ক্যাম্পাসে আসেন, কিন্তু তাঁর চালচলন ও কথাবার্তা একটু সন্দেহজনক মনে হয়। ভাইস–চান্সেলর আমাকে বলেন, ই পি আরের জনচারেক জওয়ানকে নিয়ে এসে তাঁকে নিরস্ত্র ও গ্রেপ্তার করতে। তাই করা হয়। পরে মেজর জিয়ার সঙ্গে কথা বলে তাঁর সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

বোধহয় ২৯ তারিখে ই পি আরের জওয়ানদের মধ্যে কেউ ক্যাম্পাস–সীমানা থেকে একটি পাকিস্তানি হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এর প্রতিক্রিয়ায় ক্যান্টনমেন্ট থেকে কিছু সৈন্য গিয়ে ড. আবদুল হাই ও তাঁর সহকর্মীদের বাড়ি তল্লাসি করে এবং তাঁদের টেলিফোন–সংযোগ কেটে দেয়। হাই সাহেবের একটি রাইফেল ছিল—যদিও তা ব্যবহৃত হয় নি, সেটা ধরা পড়লে তাঁর আর রক্ষা থাকতো না। তবে ওঁরা বাড়ি ছেড়ে দিলেন। ওঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেলো। ওঁর সহকর্মী পায়ে হেঁটে ক্যাম্পাসে এসে আমাদের খবরটা দিয়ে নাজিরহাটের দিকে চলে গেলেন।

ওইদিন দুঃসংবাদ এলো। ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক আবদুর রব এবং তার সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর ছেলে সাইফুদ্দীন ও আরো কয়েকজন চট্টগ্রাম ইনজিনিয়ারিং কলেজের সামনে পাক–বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে শহীদ হয়েছে। আমাদের আরেকজন ছাত্র—ড. আবু জাফরের শ্যালক—ফরহাদের শহীদ হওয়ার সংবাদও ২৯ বা ৩০ তারিখে পাই। মনটা খুব ভেঙে পড়ে। আকাশবাণী মারফত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র–শিক্ষক–হত্যাযজ্ঞের সংবাদ পেয়ে আমরা যে কী পরিমাণে বিচলিত হই, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অবশ্য ঢাকার প্রকৃত ও অতিরঞ্জিত খবর মুখে মুখে প্রচারিত হয়েও আমাদের কাছে আসছিল এবং আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলছিলাম।

২৯ তারিখে পাকিস্তানিরা আরো সাফল্য লাভ করে, চট্টগ্রামের অনেকখানি তাদের দখলে চলে আসে। তখনই ক্যাম্পাসবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাম্পাসে ছাত্র প্রায় ছিলই না, দু-চারজন যাও ছিল, তারা এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছিল। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেশিরভাগই ছিলেন পরিবার নিয়ে। তাঁরা আমাকেই বারবার নিজেদের উৎকণ্ঠার কথা বলতে থাকলেন। অগ্রসরমান পাকিস্তানিদের রুখতে রাউজান ও নাজিরহাটের রাস্তায় প্রতিবন্ধক পড়বে বলেও নিশ্চিত জানা গেলো স্থানীয় রাজনৈতিক সূত্রে। ই পি আরের কয়েকজন আহত সৈন্য ছাড়া বাকিরাও যেন কোথায় চলে গেলেন আমাদের না বলে। সুতরাং ক্যাম্পাসে আর কেউ নিরাপদ বোধ করছিলেন না।

তাঁরা অবশ্য জানতেন না যে, আমাদের সঙ্গে শহরের রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক কর্তাদের যোগাযোগও ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ২৯ তারিখ থেকে। সুতরাং আমরাও বুঝতে পারছিলাম যে, এতোজনকে বিপদের মধ্যে রাখা ঠিক হবে না। এম পি এ ওয়াহাবও আমাদের সঙ্গে একমত হলেন। ড. মল্লিক প্রথমে বললেন, শুধু মেয়ে ও শিশুদের সরিয়ে দেওয়া হবে। আমরা অন্যেরা বললাম, পুরুষদের কেউ স্বেচ্ছায় থাকলে থাকবেন, ওরকম নিয়ম করে দেওয়া ঠিক হবে না। শেষে স্থির হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে করে রাউজান ও নাজিরহাট— এই দুই পথে সবাইকে সরিয়ে নেওয়া হবে। যাঁদের নিজেদের আশ্রয় আছে, তাঁরা সেখানে চলে যাবেনা। যাঁদের নেই, তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হলো কুণ্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের হস্টেলে। নূতনচন্দ্র সিংহ (শহীদ) স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পুত্র প্রফুল্লরঞ্জন সিংহকে দিয়ে এই আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন।

AMARBOI.COM

৩০ মার্চ বিমান-আক্রমণের ফলে স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রচার বন্ধ হয়ে গেলো। বলা যায়, কালুরঘাটের পতন হলো। দিনভর চললো ক্যাম্পাস থেকে অপসারণের পালা। সপরিবার ড. মল্লিক রয়ে গেলেন নিজ ভবনে, রেজিস্ট্রার মুহম্মদ খলিলুর রহমান ও আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে রাতে থাকলাম। দুজন ডাক্তার, কয়েকজন আহত সৈনিক ও চতুর্থ শ্রেণীর কিছু কর্মচারী ছাড়া আর কেউ রইলেন না ক্যাম্পাসে। ৩১ মার্চ এক ফাঁকে খলিল সাহেব ও আমি কুণ্ডেশ্বরীতে গিয়ে নিজেদের পরিবারকে দেখে এলাম, অন্যদের সঙ্গেও কথা বলে এলাম। পরদিন ১ এপ্রিল বিকেলে, মেডিক্যাল অফিসার ডা. আবুল বশর ও সহকারী মেডিক্যাল অফিসার ডা. কে এম আখতারুজ্জামানের দায়িত্বে আহত সৈনিকদের রেখে আমরাও ক্যাম্পাস ত্যাগ করলাম। ড. মল্লিক পরিবার নিয়ে গেলেন রাউজানে এক প্রাক্তন ছাত্রের বাড়িতে। খলিল সাহেব ও আমি কুণ্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের হস্টেলে আমাদের পরিবারের সঙ্গে মিলিত হলাম।

ক্যাম্পাস ত্যাগ করার আগে আমার হলের দুই দারোয়ান তাদের বাড়িতে আমাকে সপরিবার চলে যেতে বলেছিল। মুনশী মিয়ার বাড়ি জোবরায়— ক্যাম্পাস-সংলগ্ন, আবুল খয়েরের বাড়ি কাটিরহাটে— নাজিরহাটের পথে। সংবাদপত্রের হকার ফজলুও আমাদের যেতে বলেছিল তাদের বাড়িতে—ক্যাম্পাসের ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্টোদিকে ফতেপুর গ্রামে। ১ তারিখে ক্যাম্পাস ছাড়ার আগে বলে গেলাম প্রয়োজনমতো তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো।

ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে বড়ো রাস্তায় পড়ে একবার পেছন ফিরে তাকালাম। সুউচ্চ ভবনগুলো দেখা যাচ্ছে। কেবল স্মৃতি নয়, অনেক কিছু ফেলে যাচ্ছি। ভাবছি, আরেকবার এসে কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে যাবো। আবার ভাবছি, ফিরে আসতে পারবো তো? পারলেও তা কবে—সে জিজ্ঞাসার উত্তর জানা ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫.

এমন উত্তেজনা ও কর্মব্যস্ততার মধ্যে এ কদিন কেটে গেল যে, যেসব গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা মনে আসতে লাগলো, সেগুলোর জন্যে সময় দিতে পারিনি। ক্যাম্পাস ছাড়ার পরে কর্মহীন অবসরে সেগুলোই এখন প্রধান হয়ে দাঁড়ালো।

২৫ মার্চ রাত থেকেই বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত অবস্থা জানতে চাইছিলাম, কিন্তু পাইনি। স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রথমেই বলা হয়েছিল যে, তিনি আত্মগোপন করে যুদ্ধ চালাচ্ছেন। কথাটা সত্য বলে ভাবতে ইচ্ছে হয়েছিল, তবু শেষ পর্যন্ত তা আর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। ব্যাপারটা ঠিক হলে এ কদিনে একবার না একবার ওই বেতার থেকেই তাঁর কণ্ঠ নিশ্চয় শোনা যেত। আমাদের অনেকেরই মনে হয়েছিল, তিনি যদি সত্যি সত্যি আত্মগোপন না করে থাকেন, তবে অমন দাবি করাটা ঠিক হচ্ছে না। কারণ পাকিস্তানিরা তাঁকে হত্যা করে বলতে পারে, তিনি তাদের হাতে নেই। ৩১ মার্চের মধ্যে আমাদের দৃঢ় ধারণা হলো যে, তিনি পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে যে, প্রশ্নটা মনে জাগল, তা এই যে, তাহলে কী হবে যুদ্ধের? জাতীয় পর্যায়ের আর কোনো নেতার কথাও জানতে পারছি না; কেউ বঙ্গবন্ধুর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, এমন কোনো খবর নেই। চট্টগ্রামে সামরিক প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে, তাও স্পষ্ট। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছেন। অবশ্য প্রফুল্লরঞ্জন সিংহ খবর দিলেন যে, তাঁরা ৩০ মার্চে এম আর সিদ্দিকীকে সীমান্ত পার করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তারই বা তাৎপর্য কী?

ঢাকায় কারা নিহত হয়েছেন, তা ভালো বোঝা যাচ্ছে না। যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরাই বা কেমন আছেন, তাও জানবার উপায় নেই। আমার বৃদ্ধ পিতা, ছোট ভাই, বড় বোন, আমার শ্বশুর-শাশুড়ি—এঁদের পরিবারের ওপর দিয়ে কোনো ঝড়-ঝাপ্‌টা বয়ে যাচ্ছে কিনা, কে জানে!

এখন আমরা কী করব? কী হবে আমাদের? কী আছে বাঙালির ভাগ্যে?

কুণ্ডেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের হস্টেলে এসে পৌঁছোতে সবাই এই প্রশ্নগুলো করতে লাগলেন : এখন কী হবে, এখানে আমরা কী নিরাপদ, সে নিরাপত্তাই বা কতদিন থাকবে? ঢাকার খবর কী, দেশের অন্যত্র কী ঘটছে? আমি যে তাঁদের চেয়ে বেশি জানতাম, তা নয়; তবু তাঁরা মনে করলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাঁটি থেকে যেহেতু রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের সঙ্গে আমাদের কয়েকজনেরই যোগাযোগ ছিল এবং যেহেতু তাঁদের পরে আমি ক্যাম্পাস ছেড়েছি, সুতরাং আমি হয়তো বাড়তি কিছু জানব। আসলে প্রত্যেকেই শুনতে চাইছিলেন আশার বাণী, সান্ত্বনার কথা। কিন্তু আমার পক্ষে তো মিথ্যে আশ্বাস দেওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। সুতরাং আমরা প্রশ্ন–বিনিময় করলাম মাত্র এবং বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হলাম।

কুণ্ডেশ্বরীতে দেখলাম বড্ড ভিড়। আমাদের বহু সহকর্মী আছেন সপরিবার, রাউজান এলাকার আরো কিছু পরিবারও এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। এখানে বেশিদিন থাকা সম্ভবপর নয়। তার ওপর, প্রফুল্ল সিংহ নিজেও বলছেন, খুব বেশিদিন জায়গাটা নিরাপদ থাকবে না, পার্বত্য চট্টগ্রামের দিক থেকে পাক–সেনারা এসে পড়বে। তাহলে আমরা কোথায় যাবো?

আমার শ্যালক আজিজ বলল, ‘এমন জায়গায় চলেন যেখান থেকে বর্ডারের দিকে যাওয়া যায়।’

আমি বললাম, ‘তুমি কি পাগল হলে? বর্ডার দিয়ে কী হবে আমাদের?’

আজিজ বলল, ‘চট্টগ্রামে থাকা বা ঢাকায় ফেরা—কোনোটাই সম্ভব হবে না। দরকার হলে সীমান্ত পার হয়ে যেতে হবে।’

‘ওখানে গিয়ে কী করব, খাবো কী?’—আমার প্রশ্ন।

সে বলল, ‘আপাতত আত্মীয়–স্বজনদের ঘাড়ে চাপা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তার আগে এমন কোথাও যাওয়া যাক যেখান থেকে ওদিকে যাওয়া যাবে।’

অতএব কাটিরহাটে গিয়ে থাকব বলে স্থির করলাম। অবস্থার উন্নতি হলে সেখান থেকে ক্যাম্পাসে ফেরা যাবে, নয়তো অনিশ্চয়তার পথে যাত্রা। পরদিন ভোরে ফজলু দেখা করতে এলে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে বললাম, ‘আবুল খয়েরকে বোলো, ওদের ওখানে আমাদের দুই পরিবারের থাকার ব্যবস্থা করে রাখতে। দুপুরের মধ্যেই চলে যাবো।’

আমাদের হাবভাব দেখে সহকর্মীরা জানতে চাইলেন : ‘আপনি কি অন্য কোথাও যাবার প্ল্যান করছেন? এখানে কি বিপদের ভয় আছে? আমাদের বলে যাবেন কিন্তু।’

সবাইকে যে বলে যাবো, সে ভরসা পাচ্ছি না। কিন্তু না বলেও তো চলে যাওয়া যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রফুল্লকে বললাম। তিনি বললেন, তাঁরাও সরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, কিন্তু বাবাকে রাজি করাতে পারছেন না।

প্রফুল্লের সঙ্গে তাঁদের বিদ্যালয়, ঔষধালয় ও নিজস্ব এলাকা দেখতে দেখতে নূতনচন্দ্র সিংহের সঙ্গে পরিচয় হলো। আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে বললাম, অন্যত্র ব্যবস্থা করেছি থাকবার—চলে যাবো।

আরো কয়েকজনকে বললাম : সৈয়দ আলী আহসান, মুহাম্মদ খলিলুর রহমান, মোহাম্মদ শামসুল হক, রশীদুল হক, ওসমান জামাল এবং বাংলা বিভাগে আমার সহকর্মী ড. মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালকে। খবর পাঠালাম ভাইস-চান্সেলরকেও। প্রয়োজনে কীভাবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, তাও বলে দিলাম। তারপর আজিজ ও আমি যার যার পরিবার যার যার গাড়িতে তুলে কাটিরহাট রওনা হয়ে গেলাম। লজ্জাও লাগছিল সবাইকে এভাবে ফেলে রেখে চলে যেতে, তবে তার চেয়ে গভীর ছিল বিচ্ছিন্নতাবোধ।

সদর রাস্তায় একটা নির্দিষ্ট স্থানে আবুল খয়ের অপেক্ষা করছিল। গ্রামের অমসৃণ পথ দিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সেই প্রদর্শক। সে ঘর ঠিক করে রেখেছিল, পরম যত্নে আমাদের সেখানে নিয়ে গেল। আমরা গ্রামবাসীদের কৌতূহল উদ্রেক করেছিলাম। গ্রামের জীবনযাত্রায় আমাদের অনভ্যস্ততা এক ধরনের অসুবিধে সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি লজ্জাজনক হয়েছিল আঞ্চলিক ভাষা-ব্যবহারে আমাদের অসামর্থ্য। অনেক ক্ষেত্রেই কাউকে না কাউকে দোভাষীর কাজ করতে হতো।

AMARBOI.COM

স্বাধীন বাংলা বেতার স্তব্ধ। ট্রানজিসটর রেডিওতে আমরা শুনতাম আকাশবাণী আর বি বি সি। মাঝে মাঝে ঢাকা বেতারের সংবাদও শুনতাম, তাতে ক্ষোভ ও জ্বালা বাড়তো, প্রায়ই অবিশ্বাস্য বলে মনে হতো। সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ছিল বি বি সি। কেবল আমরা নই, গ্রামের সকলেই বি বি সি শুনতেন এবং বিশ্বাস করতেন। আমরা অক্লান্তভাবে খবর শুনতাম, কেননা খবর শোনা এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে গল্প ছাড়া আমাদের আর করার কিছু ছিল না। উড়োজাহাজ দেখলে বা অদূরে পাকা রাস্তায় কোনো গাড়ির শব্দ শুনলে নানারকম অনুমান বিনিময় করতাম। গুজব নানারকম শুনতাম, তার অল্পই বিশ্বাস উৎপাদন করত।

এর মধ্যে ড. শামসুল হক খবর পাঠালেন, তিনি, আবদুল আউয়াল ও ওসমান জামাল সপরিবার আসতে চান ওই গ্রামে, যদি ব্যবস্থা করা যায়। আবুল খয়েরের সঙ্গে আলাপ করে ওঁদের চলে আসতে বললাম। থাকার ব্যবস্থা হতে অসুবিধে হলো না—সে-সময়ে মানুষের সহৃদয়তার কিছু শেষ ছিল না।

ড. মল্লিকের ড্রাইভার ওসমান একদিন এসে হাজির হলো। মল্লিক সাহেবরা আছেন নাজিরহাটে, সৈয়দ আলী আহসান ও রশীদুল হকের পরিবারও আছেন একসঙ্গে। তাঁরা রামগড়ের দিকে চলে যাবার কথা ভাবছেন। আমি যদি চাই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি। মল্লিক সাহেবের আদেশানুযায়ী ভাইস-চান্সেলরের গাড়িটি তাঁর ভবনের গ্যারাজে রেখে চাকার বাতাস ছেড়ে দিয়ে ওসমান এসেছে বার্তাটি নিয়ে। ভাইস-চান্সেলরের সঙ্গে তার আর দেখা হবার কথা নেই। সুতরাং তাকে আর কোনো সিদ্ধান্ত জানালাম না। কিন্তু আমরা চার পরিবার স্থির করলাম, যতোদিন পারি, ওই গ্রামেই থেকে যাবো।

নাজিরহাট থেকে মোহাম্মদ আলী চলে গিয়েছিলেন নিজের এলাকা নানুপুরে, গ্রন্থাগারিক শামসুল আলম চলে যান শ্বশুরবাড়ি ফটিকছড়িতে। পরিসংখ্যান বিভাগের ড. এম জি মোস্তফা নাজিরহাট থেকে এদিক-ওদিক হয়ে ক্যাম্পাসে ফিরে যান এবং সেখান থেকে পরে কলকাতায় পৌঁছোন।

দিন কয়েক পরে আবদুল আলীর অগ্রজ আবদুল আউয়াল—আমাদের সুবা ভাই—এক জিপসমেত আবির্ভূত হলেন কাটিরহাটে। আমরা তো দেখে অবাক। জানা গেল, মল্লিক-আলী আহ্‌সান-রশীদুল হকের পরিবার রামগড়ে পৌঁছেছেন—সুবা ভাই সেখানেই চা-বাগানের ম্যানেজার। মল্লিক সাহেবের কাছে আমার সন্ধান জেনে কাটিরহাটে এসেছেন। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন আলীর খবর। যতটা জানতাম, বললাম। বললেন, 'শহরে গিয়ে ওদের উদ্ধার করা যায় কিনা, সেই চেষ্টা করতে হবে।' স্থির হলো, আমরা প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়-ক্যাম্পাসে আসবো, তারপর শহরে ফোন করে আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তার ঠিকানা নেবো, তারপর শহরে যাবার চেষ্টা করবো।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ঠিকই আসা গেল, আজিজও পেছন পেছন এলো নিজের গাড়িতে। প্রশাসন-ভবনে গেলাম ফোন করব মনে করে। কিন্তু ততোদিনে চট্টগ্রাম শহরের সঙ্গে টেলিফোন-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে পাকিস্তানিরা। বিশ্ববিদ্যালয়-এলাকা লক্ষ্য করে গোলাগুলিও ছুঁড়ছে মাঝে মাছে। ই পি আরের সেই আহত সৈনিকেরা খানিক সুস্থ হলে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেছেন। ডা. বশর চলে গেছেন বা যাচ্ছেন ; ড. আখতারুজ্জামানও যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি বললেন, শহরে যাওয়া সম্ভবপর হবে না, হলেও তা হবে অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল, সুতরাং ওই পরিকল্পনা পরিত্যাজ্য।

আলী কোথায় আছে, তাই নিশ্চিত জানি না, অতএব শহরে যাবার ইচ্ছে ত্যাগ করতে হলো। এবারে চেষ্টা করলাম, বাসায় গিয়ে কিছু জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে। বাসার দিকে অগ্রসর হতেই গুলিবর্ষণের আওয়াজ পাওয়া গেল। তখন মনে হলো, জলদি ক্যাম্পাস ত্যাগ করাই শ্রেয়। অতএব ফিরতি পথে চললাম। যেই ক্যাম্পাসের ছোট রাস্তা থেকে হাটহাজারীর বড় সড়কে এসে পৌঁছেছি, অমনি গাড়ির সামনে এক ঝাঁক গুলি এসে পড়ল—কোত্থেকে, কে জানে! হাটহাজারী বাজার পর্যন্ত খুব দ্রুত আসতে হলো। তারপর স্বাভাবিক গতিতে কাটিরহাট ফিরে আসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবা ভাই বললেন, 'আমার সঙ্গে রামগড়ে চলো—এখানে থাকার কোনো মানে হয় না।' আজিজ তাঁর প্রস্তাবে সায় দিল। কিন্তু আমার ভরসায় আর তিন পরিবার এসেছেন, তাঁদের ফেলে যাই কী করে? সুবা ভাই বললেন, 'ওঁরাও আসুন—জায়গার অভাব হবে না।' ওঁরা কিন্তু সম্মত হলেন না। বললেন, 'আপনারা যান। তেমন বুঝলে আমরা রামগড়ে চলে আসবো।'

সুবা ভাই রাতটা আমাদের সঙ্গে কাটালেন। জানালেন, মেজর জিয়া, ক্যাপ্টেন রফিক, এইচ টি ইমাম প্রমুখ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা রামগড়েই আছেন। ওটাই আপাতত চট্টগ্রাম অঞ্চলের সামরিক ও প্রশাসনিক ঘাঁটি।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রামগড়ের উদ্দেশে রওনা হলাম ১০ এপ্রিল সকালে। পথে একটা খাল পড়ে। খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো গেল যে, এখনই তা পার হয়ে যেতে হবে। গাড়ি নিতে হবে একটানে, কোনো অবস্থায়ই থামা যাবে না। প্রথমে গেল জিপটা, অনায়াসে ওপারে পৌঁছে আমাকে সংকেত দিল যেতে। মরিয়া হয়ে আমার ফোকসওয়াগেন চালালাম—গাড়ির মধ্যে ফুটবোর্ড ছাপিয়ে পানি উঠল বটে, কিন্তু আটকে পড়লাম না। শেষে আজিজ পার করল তার টয়োটা করোনা।

নারায়ণহাট-হেয়াকু হয়ে রামগড়ের রাস্তায় উঠলাম। এই হেয়াকুতেই এসেছিলাম নির্বাচনের দিনে। এখন আর সেদিনের কর্তৃত্বের কিছু অবশিষ্ট নেই। বহু মানুষ অনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে চলেছে—বেশির ভাগই পায়ে হেঁটে। আমরা গাড়িতে যাচ্ছি এবং আমাদের একটা নির্দিষ্ট আশ্রয় আছে, এটাই পার্থক্য।

ম্যানেজারের বাংলোয় ঢুকতে ঝর্ণা ভাবি দৌড়ে এলেন—খোকনদের না দেখে তাঁর মুখ মলিন হয়ে গেল। অবশ্য তিনি জানতেন যে, সুবা ভাই খোকনদের পান বা না পান আমাদের নিয়ে ফিরবেন। তাঁর বাসায় মেজর শামসুদ্দীন আহমেদ (পরে ব্রিগেডিয়ার, অবসরপ্রাপ্ত এবং মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের পরিস্থিতি-বিষয়ক নিয়মিত লেখক) তখন পরিবার নিয়ে থাকছিলেন।

আমরা সেখানে পৌঁছোবার পর পরই মেজর জিয়া এলেন টেলিফোন করতে বা অন্য কোনো কাজে। পরিচয়-পর্বের পরে আমি তাঁকে বললাম, 'বেতারে আপনার ভাষণ শুনেছি।' তিনি জানতে চাইলেন কোনটা? আমি বললাম, 'যেটায় শেখ মুজিবের নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।' জিয়া নিস্পৃহভাবে বললেন, 'পুওর শেখ! হি মাস্ট বি রটিং ইন দি আটক প্রিজন নাউ।' আমি চমকে উঠে জানতে চাইলাম, 'ডু ইউ নো ফর শিওর?' উনি বললেন, 'দিজ ইজ মাই গেস।'

মল্লিক সাহেবদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কাঠের একটা বাংলোতে ওঁরা ছিলেন। আলী আহসান সাহেব ও রশীদুল হক সাহেবরাও ছিলেন কাছেই। মল্লিক সাহেব বললেন, কাঠের ফ্লোরে চাদর বিছিয়ে শোন রাতে; ফাঁক দিয়ে বাতাস আসে; সারা শরীরে ব্যথা হয়ে গেছে, মাথায় দেওয়ারও তেমন কিছু নেই। সুবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইকে একথা জানালে উনি সোফার অনেকগুলো কুশন পাঠিয়ে দিলেন। পরের দিন ড. মল্লিক বললেন, 'রাতে বড় ভালো ঘুম হয়েছে।'

এইচ টি ইমাম পরিচয় করিয়ে দিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের এস পি বজলুর রহমানের সঙ্গে। তিনিও পরিবার নিয়ে এসেছেন। তাঁর এক মেয়ে ডাক্তারি পড়তো। দেখলাম, সে এক অবাঙালি মহিলাকে প্রসব করাতে ব্যস্ত। তারপর আমার চোখে পড়ল, থানা-হাজতে নানা বয়সের বেশ কিছু অবাঙালি পুরুষ বন্দী হয়ে আছে। তাদের ভয়ার্ত দৃষ্টি মনের মধ্যে ভীষণ আঘাত করলো।

ক্যাপ্টেন রফিকের সঙ্গে চকিতের জন্যে দুএকবার দেখা হলো। ভালো করে আলাপ হলো ক্যাপ্টেন আফতাব কাদেরের সঙ্গে। আফতাব কাদেরের পোস্টিং ছিল পাকিস্তানে। ছুটিতে বাড়ি এসেছিল নোয়াখালিতে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে সেখান থেকে হেঁটে এসেছে রামগড়ে। যেহেতু সে আর্টিলারির লোক এবং আমাদের কোনো কামান ছিল না, তাকে দেওয়া হয়েছিল অফিসের কাজ। সে আর কতক্ষণ! ফলে তার হাতে ছিল বিস্তর সময় এবং আমরা গল্প করে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিতাম।

এরই মধ্যে এসে পৌছোলেন সাদেক খান, ঢাকা থেকে। সীমান্ত তখন খুলে দেওয়া হয়েছিল। রামগড়ের উল্টোদিকে ভারতীয় সীমান্ত ফাঁড়ি সাবরুম। মাঝে একটা খালের ব্যবধান মাত্র। সারাদিনই কিছু কিছু লোক নৌকোয় খাল পেরিয়ে চলে যাচ্ছে ভারতে। সাদেক খানের যাওয়া নিয়ে একটু হাঙ্গামা হয়েছিল। বোধহয় স্থানীয় কোনো আওয়ামী লীগ নেতা তাঁর সম্পর্কে বিরূপ কিছু বলেছিলেন সাবরুমের কোনো কর্মকর্তাকে। পরে বিষয়টির মীমাংসা হয় এবং তিনি আগরতলা চলে যান।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের সেনা-কর্মকর্তাদের একটা ব্যবস্থা হয়েছিল। সে-অনুযায়ী কিছু তরুণকে ভারতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল এবং ভারতীয় বাহিনী আমাদের কিছু গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক সরবরাহ করছিলেন। তবে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ ছিল অপ্রতুল। তা নিয়ে আমাদের সেনা-কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। শোভাপুর বা শুভপুর ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে একবার সীমান্ত-অঞ্চলে এক ভারতীয় সেনা-কর্মকর্তার কাছ থেকে বিস্ফোরক গ্রহণ করার জন্যে মেজর শামসকে সংবাদ দেওয়া হয়। শরীর খারাপ থাকায় বা অন্য কোনো কারণে তিনি তা আনতে যাননি।

ওদিকে আমাদের ঘাঁটিগুলোর পতন হচ্ছিল এক এক করে। একবার আমার উপস্থিতিতেই মেজর জিয়ার কাছে এমনি একটি দুঃসংবাদ এলো টেলিফোনে। তিনি বেশ রাগ করে বললেন, 'তাতে অত ভয় পাবার কী আছে!' কিন্তু তাঁর চেহারায় উদ্বেগের স্পষ্ট ছাপ দেখলাম।

এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের বুঝতে দিলেন যে, সরকারে-

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারে একটা রাজনৈতিক বোঝাপড়া না হলে আরো বেশি সামরিক উপকরণ দেওয়া সম্ভবপর হবে না। অথচ তখনো আমাদের সরকার-গঠনের কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। সামরিক ক্ষেত্রে আমরা পশ্চাদপসারণ করছি। বেসামরিক ব্যক্তিরাও খাল পেরিয়ে সাবরুমে বাসা ভাড়া করে থাকতে আরম্ভ করেছেন। এ অবস্থায় কর্তব্য কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



রামগড়ে পৌঁছোবার পর পরই দেখা হয়েছিল আমার হলের আবাসিক ছাত্র ইফতিখারের সঙ্গে। যতোদূর মনে পড়ে, সমাজতত্ত্বের ছাত্র ছিল। ওকে মনে রাখার একটি বিশেষ কারণ ঘটেছিল, সেটা আগে বলে নিই। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ড্রাইভারের সঙ্গে কয়েকজন ছাত্র দুর্ব্যবহার করেছিল। অভিযুক্তদের মধ্যে ইফতিখারও ছিল, সে অবশ্য নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছিল। তাকে ভালো করে জেরা করার পর আমি নিঃসংশয় হয়েছিলাম যে, ঘটনার সঙ্গে সে জড়িত ছিল না। সুতরাং স্বাস্থ্য, শৃঙ্খলা ও আবাস-সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিতে যখন বিষয়টি এলো, তখন আমি তার পক্ষ নিয়েছিলাম। কিন্তু ভাইস-চান্সেলর আস্থা স্থাপন করেছিলেন প্রক্টরের রিপোর্টের ওপরে এবং আমি একজন অভিযুক্ত ছাত্রের পক্ষ নেওয়ায় তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। তবে আমি বলি যে, প্রোভোস্ট হিসেবে আমি ছাত্রটির অভিভাবকও এবং যেহেতু আমার মনে হয়েছে যে সে নিরপরাধ, তাই কমিটিতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করা আমার কর্তব্য। যাহোক, বিষয়টি—আমার বিরোধিতার কারণেই—মুলতবি হয়ে যায়। কথাটা হয়তো ইফতিখার জেনেও থাকবে—তবে আমার কাছ থেকে জানেনি। এর পরপরই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গেলে ওই কমিটির আর অধিবেশন বসেনি।

সেই ইফতিখারকে দেখলাম সাবরুমের দিক থেকে রামগড়ে এসে নামলো নৌকো থেকে। আমাকে দেখে সে অভিভূত। বললো, যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে ফিরছে, তারাই প্রথম ব্যাচের। তারপর সে আমার পিছনে লেগে রইলো, সে রাঙামাটিতে যুদ্ধ করতে যেতে চায়। তার বাবা সেখানে স্কুলের হেডমাস্টার। রাঙামাটি গিয়ে বাড়ির সকলকে দেখবে এবং যুদ্ধ করে তাদের মুক্ত করে আনবে—এমন ইচ্ছেয় সে টগবগ করছে। তার ধারণা, সামরিক কর্তৃপক্ষকে আমি বললেই তার রাঙামাটি যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তাকে যতোই বোঝাতে চাই যে, এসব রণকৌশল-সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলতে যাওয়া আমার পক্ষে অসঙ্গত, সে ততোই মিনতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে থাকে। তারপর একদিন হঠাৎ আর খোঁজ নেই তার। পরে জানতে পারি, সবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে সে শত্রুকবলিত রাঙামাটির দিকেই চলে যায় এবং পাকিস্তানি সেনাদের অ্যামবুশে শহীদ হয়।

রামগড়ে দেখা হলো প্রফুল্লরঞ্জন সিংহের সঙ্গেও। রাউজান ছেড়ে পরিবারের সকলকে ভারতে নিরাপদে রেখে তিনি ফিরে এসেছেন। কেবল বাবাকে আনতে পারেননি, তিনি আরাধ্যা দেবী কুণ্ডেশ্বরীকে ছেড়ে কোথাও যাবেন না। নূতনবাবুর প্রত্যয়, সত্য ও ধর্মের পথে যে থাকে, তার বিনাশ হয় না। তাঁর জন্যে প্রফুল্ল খুব উদ্‌বেগ। বিপদ মাথায় নিয়ে বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করছেন—জোর করে যদি বাবাকে ধরে আনা যায়।

কদিন পরে রামগড় থানার বারান্দায় আবার প্রফুল্লের সঙ্গে দেখা। জানতে চাইলাম : 'বাবার খবর পেয়েছেন?'

'পেয়েছি।' বিষাদগ্রস্ত মুখে তিনি হাসি ফুটিয়ে তুললেন। 'বাবা নেই', তিনি হাসতে হাসতে বললেন। আমি কিছু বলার আগেই তিনি বললেন আবার : 'বাবা আর নেই।' হাসিমুখ বিকৃত হলো, কান্নায় ছেয়ে গেলো মুখটা। 'বাবাকে মেরে ফেলেছে।' প্রফুল্ল এবারে ভেঙে পড়লেন কান্নায়।

রাউজানে পৌঁছেই পাকিস্তানি বাহিনী কুণ্ডেশ্বরীতে ঢুকেছিল। নূতনবাবু পালান নি। সৈন্যেরাও নাকি তাঁকেও ফেলে যাচ্ছিল, কিন্তু মুসলিম লীগের এক নেতার পুত্রের ইঙ্গিতে পাকিস্তানি সৈন্যেরা ফিরে আসে এবং তাঁকে গুলি করে হত্যা করে ১৩ এপ্রিলে।

ড. শামসুল হক খবর পাঠালেন, তিনি এবং ওসমান জামাল পরিবার-পরিজন নিয়ে রামগড়ে চলে আসতে চান। নির্দিষ্ট দিনে আমি গাড়ি নিয়ে হেয়াকু ও রামগড় সড়কের সংযোগস্থল থেকে তাঁদের নিয়ে এলাম। জানা গেলো, আমি চলে আসার পরে, অবস্থা যতোই পাকিস্তানিদের অনুকূলে যেতে লাগলো, তাঁদের উপস্থিতির কারণে গ্রামবাসীর মনে ততোই ভয় বাড়তে থাকলো। শামসুল হক ও ওসমান জামাল স্থির করলেন, রামগড়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন; ড. আউয়াল ঠিক করলেন, ক্যাম্পাসের দিকে ফিরে যাবেন। হক সাহেব ও জামালদের নিয়ে চাবাগানেই তুললাম। সুবা ভাই তো আগেই তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলেন।

এদিকে একটা কানাঘুষো শুনতে পেলাম। ভারতের কাছ থেকে আরো অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার আশায় মেজর জিয়া নাকি উদ্‌যোগ নিয়েছেন ড. মল্লিককে প্রধান করে একটি সরকার গঠনের। এ বিষয়ে মল্লিক সাহেব কখনো কিছু বলেননি আমাকে, আমিও তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি। বহুকাল পরে, কলকাতায়, তাজউদ্দীন আহমদ নিজের থেকেই একদিন আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন এ-সম্পর্কে। তাই কথাটি যে রটেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। শোনা গেলো, আমাদের কেউ গেছেন আগরতলায় এ-বিষয়ে আলাপ করতে। আবার শোনা গেলো, তিনি ফিরে এসেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই খবর নিয়ে যে, আওয়ামী লীগের নেতারা দু-একদিনের মধ্যেই সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন।

ট্রানজিসটর রেডিওতে কান পেতে থাকি। তারপর একদিন আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয় মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-গঠনের সংবাদ। সেই সঙ্গে স্বাধীন বাংলা বেতার-কেন্দ্র থেকে ধারণকৃত শপথগ্রহণ-অনুষ্ঠানের বিবরণী এবং তাজউদ্দীনের বেতার বক্তৃতার অস্পষ্ট রেকর্ড। আমাদের সকলের চোখে পানি চলে এলো, মনে এলো বল।

স্রোতের মতো লোক আসছে, রামগড় পেরিয়ে চলে যাচ্ছে সাবরুমে, সেখানেও থাকছে না, আশ্রয়ের খোঁজে চলেছে আগরতলার দিকে। চট্টগ্রাম থেকে এসে এভাবে চলে যাচ্ছেন বহু পরিচিত জন, আমাদের সহকর্মীদেরও অনেকে। ঢাকা থেকে এবং দেশের অন্য অঞ্চল থেকে এসেও এভাবে যাঁরা পার হয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরিচিত, বেশির ভাগই অচেনা।

মল্লিক সাহেবের ডাক এসেছে আগরতলা থেকে। তিনি আমাদের সবাইকে যেতে বললেন। যেতেই যখন হবে, তখন দুদিন আগেই কী আর পরেই কী! কিন্তু সবাই এক রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না।

১৫ এপ্রিল সকালে সপরিবার ড. মল্লিক, তাঁর বড় জমাই ড. জিয়াউদ্‌দীন আহমেদ, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, ড. রশীদুল হক ও ড. মাহমুদ শাহ্ কোরেশীকে বিদায় জানালাম। আমি স্বভাবত ভাবপ্রবণ নই। কিন্তু যে-মুহূর্তে তাঁরা দেশের মাটি থেকে পা তুলতে গেলেন, সেই মুহূর্তে কেঁদে ফেললাম। মল্লিক সাহেব আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'ডোন্ট ইউ ওরি। এই পথেই আমরা একসঙ্গে ফিরে আসবো-বিফোর দি ইয়ার ইজ আউট।' কেন এবং কিসের জোরে কথাটা তিনি বলেছিলেন, জানি না। তবে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টায় তিনি এই বিশ্বাস লালন করেছিলেন এবং অন্যদেরও বলেছিলেন, 'ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা স্বাধীন দেশে ফিরে যাবো।'

চা-বাগানের অভ্যন্তরীণ অবস্থায়ও একটু একটু পরিবর্তন ঘটছিল। শ্রমিকদের সাপ্তাহিক বেতন দেওয়ার টাকা ছিল না। বেতনের বদলে তাদের দেওয়া হচ্ছিল চা। কিন্তু ক্রমশ বাজারে চাহিদার তুলনায় তাদের চায়ের সরবরাহ বেড়ে যাচ্ছিল, সেই সঙ্গে বাড়ছিল তাদের অসন্তোষ। তাদের মনে হয়তো এই সন্দেহও ঘনীভূত হচ্ছিল যে, কোনোদিন তাদের সবাইকেই বিপদের মুখে রেখে ম্যানেজার সাহেব ও বাকি ভদ্রলোকেরা পালিয়ে যাবেন। কেউ কেউ বোধহয় উস্‌কানিও দিচ্ছিল তাদের, তারা ম্যানেজারকে আর আগের চোখে দেখছিল না।

এই অবস্থায় সুবা ভাইয়ের মনে হলো, সাবরুমে গিয়ে থাকতে পারলে মন্দ হয় না। তিনি আর আমি একদিন সাবরুমে গিয়ে খোঁজ করে এলাম সেখানে বাসা ভাড়া পাওয়া যায় কিনা। দেখা গেলো, বাসা খালি নেই—সবই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেওয়া হয়ে গেছে।

সাবরুমের সন্নিহিত রানীরহাটে একটি প্রাইমারি স্কুল ছিল। মূল স্কুলের পাশেই দু কামরার একটি মাটির ঘর—ছাত্রদের খেলার কক্ষ। সুবা ভাইকে স্কুল-কর্তৃপক্ষ সেটা ছেড়ে দিতে চাইলেন। তাই হলো। বড়ো ঘরটায় সুবা ভাই, ঝর্ণা ভাবি ও তাঁদের তিন ছেলেমেয়ে, মেজর শামসুদ্দীনের স্ত্রী নাজমা ও তাঁর দুই সন্তান, শামসুল হক, বুলবুল ভাবি ও তাঁদের দুই ছেলে; অন্য ঘরটায় ওসমান জামাল, মঞ্জু ও জামালের মা, দুই মেয়ে নিয়ে আমি ও বেবী, আজিজ, রুবা ও তাদের মেয়ে। রাতে এক এক মশারির নিচে এক এক পরিবার। দিনে পুরুষেরা সবাই কাটাই রামগড়ে। সন্ধ্যার পরে খাল পেরিয়ে ফিরি রানীরহাটে। তবে এভাবে যে কাটানো যাবে না বেশিদিন, তা খুব স্পষ্ট। আগরতলার দিকেই যেতে হবে।

রামগড় বাজারে এক চায়ের দোকানে বসে কথাটি বললাম ক্যাপ্টেন আফতাবকে। সে বললো, 'আপনারা চলে গেলে কোন মনোবল নিয়ে আমরা যুদ্ধ করবো?'

আগের দিন সে গিয়েছিল মহালছড়ির দিকে রেকি করতে। খারাপ রাস্তা আর প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। কয়েকজন সৈন্য নিয়ে সেদিন আবার যাবে।

আফতাব বললো, 'আমার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। অবস্থা খারাপ বুঝলে আমিই বলবো আপনাদের চলে যেতে।'

অপেক্ষা করলাম। সেদিন আফতাব ফিরলো না, পরদিনও না। সাবরুম থানা থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে সুবা ভাই ও আমি চলে গেলাম আগরতলায়। আগরতলায় ততোদিনে আমাদের সরকারের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশাসন স্থাপিত হয়েছে। এম আর সিদ্দিকী ও জহুর আহমদ চৌধুরী জনপ্রতিনিধি হিসেবে সেই প্রশাসনের দায়িত্বভার নিয়েছেন। কর্নেল চৌমুহনীতে খোলা হয়েছে আঞ্চলিক দপ্তর। সেখানে যোগাযোগ করে সবার জন্যে থাকার ব্যবস্থা করা গেলো। ফেরার আগে মল্লিক সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এলাম। একটা ছোটখাটো বাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছে তাঁদের জন্যে।

আমরা রামগড়ে ফিরে এলাম। আফতাব কাদের ফেরেনি। ২৬ এপ্রিল সকালে আমরা আগরতলা রওনা হলাম। প্রথমে তিন পরিবার—সুবা ভাইয়ের, আমার, আজিজের। পরের দিন বাকি তিন পরিবার—শামসুল হক , ওসমান জামাল ও মেজর শামসের। শামস যুদ্ধ করছেন, তিনি নন, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা।

আমরা আগরতলায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সাত্তার নামে যে-ছেলেটি আমাদের বাসায় কাজ করতো, সে ঠিক করলো কুমিল্লায় স্বগ্রামে ফিরে যাবে। আমাদের রওনা হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত সঙ্গে থেকে সাশ্রুনয়নে রুদ্ধকণ্ঠে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিল সাত্তার। পরে জেনেছিলাম, রামগড় থেকে বাড়ি ফেরার পথে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাক–সেনাদের সামনে পড়ে যায়। তারা তাকে প্রচুর প্রহার করেছিল বটে, কিন্তু প্রাণে মারেনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সাত্তার আবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে আসে। এখনো সে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মে নিয়োজিত রয়েছে।

আমরা চলে যাচ্ছি—আফতাব ফিরলো না। আমরা চলে যাওয়ার পরে তার দেহ ফিরে এসেছিল। মেশিনগানের গুলিতে তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সেনা–কর্মকর্তাদের মধ্যে সম্মুখ যুদ্ধে প্রথম শহীদ বোধ হয় ক্যাপ্টেন আফতাব কাদের। নিজের জীবন দিয়েও সে কিন্তু লক্ষ্য অর্জন করেছিল। পাকিস্তানি কমান্ডো ও তাদের সহযোগী মিজোরা আমাদের যে সৈন্যদলকে ঘিরে রেখেছিল, তাদের পশ্চাদপসারণ সম্ভবপর হয়েছিল তার আত্মত্যাগে।

পশ্চাদপসারণকারীরাও তাকে ফেলে আসেনি। তারাও নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আফতাবের লাশ উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল রামগড়ে। সেখানে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

৩০ এপ্রিল থেকে আমাদের সৈনিকরা রামগড় থেকে পশ্চাদপসারণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। শুনেছি, সে–সময়ে স্থানীয় অধিবাসীরা আমাদের সেনা–কর্মকার্তাদের কাছে দাবি জানায়, বন্দি অবাঙালিদের হয় সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, নয় হত্যা করে ফেলতে হবে। কাপ্তাইতে প্রবেশ করার পর অবাঙালি পরিবারের কাছ থেকে নানারকম অভিযোগ শুনে পাকিস্তানি সৈন্যেরা স্থানীয় বাঙালিদের ওপরে ভয়ংকর অত্যাচার করেছিল। তাই রামগড়ের লোকজনের মনে ভয় ছিল যে, এরা বেঁচে থাকলে তারাই হবে প্রতিশোধের খোরাক। সুতরাং বন্দিদের মেরে ফেলা হয়েছিল। খরচ করার মতো বুলেট ছিল না বলে বেয়োনেট ব্যবহার করতে হয়। থানায় আমি যেসব বন্দি দেখেছিলাম, বজলুর রহমান সাহেবের মেয়ে যে-মহিলার প্রসব করিয়েছিল এবং যে–শিশুটি সেদিন জন্ম নিয়েছিল—কেউ বাদ যায়নি।

২ মে পাকিস্তান সেনাবাহিনী রামগড় দখল করে। নারকীয় উল্লাসের সঙ্গে তারা বাড়ি-ঘর অফিস–কাছারিতে আগুন লাগায়, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের হত্যা করে।

অবশ্য এসবই আমার শোনা কথা। আমি তখন আগরতলায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭.

১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল, সোমবার, আগরতলায় এসে পৌঁছোলাম। এভাবে স্বদেশ ত্যাগ করতে যে কতো তীব্র যন্ত্রণাবোধ হয়, উদ্বাস্তু জীবনবরণে বাধ্যতার যে কী গ্লানি চিত্তকে আচ্ছন্ন করে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা যে কেমন পীড়ন করে, তা বুঝি কেবল নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই অনুভব করতে হয়। নাৎসি জার্মানি থেকে পলাতক শরণার্থীর কথা পড়েছিলাম এরিখ মারিয়া রেমার্কের উপন্যাসে। রাতের অন্ধকারে ঘন কুয়াশায় হারিয়ে যাওয়া সেইসব চরিত্রের মিছিলে আমিও যোগ দিলাম।

আমার চারপাশেও মিছিল, সত্যিকার মিছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার জিপে কতো লোক যে একসঙ্গে উঠতে পারে, তা না দেখলে প্রত্যয় হয় না। এসব জিপ আগরতলা–সাবরুম যাতায়াত করছে। বাসও বোধহয় চলছিল, তবে বেশি নয়। হেঁটেই যাচ্ছিল অধিকাংশ মানুষ—নারী-পুরুষ–বালবৃদ্ধ–নির্বিশেষে। কারো হাতে একটা ব্যাগ, কারো হাতে পোঁটলা—আজীবনের সঞ্চয় ওরই মধ্যে।

সেই ভিড়ে একটি মেয়েকে দেখেছিলাম—ছবিটা এখনো চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসে। শস্তা নীলশাড়ি-পরা তরুণী, চলেছে ধীর পদক্ষেপে। তার সঙ্গীরা দ্রুত তাকে পেছনে ফেলে যাচ্ছে, পেছনের দল এসে তার পাশে হাঁটছে কয়েক মুহূর্ত, তারপর তারাও ছাড়িয়ে যাচ্ছে তাকে। আঁচলের তলায় সে দুহাতে ধরে রেখেছে সদ্যোজাত শিশুকে—পথেই সে শিশু জন্মেছে কিনা কে জানে! মেয়েটির ঘাড় ডান দিকে একটু হেলানো। চোখে অশ্রু নেই, শব্দ নেই মুখে। ধীরে ধীরে চলেছে সে নিরাপত্তার সন্ধানে—দুনিয়ায় তার আর যে অভাব থাক, সময়ের অভাব নেই।

এদের পার হয়ে গাড়ি চড়ে যেতে লজ্জা লাগছে, তবু মনে মনে নিজেকেই ধন্যবাদ দিই, অনেক সহকর্মীর মতো গাড়িটা চট্টগ্রামে রেখে আসিনি বলে। ভেবেছিলাম, গাড়ি যদি ফেলে যেতে হয় তাহলেও যতোদূর তা চড়ে যাওয়া যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ততোদূর নিয়ে যাবো, তারপর না হয় ফেলে যাবো।

সুবা ভাইয়ের জিপ, আমার ফোকসওয়াগেন এবং আজিজের টয়োটা করোনা পরপর যাচ্ছে, কিন্তু বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে আমারটাই। পথের দুধারে অল্পবয়সী ছেলেরা 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে সংবর্ধনা জানায়, কোথাও কোথাও গাড়ি থামিয়ে বলে, 'এর ইনজিন নাকি পেছন দিকে, খুলে দেখান না!' তাদের কৌতূহল মেটাতে থামতে হয়।

তবু নিরাপদে পৌঁছে যাই আগরতলায়, প্রত্যাশিত সময়েই। শহরের একটু বাইরে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের একটা পরিত্যক্ত হস্টেলে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। একেক ঘরে একেক পরিবার। সৈয়দ আলী আহসান, তাঁর দুই মেয়ে-জামাই (বড় জামাই ইনজিনিয়ার মাসুদ, ড. কোরেশী তাঁর ছোট জামাই), রশীদুল হক, প্রত্যেকেই বরাদ্দ পেয়েছেন একেকটা ঘর। আমরা তিন পরিবার তিনটি ঘর পেলাম। পরদিন বাকি তিন পরিবার এসে যাবেন। পরে এখানেই উঠেছিলেন মেজর কে এম শফিউল্লাহ ও মেজর মীর শওকত আলীর পরিবার—তার মধ্যে মীর শওকতের বাবাও ছিলেন। দেখা গেলো, শফিউল্লাহর স্ত্রী বেবীর সহপাঠিনী ছিলেন স্কুলে। শফিউল্লাহ খুব অল্প সময় ছিলেন সেখানে, কিন্তু শওকত বেশ সময় দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর সঙ্গে আলাপটা হয়েছিল একটু বেশি। আগরতলার কথা পরবর্তীকালে তিনি অনেকবার স্মরণ করেছিলেন আমার উপস্থিতিতে—চট্টগ্রামে, ঢাকায়, লন্ডনে।

সবাইকে যথাস্থানে রেখে আমি গেলাম ড. মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলেন মেজর খালেদ মোশাররফ এবং মল্লিক সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দি ব্লাডি বাস্টার্ডস ওয়ান্ট আস টু ব্লিড হোয়াইট।'

পরিচয়-পর্বের পরে তাঁর উষ্মার কারণ বোঝা গেলো। আগরতলা শহরকে কেন্দ্রে রেখে পাঁচ-ছ মাইল ব্যাস জুড়ে একটা বৃত্ত রচনা করেছেন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এবং ওই এলাকার মধ্যে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন আমাদের সেনা-কর্মকর্তাদের। আমাদের সৈন্যেরা যদিও পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছিল, তবু সীমান্ত-সংলগ্ন এলাকায় যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ মান্য করা তাদের জন্যে সহজ ছিল না। ভারতীয় পক্ষের প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, আগরতলার সঙ্গে ভারতের বাকি অংশের যোগাযোগের প্রধান উপায় ছিল আকাশপথে এবং সেজন্যে আগরতলা বিমানবন্দর ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালি সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করে পাকিস্তানিরা সীমান্তের দিকে ছুটে আসছিল এবং সীমান্ত থেকে কামান দাগলে আগরতলা বিমানবন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই নিষেধাজ্ঞা। তবে রামগড় দখলের সময়ে পাকিস্তানিরা যেমন সাবরুমের ওপরে গোলাগুলি ছুঁড়তে দ্বিধা করেনি, তেমনি আগরতলা এবং তার সন্নিহিত এলাকায়ও তাদের গোলাগুলি মাঝে মাঝে এসে পড়তো। তাতে অবশ্য জনজীবনে বড়োরকম কোনো ব্যাঘাত ঘটে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চা খেতে খেতে মেজর খালেদ মোশাররফের কাছে তাঁর পরিবারের খোঁজখবর জানতে চাইলাম। ২৫ মার্চ বা তার দু-একদিন আগে থেকেই তিনি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পরে তো আরো সংযোগহীন। তবে তখনো তাঁর ভরসা, তাঁর উপরস্থ কর্মকর্তা—যাঁর বিরুদ্ধে তখন তিনি লড়ছেন—যতোক্ষণ দায়িত্বে আছেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত তাঁর পরিবারের কোনো ক্ষতি হবে না। খালেদ মোশাররফের কথা শুনে আমি ভাবতে থাকলাম, এ কি সেনাবাহিনীর শিষ্টাচার, বীরের প্রতি বীরের সৌজন্য? কিন্তু যে-পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এমন অমানবিক ও বর্বরোচিত আচরণ করেছে বাঙালি সৈনিক ও সাধারণজনের সঙ্গে, তারা কি অমন নৈতিকতায় আস্থা রাখে না তার পরিচয় দেবে?

মেজর খালেদ চলে যাওয়ার পরও আমি মল্লিক সাহেবের বাসস্থানে গল্প করতে থাকলাম। একটু পরেই দরজায় করাঘাত এবং ত্রিপুরা পুলিশের একজন ডি এস পির প্রবেশ। তিনি বেশ গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইলেন, বাড়ির সামনে দাঁড়ানো গাড়িটা কার? 'আমার' বলে নিজের পরিচয় দিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ গাড়ি আপনি চালাচ্ছেন কী করে?' আমি তাঁকে বললাম যে, সাবরুম থানা থেকে অনুমতি নিয়েই আমি গাড়ি এনেছি এবং অল্পকাল আগে আগরতলায় এসে পৌঁছেছি মাত্র। তিনি কাগজটায় চোখ বুলিয়ে বললেন, সেটা আগরতলায় গাড়ি আনবার অনুমতিপত্র, সেখানে গাড়ি চালাবার লাইসেন্স নয়। তারপর যা বললেন, তা আমার মর্মে আঘাত করলো: 'এটা তো এখনো বাংলাদেশ হয়ে যায়নি।' তিনি নির্দেশ দিলেন, স্থানীয় রেজিস্ট্রেশন না হওয়া পর্যন্ত গাড়ি জমা রাখতে হবে থানায়। বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর জিপের পেছনে গাড়ি চালিয়ে থানায় রেখে এলাম। তিনি অবশ্য গাড়ির চাবি আমার কাছেই রেখে দিতে বললেন এবং তাঁর জিপে করে পৌঁছে দিলেন মল্লিক সাহেবের আস্তানায়। পরবাসভূমে আশ্রয়প্রার্থীর জীবন এমনি করে শুরু হলো।

কর্নেল চৌমুহনীর অফিসে যেতে সাদর সংবর্ধনা জানালেন তাহেরউদ্দিন ঠাকুর। সবাইকে শুনিয়ে জোরে জোরে তিনি বললেন, 'রেহমান সোবহান এসে গেছেন, আনিসুর রহমান এসেছেন, সারওয়ার মুরশিদ সাহেব পৌঁছে গেছেন, এখন আপনি আসায় সবটা পূর্ণ হলো।' একথা তিনি কেন বলেছিলেন, জানি না। মুরশিদ সাহেবের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বাইরে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি, তবে রেহমান সোবহান বা আনিসুর রহমানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকর্মী হিসেবে ছাড়া একযোগে কাজ করার তেমন সুযোগ আমার হয়নি। তাহেরউদ্দিন ঠাকুর তৎক্ষণাৎ পরিচয় করিয়ে দিলেন মাহবুব আলম চাষীর সঙ্গে। পরে তাঁদের সূত্রে আরো একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়, তিনি ড. হাবিবুর রহমান (স্বাধীন বাংলাদেশে তেল ও গ্যাস করপোরেশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন, কয়েক বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়)। আগরতলায় বাসকালে বাংলাদেশ সরকারপক্ষের এ তিনজনের সঙ্গেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বিশেষ যোগাযোগ থাকে। কর্নেল চৌমুহনীর অফিস কেন্দ্র করে আর যাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁরা হলেন পরিষদ্-সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, জহিরুল কাইউম ও (আমার ছাত্র) খালেদ মোহাম্মদ আলী, প্রাদেশিক পরিষদ-সদস্য জহুর আহমদ চৌধুরী, মোশাররফ হোসেন, আবদুল ওয়াহাব ও মীর্জা আবু মনসুর এবং আমার দুই ছাত্র, যুব ও ছাত্র নেতা, শেখ ফজলুল হক মণি ও এস এম ইউসুফ।

কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর) ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ও কর্মীদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল শহরে ক্র্যাফটস ইনস্টিটিউটের হস্টেলে। সেখানে যাঁদের দেখা পাই, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কমরেড অনিল মুখার্জী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, চৌধুরী হারুনুর রশীদ, মতিয়া চৌধুরী, সাইফউদ্দীন আহমদ মানিক, ডা. সারওয়ার আলী ও তার স্ত্রী ডা. মখদুম নার্গিস রত্না, আয়েশা খানম, বখতিয়ার নূর সিদ্দিকী, খোরশেদ আলম এবং আমার তিন ছাত্র, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, আবুল হাসনাত ও মাহবুবুল হক। মোহাম্মদ ফরহাদের সঙ্গে তখনই দেখা হয়েছিল, না আমি পরে যখন আবার আগরতলায় আসি তখন, তা জোর দিয়ে বলতে পারছি না। ক্র্যাফটস হস্টেলে আরো ছিলেন আমার পুরোনো বন্ধু, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি, লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ।

আগরতলায় আর দেখা হয়েছিল পি আই এ-র বৈমানিক ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দীন আহমেদের সঙ্গে। প্রথম সুযোগেই তিনি ঢাকা ছেড়ে এসেছিলেন এবং এখন সুযোগ খুঁজছিলেন মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় হবার। সেই সুযোগ এসেছিল বেশ পরে। সেপ্টেম্বরে যখন বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠিত হয়, ক্যাপ্টেন শাহাব তাতে যোগ দেন। আমি যতদূর জানি, ডিসেম্বরে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে অটার বিমান নিয়ে চট্টগ্রাম বা ঢাকায় যাঁরা অভিযান চালান, তিনি তাঁদের মধ্যে ছিলেন। আরো একজনের কথা মনে পড়ে। তিনি লস্কর আবুল কালাম—ই পি সি এসের সদস্য। তাঁর সঙ্গে সুবা ভাইয়ের মারফত পরিচয় হয়েছিল রামগড়ে। অচিরেই তিনি আগরতলায় চলে আসেন এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় প্রশাসনে যোগ দেন। অমন বিপর্যয়ের মধ্যেও সবসময়ে তাঁর মুখে হাসি লেগে থাকতো—একটা নৈতিক সাহস ঘিরে থাকতো তাঁকে। স্বাধীনতালাভের পরে তিনি বিয়ে করেন আমারই এক ছাত্রীকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চাঁদপুরেরর ডি সি হিসেবে কর্তব্যপালনকালে অল্পবয়সে মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

তাহেরউদ্দিন ঠাকুরকে প্রথমেই আমি দুটো অনুরোধ জানাই। এক, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে আমার আগরতলা পৌঁছোবার সংবাদ জানাতে ; দুই বেতার-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বা প্রচারমূলক লেখালেখি করে যাতে আমি যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করতে পারি, তার সুযোগ করে দিতে। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনোটাই করেননি। অবশ্য আগরতলায় আমাদের বেতার-কেন্দ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনো অসংগঠিত। নিতান্ত স্বল্পক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটারে কিছুক্ষণের জন্যে প্রচারিত হতো—বেশিদূর শোনা যেতো না। বেতারের কর্মীরাও অত্যন্ত কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যে ছিলেন। আমার সঙ্গে একদিন তাঁদের কর্মক্ষেত্রে বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, মোস্তফা আনোয়ার, আবদুল্লাহ্ আল ফারুক, সুব্রত বড়ুয়া এবং আরো কয়েকজনের দেখা হয়। ওই অবস্থায়ও তাঁরা নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য চাইছিলেন না—চাইছিলেন আরো শক্তিশালী ট্রান্সমিটার পাওয়ার এবং আরো কার্যকর অনুষ্ঠান করার সুযোগ। আমাদের প্রচার-ব্যবস্থাও ঠিকমতো গড়ে ওঠেনি তখন পর্যন্ত। অতএব আমাকে কাজে না লাগানোর জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। তবে প্রধানমন্ত্রীকে তাহেরউদ্দিন আমার খবরটা দিতে পারতেন। তাজউদ্দীনের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৫১ থেকে, এ কথা না জানলেও, আমাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা তিনি জানতেন। খবর যে দেওয়া হয়নি, তাও আমি জানতে পারিনি। ফলে, প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে তাঁর প্রতি আমার মনে অনুচিত অভিমান জন্মেছিল।

মাহবুব আলম চাষী ও হাবিবুর রহমান একদিন আমাদের বাসস্থানে এলেন। যুদ্ধের প্রশিক্ষণরত তরুণদের প্রণোদনার জন্যে সমরবিদ্যার বাইরে তাদের কিছু শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, এ কথা তাঁরা বলেছিলেন। আলোচনার সময়ে ওসমান জামালকে ডেকে নিয়েছিলাম। আমরা সকলে একমত হই যে, অস্ত্রের সঙ্গে শাস্ত্রের জ্ঞান যুক্ত না হলে আমরা হত্যাকারী বানাতে পারবো, মুক্তিযোদ্ধা বানাতে পারবো না। তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেন মুক্তিযোদ্ধাদের উপযোগী একটা পাঠক্রম তৈরি করে দিতে। জামাল ও আমি দুজনে মিলে একটা খসড়া রচনা করে দেবো বলে কথা দিলাম। খানিকটা মানবসভ্যতার ও বাংলার ইতিহাস, খানিকটা অর্থনীতির ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূলসূত্র মিলিয়ে একটি পাঠক্রম প্রণয়ন করে দিন দুই পরে তাঁদের হাতে দিই। তাঁরা তা ব্যবহার করেননি, কেননা তা বেশি বামঘেঁষা-চিন্তাপ্রসূত বলে মনে করেছিলেন। মৃদু হেসে চাষী আমাকে বলেছিলেন, 'ডোন্ট ইউ ফরগেট, প্রফেসর, দ্যাট দি আওয়ামী লীগ ইজ এ পার্টি অফ দি পেটি বুর্জোয়াসি।' যুব-ক্যাম্পে জামাল ও আমার প্রশিক্ষক হওয়ার যে-কথা একবার উঠেছিল, তাও এরপর চাপা পড়ে যায়।

তাঁদের এই মনোভাবের সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল মুক্তিযোদ্ধা বাছাই-সংক্রান্ত চলমান প্রক্রিয়া। ইচ্ছুক তরুণদের নির্বাচন করে প্রথমে নেওয়া হতো যুব-শিবির বা ইয়ুথ ক্যাম্পে। সেখানে কিছুদিন রেখে, বক্তৃতা প্রভৃতি করে প্রণোদনা দিয়ে, আবার বাছাই করে যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করতে পাঠানো হতো প্রশিক্ষণ-শিবির বা ট্রেনিং ক্যাম্পে। বহুজন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চাইছিল এবং এ চাহিদা ক্রমশ বাড়ছিল। নির্বিচারে সবাইকে গ্রহণ করা যেতো না, তা ঠিক। কিন্তু দেখা যাচ্ছিল যে, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ বা ছাত্রলীগের যেসব নেতা মুক্তিযোদ্ধা-প্রবেশনের দায়িত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েছিলেন, তাঁরা কেবল দলীয় প্রভাব–বলয়ের মধ্যে থেকেই তরুণদের গ্রহণ করছিলেন। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী বা সাধারণভাবে বামপন্থীদের সম্পর্কে তাঁরা খুব সন্দেহপ্রবণ ছিলেন। এ নিয়ে ব্যাপক অভিযোগ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক তরুণদের কেউ কেউ আমাকে খুঁজে বের করে তাদের নালিশ বা মিনতি জানিয়েছিল। তাদের মধ্যে একই সঙ্গে সংকল্প ও ব্যর্থতাবোধ দেখে বিস্মিত না হয়ে পরিনি। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে তাঁরা কখনো হেসে, কখনো সময় চেয়ে নিয়ে, কখনো দেখবেন বলে বিষয়টির ইতি টেনেছিলেন।

আমাদের সেনা-কর্মকর্তাদের মধ্যে অন্তত দুজন—মেজর খালেদ মোশাররফ ও ক্যাপ্টেন রফিক—এর প্রতিবিধানের চেষ্টা করেছিলেন। আওয়ামী লীগের প্রভাব–বলয়ের বাইরের ছেলেদের প্রশিক্ষণদানে তাঁরা উদ্‌যোগী হয়েছিলেন এবং পরে একাধিক ট্রেনিং ক্যাম্প গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝিও হয়েছিল। ত্রিপুরার সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যেও কেউ কেউ প্রশিক্ষণার্থী-বাছাইয়ে উদার নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। জনশিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক কে কে দত্ত ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি সি পি আইয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানতে পারি। তবে এঁরা কেউ যে সরাসরি আমাদের নেতাদের কিছু বলেছিলেন, তা মনে হয় না। নিজেদের পর্যবেক্ষণ ও বিবেচনার কথা তাঁরা হয়তো জানিয়েছিলেন নিজেদের সরকারকে।

তবে সন্দেহপ্রবণতা যে শুধু আওয়ামী লীগের লোকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেন, 'মল্লিক ও আলী আহসান এসেছে কেন?' আমি বলি, 'যে-কারণে আমরা সবাই এসেছি।' তিনি ওঁদেরকে গভীরভাবে পাকিস্তানপন্থী বলে জানেন এবং সেজন্যে ওঁদের ভারতে আসাটাই তিনি সংশয়ের চোখে দেখেন। আমি তাঁকে বলি যে, এককালে তো অনেকেই পাকিস্তানপন্থী ছিলেন। তাছাড়া মল্লিক সাহেবের চিন্তার পরিবর্তন হয়েছে, আর আলী আহসান সাহেবের সঙ্গে মোনায়েম খাঁর দ্বন্দ্ব–সংঘাতের কথা সুবিদিত। মোজাফফর সাহেব যে সেকথা স্বীকার করেননি, তা আমার মুখের উপরেই তিনি বলে দিয়েছিলেন।

সবচেয়ে মারাত্মক মনে হয়েছিল শেখ মণির কথা। মণি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র ছিল। পরস্পরের মতামত সম্পর্কে আমরা অপরিচিত ছিলাম না। একদিন তার সঙ্গে দেখা হতে সে আমাকে সাইকেল–রিকশায় তুলে নিলো, তারপর যেতে যেতে অনেকক্ষণ আলাপ হলো। বঙ্গবন্ধু যে ২৫ মার্চ রাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন, এ কথা নিশ্চিতভাবে মণিই সেদিন বলে। সে আরো বলে যে, পঁচিশ তারিখ সন্ধ্যায়ই বোঝা গিয়েছিল, পাকিস্তান আর্মি ক্র্যাকডাউন করতে যাচ্ছে। সন্ধ্যার আগেই ইয়াহিয়া খান যে গোপনে বিমানযোগে ঢাকা ত্যাগ করেছেন, সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবরও বঙ্গবন্ধু পেয়েছিলেন। মণি অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিল। স্থির হয়েছিল যে, তিনি আত্মগোপন করবেন—জীবনে এই প্রথমবারের মতো। তার প্রস্তুতি হিসেবে একটা গাড়িতে বঙ্গবন্ধুর স্যুটকেসও তোলা হয়েছিল। তারপর কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছ থেকে একটা টেলিফোন পেয়ে বঙ্গবন্ধু মত বদলে ৩২ নম্বরের বাড়িতে থেকে যান এবং সেখান থেকেই তাঁকে পাকিস্তানিরা ধরে নেয়।

ফোনটা কে করেছিলেন, স্বভাবতই তা জানতে চাই। মণি কারো নাম বলেনি। তবে আকারে-ইঙ্গিতে সে যাঁকে বুঝিয়েছিল, তিনি তাজউদ্দীন আহমদ। বঙ্গবন্ধু না থাকলে তাজউদ্দীনের নেতৃত্ব নিরঙ্কুশ হবে, এ ধরনের একটা ধারণা বা উদ্দেশ্যের ইঙ্গিতও সে দিয়েছিল।

তাজউদ্দীনের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা মণির অজানা ছিল না। সে-কারণে নয়, বরঞ্চ কথাটা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে এবং মণি যে কারো বিরুদ্ধে কোনো প্রচারাভিযান চালাচ্ছে না তা বোঝাবার জন্যে সে নাম বলেনি, তা আমি স্পষ্ট অনুভব করেছিলাম। কিন্তু তাজউদ্দীনকে আমি এতোই ভালো চিনতাম যে, মণির কথায় আমার প্রত্যয় হয়নি।

তবে একটা ভয়ংকর অস্বস্তি ও দুর্ভাবনা নিয়ে সেদিন ঘরে ফিরেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে। এখনই যদি মণির মতো প্রভাবশালী মানুষ নিজের দলের সর্বোচ্চ পর্যায়ের একজন নেতা এবং সরকারের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এমন রটনা করতে পারে, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ কী, সেকথা ভেবে নিদারুণ শঙ্কায় চিত্ত আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮.

আর্থিক অবস্থা বড়োই শোচনীয়। সেই পয়লা মার্চে মাইনে তুলেছিলাম, তারপর আর টাকা–পয়সার মুখ দেখিনি। ব্যাংক তো প্রায়ই বন্ধ থাকলো, খোলা থাকলেও বা কী, আমার হিসেবে তেমন টাকাকড়ি ছিল না। মার্চের শেষ দিকে একদল উত্তেজিত অভাবগ্রস্ত লোক বিশ্ববিদ্যালয়–সংলগ্ন ইউনাইটেড ব্যাংক ও হাবিব ব্যাংকের শাখা লুঠ করতে গিয়েছিল, ভাইস-চান্সেলর তা হতে দেননি। বক্তৃতা দিয়ে তিনি সমবেত জনতাকে বুঝিয়েছিলেন যে, মুক্তিসংগ্রামের ভাব ও চেতনার সঙ্গে লুঠতরাজ খাপ খায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা-রক্ষীদের তিনি নিয়োগ করেছিলেন ব্যাংক পাহারা দিতে, আর সত্যি সত্যি চেষ্টা করেছিলেন ব্যাংকের ম্যানেজারদের খুঁজে পেতে। পেলে কোনো না কোনো উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল চাকুরের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করতেন। কিন্তু ম্যানেজারেরা তখন কে কোথায়! এপ্রিলের গোড়ায় আমরা কেউ মাইনে পেলাম না— সেটাই হয়ে দাঁড়ালো সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। আর এখন তো মে মাস— আর এক কপর্দকও অর্জন করিনি। কাস্টমস থেকে মালপত্র ছাড়াবে বলে আজিজ চট্টগ্রামে এসেছিল, শুল্কবাবদ হাজার পাঁচেক টাকা এনেছিল সঙ্গে। সেটা দিতে হয়নি বলে তার থেকে কিছু কিছু নিয়ে খরচ করি। পাকিস্তানি টাকার দাম দ্রুত কমছে, ১০০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে ৪০ ভারতীয় টাকা। স্ত্রীর গয়নাপত্রে অবশ্য তখনো হাত পড়েনি, মনে হচ্ছে অচিরেই হাত দিতে হবে। আগরতলায় এসেই সুবা ভাই অন্য জিনিস বিক্রি করে কিছু টাকা পেয়েছিলেন, সেও এমন বেশি কিছু নয়। পথে বেরোলেই কাঁঠাল গাছ দেখিয়ে তিনি বলতেন, 'এখানে এতো কাঁঠাল হয় যে, খাওয়ার লোক পাওয়া যায় না, গাছেই কাঁঠাল পচে। আর কদিন পর কাঁঠাল পাকবে, গাছ থেকে নিলে কেউ আপত্তি করবে না। কদিন সবুর করো, কাঁঠাল খেয়েই বাঁচা যাবে।'

শহর থেকে একদিন ফিরে এসেছি। আমার সাত বছর বয়সের মেয়ে রুচি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে এসে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'যুদ্ধ থেমে গেলে আমাকে একটা রসগোল্লা কিনে দেবে?' স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, বিষয়টা কী? সে যা বললো, তার মর্ম এই যে, ঘন্টা বাজিয়ে মিষ্টিওয়ালা এসেছিল আমাদের হস্টেলে; বাচ্চারা সব গিয়েছিল ছুটে, কিন্তু অতোজন শিশুর জন্য মিষ্টি কেনার সংগতি কার আছে? অতএব মিষ্টিওয়ালাকে বিদায় করে দেওয়া হয়। রুচিকে বলা হয় যে, এখন যুদ্ধ চলছে, এ সময়ে রসগোল্লা কেনা অসম্ভব। আমি বেবীকে বললাম, 'তোমরা যার যার বাচ্চার জন্যে মিষ্টি কিনে দিলে তো পারতে!' সে বললো, 'মাথায় আসেনি।'

নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু আঁচ করতে পারছি না। এটা পরিষ্কার যে, দেশ স্বাধীন করতে হলে ভারতের বড়োরকম সাহায্য লাগবে। এপ্রিলের গোড়া থেকেই আমাদের একটা প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল, ভারত কী করবে? আমরা সবাই চাইছিলাম, ভারত সৈন্য পাঠাক আমাদের সাহায্যে, হানাদারদের তাড়িয়ে বাংলাদেশ মুক্ত করুক। কিন্তু আমাদের চাওয়াই তো যথেষ্ট নয়। ভারতের নিজস্ব ভাবনা আছে, যদিও সেটা যে কী, তা জানবার উপায় নেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলীয় নানা নেতা আমাদের প্রতি সহানভূতি ও সমর্থনসূচক অনেক কথা বলেছেন। তাঁদের প্রত্যক্ষ সহায়তা না থাকলে আমরা এখানে এসে প্রাণরক্ষা করতে পারতাম না, কিন্তু তারপর কী? রামগড়ে থাকতে বেবী একবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমাদের অবস্থা শেষ পর্যন্ত বায়াফ্রার মতো হবে না তো?' আমি বলেছিলাম, 'না, তা হবে না; বিশ্বের জনমত বিয়াফ্রার অনুকূলে ছিল না, আমাদের পক্ষে থাকবে।' কিন্তু যে-অন্ধকার সুড়ঙ্গে আমরা ঢুকেছি, কতোদিন পরে তার প্রান্তে পৌঁছে আলোকের দেখা পাবো, কে জানে!

AMARBOI.COM

এদিকে আগরতলায় শরণার্থী এতো বাড়ছে যে, স্থানীয় লোকের চেয়ে আমাদের সংখ্যা বেশি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। খাবারদাবারের সরবরাহের চেয়ে চাহিদা বেশি—জিনিসপত্রের দাম ক্রমে বাড়তে থাকলো। ভারত সরকার একটা রিফিউজি ট্যাক্স বসালেন। আমাদের প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও নতুন কর মানুষের গায়ে লাগে। ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপালের বাসায় রোজ কাগজ পড়তে যেতাম, তিনি যে খুব প্রসন্ন ছিলেন না, তা বুঝতে পারতাম। পূর্ববর্ণিত কারণে তাঁর অপ্রসন্নতা বোধহয় কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল। হঠাৎ করে *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় এক খবর পড়ে তাঁর মনোভাব বদলে গেলো। কাঠমাণ্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে সেবার মূল বক্তা ছিলেন ড. মল্লিক। তিনি যেতে না পারায় সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছে, আর পাকিস্তান সরকারের কাছে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে। মল্লিক সাহেবের এই আন্তর্জাতিক পরিচিতি এতোদিনে অধ্যক্ষের কাছে আমাদের ভাবমূর্তি একটু উজ্জ্বল করলো। *আনন্দবাজার পত্রিকায়* আবার এই সময়ে হাসান মুরশিদ ছদ্মনামে গোলাম মুরশিদের ধারাবাহিক রচনা 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পটভূমি' বেশ গুরুত্বের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশিত হচ্ছিল। তাতে আমার নাম পড়েও অধ্যক্ষ একটু খুশি হয়েছিলেন।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নতুন সংস্করণে দক্ষিণ এশীয় সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখার দায়িত্ব বর্তেছিল আমার ওপরে। খানিকটা লিখেছিলাম, অনেকখানিই লেখা হয়নি। যেটুকু লিখেছিলাম, তাও ফেলে এসেছিলাম, সঙ্গে আনতে পারিনি। নিজেদের অবস্থার কথা জানিয়ে *ব্রিটানিকার* সংশ্লিষ্ট সম্পাদককে চিঠি দিলাম এবং জানালাম যে, এই অবস্থায় ওটা আর আমার পক্ষে লেখা সম্ভবপর হবে না। ওঁদের হাউজ ম্যাগাজিনে আমার পত্রটা ছাপা হয়েছিল, 'নিরাপত্তার কারণে' আমার নামোল্লেখ না করে, কিন্তু একটা মারাত্মক ভুল তাতে হয়েছিল এই যে, সম্পাদকীয় টীকায় বলা হয় যে, পত্রলেখক একজন ভারতীয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হলে ম্যাগাজিনটা আমার হাতে আসে। সেইসঙ্গে লেখা চিঠিতে সংশ্লিষ্ট সম্পাদক বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের সংকটের স্বরূপটা তাঁরা প্রথম উপলব্ধি করেন আমার পাঠানো চিঠি থেকে। দ্বিতীয় চিঠি লিখি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অধ্যাপক এডওয়র্ড সি ডিমককে। বেবী চিঠি লেখে কলকাতায় তার ছোটফুপু সালমা চৌধুরীকে— আমরা কলকাতায় পৌঁছে যেতে পারি, এমন সম্ভাবনার উল্লেখ করে।

সংবাদপত্রে দেখলাম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি নামে একটা সংগঠন গড়ে উঠেছে ভাইস-চান্সেলর ড. সত্যেন্দ্রনাথ সেনকে সভাপতি এবং সিনেট-সদস্য অধ্যাপক দিলীপকুমার চক্রবর্তীকে সম্পাদক করে। বাংলাদেশের সব শরণার্থী শিক্ষককে তাঁরা অনুরোধ জানিয়েছেন, জীবনবৃত্তান্ত ও বর্তমান ঠিকানা জানিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আমরা শিক্ষকেরা সবাই তাই করলাম। আমাদের অবস্থা জানিয়ে সৈয়দ আলী আহসান চিঠি লিখলেন ভারতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ফ্রান্সে—কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমের সঙ্গে যুক্ত তাঁর বন্ধুদের কাছে। ড. মল্লিক পত্র দিলেন এক সময়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের, তখন অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির, ইতিহাসের অধ্যাপক এ এল ব্যাশামকে।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন সিংহ বাংলাদেশের বিষয়ে যেমন সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তেমনি তৎপর ছিলেন আমাদের সাহায্য করতে। তাঁর সঙ্গে তেমন আলাপ আমার হয়নি। আগরতলায় আমি যে দুজন শুভাকাঙ্ক্ষী লাভ করেছিলাম, তাঁর মধ্যে একজন ছিলেন জনশিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক কে কে দত্ত— তাঁর কথা আগে বলেছি। অপরজন ছিলেন আগরতলা কলেজের বাংলার অধ্যাপক, সমালোচক ও ছোটগল্পকার, কার্তিক লাহিড়ী— বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতি বিষয়ে অভিসন্দর্ভ লিখে পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভের অপেক্ষায় আছেন। এঁরা উভয়েই অসাধারণ পরিশীলিত ও সংবেদনশীল মানুষ। কার্তিক লাহিড়ী তাঁর একটি সদ্যপ্রকাশিত গল্প পড়তে দিয়েছিলেন। অস্ত্র হাতে পেয়ে একটা মানুষের চরিত্র কেমন বদলে যায়, অন্যের ওপর ক্ষমতাবিস্তারের নিষ্ঠুর আনন্দ কেমন করে তাকে বিকারগ্রস্ত করে তা-ই ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পের বিষয়। গল্প লেখার সময়ে তাঁর মনে বোধহয় জেগেছিল তখনকার সশস্ত্র বাম রাজনৈতিক কর্মীদের কথা। গল্প পড়ার সময়ে আমার মনে জেগেছিল পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর কথা— অস্ত্রের জোরে কী পাশবিক আচরণই না তারা করছে! সৈন্যোচিত শৃঙ্খলা বা মানবিকতা— কিছুই তাদের মনে স্থান পাচ্ছে না। আগরতলায় আমাদের এক বিশিষ্ট হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন *যুগান্তর* পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধি অনিল ভট্টাচার্য— তবে আমার চেয়ে তাঁর বেশি যোগ ছিল বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে।

আমাদের হস্টেলে একদিন দেখা দিলেন পুঁথিঘর প্রকাশনীর মালিক চিত্তরঞ্জন সাহা। আমার প্রয়াত শিক্ষক অজিতকুমার গুহের সূত্রে তাঁর এবং— আরো বেশি করে— তাঁর দাদা অচ্যুতানন্দ সাহার সঙ্গে পরিচয় ছিল। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরে অচ্যুতবাবু কলকাতা চলে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে পুঁথিপত্র নামে একটি প্রকাশনী চালাতেন। চিত্তবাবুও যাচ্ছেন কলকাতায়। তাঁর ইচ্ছে, সেখান থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু বই এবং বাংলাদেশের লেখকদের কিছু বই প্রকাশ করবেন। এ-বিষয়ে তিনি আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিলেন।

প্রায় একই সঙ্গে এলেন প্রণবরঞ্জন রায়— এখন সুপরিচিত শিল্প-সমালোচক। প্রণবকে আমি আগে দেখিনি, কিন্তু আমরা পরস্পরের সম্পর্কে জানতাম। তাঁর বাবা নীহাররঞ্জন রায়— *বাঙালীর ইতিহাস* গ্রন্থের বিখ্যাত রচয়িতা— আমার পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভের পরীক্ষক ছিলেন। প্রণবের শ্বশুর বিনোদ চৌধুরীও ছিলেন অজিত গুহের বন্ধু। তিনি নোয়াখালি অঞ্চলে বাঁশপাড়ার জমিদার ছিলেন, তবে থাকতেন চট্টগ্রামে। আমি চট্টগ্রামে আসার পরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রণব আগরতলায় এসেছিলেন শ্বশুর-পরিবারের সন্ধানে। বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যাওয়ার আগে আমার আগরতলায় অবস্থানের কথা শুনে দেখা করতে এলেন। তাঁদের ঠিকানা দিয়ে বললেন, কলকাতায় গিয়ে যেন যোগাযোগ করি। ওই মুহূর্তে কোনো সাহায্যের প্রয়োজন কিনা তাও জিজ্ঞেস করতে ভোলেননি।

সমষ্টিগতভাবে আমাদের কী প্রয়োজন, তা পরিমাপ করতে এলেন ড. ত্রিগুণা সেন— বিখ্যাত শিক্ষাবিদ। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে তিনি এসেছেন— তখনকার মতো এটাই তাঁর প্রধান দায়িত্ব। শরণার্থী-শিবিরগুলো পরিদর্শনের পরে তাঁর সঙ্গে বিশেষ একটা বৈঠক হলো আমাদের কয়েকজনের। সেখানে আমাদের সরকারের পক্ষে ছিলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও মাহবুব আলম চাষী; নাগরিক সমাজের পক্ষে ছিলেন ড. মল্লিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল শরণার্থী শিক্ষক। বৈঠকে শরণার্থী-শিবির ও যুব-শিবিরগুলোর ব্যবস্থাপনার কথা আলোচিত হয়েছিল আর আলোচিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সজোরে চালু করার বিষয়টি। আমাদের অনুরোধমতো একটা শক্তিশালী ট্রান্সমিটার দেওয়ার সুপারিশ করবেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে, সে প্রতিশ্রুতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলেন ড. সেন। যতোদূর মনে পড়ে, ওই বৈঠকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন সিংহও উপস্থিত ছিলেন।

আগরতলায় রবীন্দ্র-জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে সৈয়দ আলী আহসান ও আমি বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। বক্তৃতা করতে গিয়ে দেখি আকাশবাণীর পক্ষ থেকে তা টেপে ধারণ করা হচ্ছে। তখন খুব ভয় পেয়ে গেলাম। ভারতে আত্মপ্রকাশের ফলে যদি আব্বার কোনো ক্ষতি হয়, তাহলে নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারবো না। বক্তৃতা দিয়ে নেমে এসেছি মঞ্চ থেকে। এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, ঢাকায় আমাদের বাড়ির কাছেই তাঁর বাড়ি এবং জানতে চাইলেন, আব্বাদের কোনো খবর রাখি কিনা। অনেকদিন কোনো খবর পাইনি বলায় তিনি যা বললেন তার মর্ম এ রকম : ২৫ মার্চ রাতে ক্র্যাকডাউনের পরে সামরিক বাহিনীর গাড়ি ঠাটারিবাজার দিয়ে যাওয়ার সময়ে ইতস্তত গুলি করে। তারই একটা আমাদের বৈঠকখানার দরজা ভেদ করে আব্বার কম্পাউন্ডার এরফানের বাহুতে এসে লাগে। কারফিউ থাকায় দুদিন ওই অবস্থায় সে আমাদের বাড়িতেই পড়ে থাকে; ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধা আর হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়ানো ছাড়া কোনো সাহায্য করা সম্ভব হয়নি তাকে। কারফিউ উঠে গেলে তাকে নেওয়া হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে পালিয়ে যেতে বলা হয়। সে চলে আসে বটে, কিন্তু তার হাতটা ভালো হয়নি (বস্তুত, এরফান আজো পঙ্গু হাত নিয়ে বেঁচে আছে, তবে কর্মক্ষমতা লোপ পেয়েছে বলে সে এতোকাল ধরে অন্যের দয়ার ওপর নির্ভরশীল)। ভদ্রলোক যতোটা জানেন, বাড়ির আর সবাই ভালো আছে, তবে তিনি ঢাকা ছেড়েছেন এপ্রিলের শেষে, তারপর কী ঘটেছে তা বলতে পারছেন না।

মনটা আশঙ্কায় ভরে গেলো। নিজেদের সম্পর্কে অনিশ্চয়তাবোধের সঙ্গে বিশেষ করে আব্বা আর ছোট ভাইয়ের জন্যে দুশ্চিন্তা এবং এরফানের জন্যে উদ্‌বেগ বোধ করলাম। আমার বক্তৃতা বেতারে প্রচারিত হলে ঢাকায় কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা আর ভাবতে চাইলাম না।

এই অবস্থায় কলকাতা থেকে চিঠিপত্র আসতে শুরু করলো। সেখানে যাওয়ার প্রথম আহ্বান পেলেন ড. মল্লিক। স্থির হলো, তিনি প্রথমে একাই যাবেন। আমি পেলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির চিঠি— তাঁরা যেতে বলেছেন, গেলে আমার বিমানভাড়া দিয়ে দেবেন। সৈয়দ আলী আহসানও যাবেন বলে ঠিক করলেন, তবে একটু পরে। সহায়ক সমিতিকে কোরেশী জানালো যে, তারা বিমানের টিকিট পাঠালে সে রওনা হবে। অন্যেরা অপেক্ষা করতে লাগলেন যথোচিত সাড়া পাওয়ার।

এদিকে এইচ টি ইমামের কল্যাণে সুবা ভাই একটা চাকরি পেয়ে গেলেন। তখন পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশের আঞ্চলিক প্রশাসনকেন্দ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থাপিত হয়েছে। আগরতলায় ছিল দক্ষিণপূর্ব অঞ্চল-২-এর সদর দপ্তর। জহুর আহমদ চৌধুরী এর রাজনৈতিক প্রধান, প্রশাসনের প্রধান এইচ টি ইমাম। ওই আঞ্চলিক সদর দপ্তরে প্রশাসনিক একটা কাজ তিনি দিলেন সুবা ভাইকে, তাতেই আমরা খুশি। পরে এইচ টি ইমাম বাংলাদেশ সরকারের সাধারণ প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব হয়ে কলকাতায় চলে গেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এস ডি ও (এখন তথ্য-সচিব) কাজী রকীবউদ্দীন আহমদ। অত্যন্ত স্থিতধী ও গভীর মনোবলসম্পন্ন এই মানুষটির সঙ্গে কথা বলে আরাম পাওয়া যেতো।

এর মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর আমার ও আজিজের গাড়ি রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং আগরতলায় গাড়ি চালাচ্ছি। কলকাতা যাওয়ার সম্ভাবনায় এবারে আবেদন জানালাম গাড়ি সেখানে নেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি পেয়েও গেলাম। যে-কর্মকর্তা অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন, তিনি সেদিনই রাতে হস্টেলে এসে হাজির। বললেন, সরকারের একটা নতুন সার্কুলার এসেছে— যে-রাজ্যে বাংলাদেশ থেকে গাড়ি ঢুকছে, সে-রাজ্যের বাইরে গাড়ি নেওয়া যাবে না। তিনি এ নির্দেশের কথা না জেনেই অনুমতি দিয়ে ফেলেছেন, এখন যেন আমরা অনুগ্রহ করে অনুমতিপত্র দুটো তাঁকে ফেরত দিই। আজিজ অম্লানবদনে বলে দিলো, সে গাড়ি রওনা করিয়ে দিয়েছে। আমি আর সে কথা বলতে পারলাম না। অনুমতিপত্র তাঁর হাতে তুলে দিলাম বিষণ্ন মনে।

পরদিন সকালে লোক-মারফত আজিজ গাড়ি পাঠিয়ে দিলো কলকাতার উদ্দেশে। আমি ক্র্যাফটস হোস্টেলে গিয়ে সব কথা বললাম। যাকে আমার সংকটের কথা বলি, সেই উল্লসিত। বলে, গাড়ি আমাদের কাছে রেখে যান— মুক্তিযুদ্ধের কাজে লাগবে। শফিউল হাসান— ডাকনাম শফু— নামে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্রের হাতে গাড়ি সমর্পণ করা গেলো (শফুর ভাই রাজিউল হাসান ওরফে রঞ্জু লন্ডনে বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর একান্ত সহকারী হিসেবে মুক্তিযু কাজ করে এবং স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সার্ভিসে যোগ দেয়, আর শফু ডাক্তার হয়ে পরে চলে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে)। কথা রইলো, যখনই অনুমতি পাই, আমি গাড়ি নিয়ে যাবো।

পরে সবাই আমাকে বলেছিল, আমার গাড়ি মুক্তিযুদ্ধের খুব কাজে এসেছিল। শফু ওটা নিয়ে নিয়মিত আগরতলা-সাবরুম করেছে। তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের ভিতরে পাঠাবার লক্ষ্যে তাদের গাড়ি করে নিয়ে গেছে সীমান্ত-অঞ্চলে। মুক্তিযুদ্ধ করবে বলে পণ করে যেসব তরুণ দেশ ছেড়ে ভারতে পৌছোতো, তাদের অনেককেও সীমান্ত থেকে ওই গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আগরতলায়, সেখান থেকে প্রশিক্ষণ-শিবিরে। শুধু শফু নয়, কম্যান্ডার রউফ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের কাজে তিনিও ব্যবহার করেছেন ওই গাড়ি।

ড. মল্লিক বিমানযোগে চলে গেলেন কলকাতায়। কলকাতায় যাওয়ার জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের টিকিট পেতে কিন্তু আমরা ব্যর্থ হলাম। একসঙ্গে চারজন পূর্ণবয়স্ক এবং তিনজন শিশুর (তার মধ্যে একজনের অন্তত আসন চাই) টিকিট পাওয়া দুষ্কর। তখন জামএয়ার নামে একটি বেসরকারি বিমান কোম্পানি কার্গো নিয়ে আগরতলায় আসতো এবং যাত্রী নিয়ে ফিরে যেতো। শেষ পর্যন্ত তাদের এক ফ্লাইটে জায়গা পাওয়া গেলো। সবার কাছ থেকে আবার বিদায় নিলাম, কিছুটা সাশ্রুনয়নে তো বটেই। ১৫ মে সকালে আগরতলা থেকে রওনা হয়ে গৌহাটিতে যাত্রাবিরতি করে আমরা কলকাতায় এসে যখন পৌঁছোলাম, সূর্য তখন অস্তগামী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



বিমানবন্দর থেকে ট্যাক্সি নিয়ে আমরা চললাম পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ছোট ফুপু সালমা চৌধুরী ও ফুপা ফজলুর রহমান চৌধুরীর (নাসের) ৪০/এ, দিলখুশা স্ট্রিটের বাড়িতে। এই পার্ক সার্কাসে আমার শৈশব কেটেছে দিলখুশা স্ট্রিটেরই প্রায় সংলগ্ন কংগ্রেস একজিবিশন রোডের দুটি বাড়িতে। আমি পার্ক সার্কাস হাই স্কুলে পড়েছি, রশীদ আলী দিবসে স্কুলে ধর্মঘট করে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে মিছিল করে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গিয়েছি— সেই আমার প্রথম রাজনৈতিক সংস্রব। ১৯৪৭এর অক্টোবরে কলকাতা ছেড়ে আসি, মধ্যে ১৯৫৯এ একবার এসেছিলাম, তারপর এই শরণার্থী হয়ে আসা।

ফুপুদের বাসায় পৌঁছে দেখা গেলো, ওঁদের দুই ছেলেমেয়ে ইমতিয়াজ (ইমি— বয়স তখন ১৬/১৭) ও সানি (বয়স ৮ হবে) ছাড়াও শানু নামে ফুপার ছোট ভাই থাকেন ওঁদের সঙ্গে। তার ওপর, ফুপার বিলেতযাত্রী বোন-ভগ্নীপতি এসেছেন বাঁকুড়া থেকে, সঙ্গে বোধহয় আরো কেউ কেউ। এর মধ্যে তিন শিশু নিয়ে আমরা চারজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ হাজির। খানিক পরে দেখলাম, জামাকাপড় পরে ফুপা চললেন বন্ধুর বাড়ি রাত কাটাতে নিজের ঘরে তাঁর ঠাঁই হচ্ছে না বলে।

আমি চললাম ড. মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে। পার্ক স্ট্রিটে এক বাড়িতে তিনি অতিথি। গৃহকর্ত্রী ড. ছায়া ঘোষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শিক্ষক-ছাত্রীর। গৃহকর্তা কমল ঘোষও তাঁর অনুরাগী। ঠিকানা জানতাম, পার্ক স্ট্রিটও অচেনা নয়, সুতরাং হেঁটেই চললাম। পথে এক দুর্বিনীত পেরেক ডান পায়ের গোড়ালিতে ফুটে গেলো। পেরেক যদিও বের করলাম, কিন্তু হাঁটতে কষ্ট হয়। ফেরার পথে ট্যাক্সি নিলাম। ভাড়া এক টাকা, সারচার্জ দশ পয়সা। দশ পয়সা ঠিক আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে আস্ত একটা টাকা বেরিয়ে গেলো তার জন্য মনটা খচখচ করতে লাগল পেরেক বেঁধার মতোই। রাতে যতবার ঘুম ভাঙে, ভাবি, নিজের জন্যে একটা টাকা খরচ

করে বড়ো স্বার্থপরের মতো কাজ করেছি।

বহুদিন পরে সে রাতে গোলাগুলির শব্দ শুনতে হয়নি। পরদিন রুচি জিজ্ঞেস করল, 'এখানে যুদ্ধ লাগলে আবার আমাদের অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে?' তাকে কাছে টেনে নিয়ে ভরসা দিই, 'এখানে যুদ্ধ লাগবে না।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির চিঠিতে যেমন নির্দেশ ছিল, তা অনুসরণ করে টেলিফোন করলাম ইসলামের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ড. অনিরুদ্ধ রায়কে, তার বাসায়। পরে অনিরুদ্ধের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং সে-বন্ধুত্ব এখনো অটুট। তবে সেদিন অনিরুদ্ধ আমার সঙ্গে একটু চালিয়াতি করেছিল বলে এখন মনে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সেদিন বন্ধ থাকায় কিংবা অন্য কোনো কারণে সে আমাকে দেখা করতে বললো সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের সিটি অফিসের হল ঘরে। কী রঙের ছাপা হাওয়াই শার্ট সে পরে থাকবে এবং তার হাতে যে একটা পাইপ থাকবে— তাও বলে দিল। সুতরাং তাকে শনাক্ত করতে বিলম্ব হলো না। সে আমাকে নিয়ে গেলো একটা চীনা রেস্টুরেন্টে— সেখানে বসে আলাপ শুরু হলো। অনিরুদ্ধ ও তার স্ত্রী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের শিক্ষক, ইন্দ্রানি (এখন লোকান্তরিত) দুজনেই ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়েছেন প্যারিস থেকে। সেই সুবাদে মাহমুদ শাহ্ কোরেশী ও মনিরুজ্জামান মিয়া (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও সেনেগালে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত) তার পরিচিত। আমি উভয়কেই চিনি জেনে সে বেশ সন্তোষ প্রকাশ করল। তারপর এক দুরুচ্চার্য ফরাসি বা স্প্যানিশ নাম উল্লেখ করে জানতে চাইল, আমি তাকে চিনি কিনা। চিনি না বলায়, দেখা গেলো, সে বেশ খুশি। বললো, লোকটার নানারকম গোলমেলে যোগাযোগ আছে, তাকে এড়িয়ে চলাই ভালো। যাকে চিনি না, তাকে এড়ানোর প্রশ্ন কেন উঠছে, তা বুঝতে পারলাম না। খাবারের অর্ডার দেওয়ার মুহূর্তে অনিরুদ্ধ জানতে চাইলো, পর্কে আমার আপত্তি আছে কিনা, তারপর যোগ করল, এদের অধিকাংশ ডিশেই কিছু না কিছু পর্ক থাকে।

অনিরুদ্ধ তার গাড়িতে করে নিয়ে গেলো, যতদূর মনে হয়, বালিগঞ্জে কোনো বাড়িতে। সেখানে ঢুকতেই যাকে দেখতে পেলাম, সে ব্যারিস্টার আমীরউল ইসলাম, ঘন শ্মশ্রুমণ্ডিত। আমীর জগন্নাথ কলেজে আমার এক ক্লাস নিচে পড়তো, সেই থেকে তার সঙ্গে চেনাজানা, কিন্তু তার দাড়ি একেবারেই অচেনা। তাকে দেখে স্বভাবতই আমি উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিছু বলার আগেই সে দ্রুত আমার পাশে এসে ফিস ফিস করে বললো, 'আমার নাম রহমত আলী'। তাই সই। তারপর আমীর বললো, তার পরিবার তখনো ঢাকায়। ঢাকার কিছু খবর পাওয়া গেলো তার কাছ থেকে। আমার ঠিকানা নিয়ে সে যোগাযোগ করার প্রতিশ্রুতি দিল এবং আমার কলকাতা আসার খবর তাজউদ্দীন সাহেবকে জানাবে, এরকম কথাও দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন থেকে শুরু হলো আমার দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ে যাওয়া— ওই ভবনেরই দোতলার এক ঘরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির অফিস। এই সহায়ক সমিতি গঠিত হয়েছিল ৩ এপ্রিল, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের সব দলমতের শিক্ষকদের নিয়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন এর সভাপতি, সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) পি কে বসু কার্যকরী সভাপতি এবং সহ-উপাচার্য (অর্থ) হীরেন্দ্রমোহন মজুমদার কোষাধ্যক্ষ। সম্পাদক সিটি কলেজের অর্থনীতির শিক্ষক ও সিনেট-সদস্য দিলীপকুমার চক্রবর্তী, যুগ্ম-সম্পাদক প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেত্রী ইলা মিত্র, সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এস কে মিত্র ও এস ভট্টাচার্য। দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ের অফিসে যেতেই পরিচয় হলো দিলীপ চক্রবর্তীর সঙ্গে— যেমন কর্মতৎপর সংগঠক, তেমনি সহৃদয় মানুষ। অফিস আগলে বসে ছিলেন যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়- কোনো কলেজের বাংলার অধ্যাপক। নেতৃস্থানীয় আরেকজনকে পেলাম— বাণিজ্য বিভাগের অনিল সরকার— তার সঙ্গে সেদিনের পরিচয় আজীবন বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

স্থির হলো, আমি ওই অফিসে রোজ বসবো, শরণার্থী শিক্ষক যাঁরা আসবেন তাঁদের সাক্ষাৎকার নেবো, তাঁদের আর্থিক প্রয়োজন পরিমাপ করব। আরো স্থির হলো যে, বাংলাদেশের উদ্বাস্তু শিক্ষকদের একটা নিজস্ব সমিতি গঠন করা প্রয়োজন- তারও উদ্‌যোগ নিতে হবে। উদ্‌যোগ নেওয়াটা সহজ ছিল না, কারণ ততোদিনে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে কয়েক হাজার শিক্ষক ভারতে চলে এসেছেন। ওঁদের সবার জন্য একটাই সংগঠন চাই এবং তা প্রতিনিধিত্বশীল হওয়া দরকার। সমিতি গঠন করার জন্যে একটা প্রাথমিক সভা করতে হবে এবং সে সভাও আহ্বান করাতে হবে প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিদের দিয়ে।

পরে, যতদূর মনে পড়ে, সভা আহ্বান করা হয়েছিল ড. মল্লিক (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), ড. খান সারওয়ার মুরশিদ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ড. ফারুক খলিল (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যক্ষ দেওয়ান আহমদ (কুষ্টিয়ার কুমারখালি কলেজ), জনাব কামরুজ্জামান (জাতীয় পরিষদ-সদস্য, ঢাকার কে এল জুবিলী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং স্কুল-শিক্ষকদের সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতির সভাপতি) এবং আমার নামে। ভিতরে ভিতরে আলোচনা হতে লাগলো সভার কর্মকর্তা কারা হবেন এবং তা নিয়ে একটু জটিলতার সৃষ্টি হলো।

এর পটভূমিকাটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। কলকাতায় এরই মধ্যে মল্লিক সাহেবকে সভাপতি করে এবং জহির রায়হানকে সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগের শিক্ষক ড. বেলায়েত হোসেনকে সম্পাদক করে বাংলাদেশ লিবারেশন কাউনসিল অফ দি ইনটেলিজেনসিয়া নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠেছে। খান সারওয়ার মুরশিদ, কামরুল হাসান, সৈয়দ আলী আহসান ও রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন এর সহ-সভাপতি, আর নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন সাদেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খান, ফয়েজ আহমদ, সৈয়দ হাসান ইমাম, মওদুদ আহমদ (ব্যারিস্টার), ব্রজেন দাশ (সাঁতারু), ওয়াহিদুল হক, ড. মতিলাল পাল, আলমগীর কবীর, অনুপম সেন, এম এ খায়ের, মুস্তাফা মনোয়ার ও কামাল লোহানী। এটি যে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। তবু বাংলাদেশ সরকার নাকি এই সংগঠনের প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন। জহির আমাকে বলেছিল যে, তার কারণ, সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা আওয়ামী লীগ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কেউ এতে ছিলেন না এবং যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে, জহিরের মতো কেউ কেউ বামপন্থী বলে খ্যাত ছিলেন। বেলায়েত পরে বলেছিলেন যে, আওয়ামী লীগ দলীয় একজন পরিষদ-সদস্যকে— তিনিও একজন বুদ্ধিজীবী এবং তাঁকে এতে রাখলে কোনো ক্ষতি ছিল না— এই সংস্থায় একটু জোর করে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা থেকেই ভুল-বোঝাবুঝির সূত্রপাত হয়। শুনেছি যে, একই ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে সংগীতশিল্পীদের সংগঠন এবং চলচ্চিত্র কর্মীদের সংগঠন নিয়ে।

এ কথা শুনে আমার চট করে মনে পড়ে গেলো আগরতলায় মুক্তিযোদ্ধা-প্রবেশনের বিষয়টা। দুটোর মধ্যে একটা যোগসূত্র দেখতে পেলাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা আশঙ্কা করছিলেন যে, শিক্ষক সমিতি নিয়েও এরকমটা হতে পারে। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, বেসরকারি সংগঠনগুলো যতটা সম্ভব সরকারি প্রভাবের বাইরে থাকা ভালো, তবে এ বিষয়ে বাংলাদেশের লোকেরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আমাদের মতটাও ছিল তাই।

শিক্ষক সমিতি-গঠনের জন্যে সভা আহ্বানের বিষয়ে স্বভাবতই কামরুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগের কথা ওঠে— কেননা তিনি ছিলেন স্কুল-শিক্ষকদের সংগঠনের নির্বাচিত নেতা। যোগাযোগের ভারটা আমাকেই দেওয়া হয়। কামরুজ্জামান এককালে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রনেতা এবং ১৯৫৩ সালে কালাকানুনবিরোধী ছাত্র আন্দোলন পরিচালনার জন্যে গঠিত কমিটির আহ্বায়ক। এই আন্দোলনের সঙ্গে সংস্রবের কারণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন, পরে অবশ্য সে-আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ওই সময়ে আই এ পরীক্ষা শেষ করে আমি এই আন্দোলনের কাজে লেগে যাই। আমার কাজ ছিল, আন্দোলন-সংক্রান্ত খবর ও বিবৃতি তৈরি করে কামরুজ্জামানের নামে সই দিয়ে সংবাদপত্রে পাঠানো। তিনি সাধারণত খবরের কাগজেই নিজের বিবৃতি পড়তেন। ষাটের দশকের মধ্যভাগে কামরুজ্জামান যখন শিক্ষকতা করেন, তখন আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন, বাংলা বিভাগে, এম এ ক্লাসে। অতএব অগ্রজস্থানীয় ব্যক্তি আমার ছাত্র হয়ে গেলেন।

শিক্ষক সমিতি-গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করে কামরুজ্জামান আমাকে যা বললেন, তার মর্মকথা এই যে, এই সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকদের কুক্ষিগত করে রাখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক নয়; শিক্ষকদের মধ্যে দলে ভারি স্কুল-শিক্ষকেরা— তাঁদের যথোচিত প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত; তিনি এতে থাকতে চান, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতির সভাপতি হিসেবে তাঁর যথাযোগ্য পদ লাভ করা উচিত; তার ওপর তিনি জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পর্ক যার সঙ্গে যেমনই থাক না কেন, তাঁর পদটি সম্মানজনক হতে হবে। আমাদের মধ্যে অনেকের ইচ্ছে ছিল, মল্লিক সাহেব সভাপতি হবেন, আমি হবো সাধারণ সম্পাদক এবং সহ-সভাপতিদের মধ্যে একজন হবেন কামরুজ্জামান। কিন্তু তিনি ওই পদ সন্তোষজনক বিবেচনা করলেন না। হয় তাঁকে সাধারণ সম্পাদক করতে হবে, নইলে কার্যকরী সভাপতি। আমাদের অনেকেরই মনে হলো, এ হচ্ছে বেসরকারি সংগঠনে সরকারি কর্তৃত্ববিস্তারের উদ্‌যোগ। সকলে আমাকে চাপ দিতে থাকলেন, তুমি কিন্তু সাধারণ সম্পাদক পদ ছাড়বে না।

এমনি সময়ে কামরুজ্জামানের মারফতই খবর এলো, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আমাকে দেখা করতে বলেছেন, দিনতারিখ স্থির করে। ড. মল্লিকের মনে হলো— অনিরুদ্ধ-অনিলেরও তাই— যে, কামরুজ্জামানকে শিক্ষক সমিতির সম্পাদক করতে বলবেন তিনি এবং তিনি বললে সে-কথা আমি ফেলতে পারবো না। মল্লিক সাহেব ঘোষণা করলেন : 'তোমার সঙ্গে আমিও প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাবো।'

পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করা এমনিতে অরুচিকর, তার ওপর বিদেশের মাটিতে নিরাশ্রয় অবস্থায় বসে যদি তা করতে হয় তাতে গ্লানির অন্ত থাকে না। ওদিকে তাজউদ্দীন আমাকে ডেকেছেন, মল্লিক সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে গেলে দুজনকেই অস্বস্তির মধ্যে ফেলা হবে। তবু শুভাকাঙ্ক্ষীরা নাছোড়।

এক সন্ধ্যায় কামরুজ্জামান আমাদের নিয়ে গেলেন বালিগঞ্জের এক বাড়িতে। একতলায় বেশ ভিড়, সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতেই দেখি, বারান্দায় বসে আছেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। তাঁর সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না। পরিচয় হতেই তিনি আমার শ্বশুরের কথা জিজ্ঞেস করলেন, আর জানতে চাইলেন, আনোয়ারুল কাদির (প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য, ময়মনসিংহের উকিল, এখন মরহুম) আমার আত্মীয় কিনা। বললাম, আমাদের দুজনের স্ত্রী বাল্যবান্ধবী, আত্মীয়ের অধিক। তাঁকে খুব বিষণ্ন মনে হওয়ায় আমি তাঁর পরিবারের খবর জানতে চাইলাম। তিনি কোনো পাকা খবর পাননি, শুধু জানেন, তাঁরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। ওই বাড়ির দোতলায় তখন সৈয়দ নজরুল থাকেন, তাজউদ্দীন থাকেন, বোধহয় মন্ত্রীদের আরো কেউ কেউ থাকেন। নিচের তলায় থাকেন অনেকে। যাঁদের হাতে দেশের ভাগ্য-নির্ধারণের ভার, ওই মুহূর্তে তাঁদের অবস্থা একেবারেই ঈর্ষণীয় ছিল না।

তাজউদ্দীনের সঙ্গে আমীরউল ইসলাম ছিল। মল্লিক সাহেব ও আমি ঘরে ঢুকলাম। মল্লিক সাহেব কলকাতায় এসেছিলেন সরকারের ডাকে, কিন্তু তাঁর

আসতে দেরি হয়েছিল। ততোদিনে তাজউদ্দীন কলকাতার বাইরে চলে যাওয়ায় তাঁদের দেখাও হয়নি, কাজটাও হয়নি। ড. মল্লিক সেই ব্যাখ্যা দিলেন। তারপর তাজউদ্দীন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তাঁর ইচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে আমি যোগ দিই। আমার হয়ে মল্লিক সাহেব জবাব দিলেন, শিক্ষক সমিতির কথা বললেন। তাজউদ্দীন বললেন, শিক্ষক সমিতির জন্যে কি আর কাউকে পাওয়া যাবে না? আমীর ও মল্লিক সাহেবকে বসিয়ে রেখে তিনি ভিতরের ঘরে আমাকে নিয়ে গেলেন। জানতে চাইলেন, 'সত্যিই আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন না?' আমি বললাম, 'সেই কবে থেকে আপনাকে খবর পাঠাচ্ছি, কোনো সাড়া পাইনি। এখন তো সমিতির ব্যাপারে কথা দিয়ে ফেলেছি। তবে আপনি যখন যে কাজে বলবেন, আমি করে দেবো।' তিনি বললেন, 'আপনার আসার খবর আমি আমীরউলের কাছে পাই। তারপর তো বাইরে চলে গেলাম। ফিরে এসেই আপনাকে খবর দিয়েছি।' 'তাহেরউদ্দিন ঠাকুর কিছু জানাননি?' 'না তো।' তারপর আর কোনো কথা না বলে তাজউদ্দীন বাইরে চলে এলেন। তিনি কিছু বলছেন না দেখে মল্লিক সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, 'শিক্ষক সমিতি দাঁড়িয়ে গেলে আনিসকে ছেড়ে দেবো— তখন আপনি ওকে কাজে লাগাবেন।' তাজউদ্দীনকে আমি জোহরা ভাবি এবং তাঁদের সন্তানদের কথা জিজ্ঞেস করলাম। উনি শুধু বললেন, 'নিশ্চিত কিছু জানি না।'

আমরা চলে এলাম। কামরুজ্জামানের কথা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একবারও বলেননি।

সেই রাতে মনে হয়েছিল, আমরা ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরছি। পরে কিন্তু আমার মনে হয়েছে, সেদিন আমি ভুল করেছিলাম। তাজউদ্দীনের কথামতোই আমার কাজ করা উচিত ছিল।

পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে বাংলাদেশ থেকে আসা শিক্ষকদের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো ২১ মে তারিখে। সভা আরম্ভ হওয়ার আগে কামরুজ্জামান বললেন, তাঁকে ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট করা না হলে তিনি সাধারণ সদস্যই থাকতে চান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির দৃষ্টান্ত ছিল সামনে— একক দায়িত্বে তাঁকে কার্যকরী সভাপতি করতে সম্মত হলাম। সহ-সভাপতি হলেন ফারুক খলিল ও অধ্যক্ষ দেওয়ান আহমদ। সহ-সম্পাদক : গোলাম মুরশিদ, রাসবিহারী ঘোষ ও এস এম আনোয়ারুজ্জামান (যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের প্রতিনিধি)। কোষাধ্যক্ষ : খান সারওয়ার মুরশিদ। সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দুজনেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হওয়ায় কিছু সমালোচনা শোনা গেলো সভার পরে। মল্লিক সাহেব সভার শেষে আমাকে বললেন, 'তুমি কি আমাকে অকার্যকরী সভাপতি হিসেবে দেখতে চাও?'

সমিতির কাজ হিসেবে স্থির হলো বাংলাদেশের অবস্থা ব্যাখ্যা করে বাংলা ও ইংরেজিতে পুস্তিকা প্রকাশ; এক্সটেনশন লেকচার দেওয়ার ব্যবস্থা; শরণার্থী শিবিরবাসী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেমেয়েদের জন্যে ক্যাম্প স্কুল স্থাপন; আর্কাইভস-গঠন; ভারতের সঙ্গে স্থায়ী কোনো প্রকল্প নেওয়া যায় কিনা, তা দেখা; শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের চেষ্টা করা এবং বস্তুগত সাহায্য করা। সব কাজে অবশ্য আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির ওপর নির্ভরশীল।

২৭ মে সকালে আমাদের বাসায় এসে হাজির সৈয়দ হাসান ইমাম। তিনি কাছেই থাকতেন তাঁর আত্মীয় খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ মনসুর হাবিবের বাসায়। আমাকে বললেন, 'চলেন। স্বাধীন বাংলা বেতার-কেন্দ্র আজ থেকে নতুন করে চালু হচ্ছে। আপনাকে কিছু বলতে হবে।' বালিগঞ্জে— আমার মনে হলো, যে বাড়িতে সৈয়দ নজরুল-তাজউদ্দীনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেই বাড়িতে— বেতার-অনুষ্ঠান রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা আর বেতারের সঙ্গে যুক্ত সকলের থাকার ব্যবস্থা। একটা টেপ রেকর্ডারের সামনে আমাকে বসিয়ে দেওয়া হলো। সেদিন ছিল ১১ জ্যৈষ্ঠ, সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে। আমি কোনো কাগজ না দেখে মুখে মুখে নজরুল সম্পর্কে কিছু বললাম, তার সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথাটা যুক্ত করে। দেশে রয়ে যাওয়া আত্মীয়স্বজনদের নিরাপত্তার কথা ভেবে অনেক ছদ্মনামে অনুষ্ঠান করতেন বেতারে। যেমন, সৈয়দ হাসান ইমাম নিয়েছিলেন সালেহ আহমদ নাম। আমি স্বনামেই অনুষ্ঠান করলাম। ততোদিনে বুঝে গেছি, মুক্তিযুদ্ধের কাজ করতে হলে ওই ঝুঁকি নিতে হবে। তবে সে-রাতে ঘরে ফিরে অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা বেবীকে বলিনি।

পরদিন সকালে রেডিওর কাঁটা ঘোরাতে ঘোরাতে সে কিন্তু পেয়ে গেলো স্বাধীন বাংলা বেতার-কেন্দ্র। আমি জানতাম না, অনুষ্ঠান সকালে পুনঃপ্রচারিত হবে। একটু পরে আমার গলাও ভেসে এলো। অনুষ্ঠান শেষ হলে বেবী আমাকে প্রশ্ন করলঃ 'তুমি যে প্রোগ্রাম করেছ, তা তো বলোনি।' আমি কোনো জবাব দিলাম না। মুহূর্তের জন্যে আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম মাত্র। সে কী ভাবছে, আমি কী ভাবছি, তা বোধহয় পরস্পরের কাছে অজানা রইল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০.

যেমন ভারতীয় বন্ধুরা, তেমনি বাংলাদেশের শরণার্থীরা, বেশির ভাগই কিছু না কিছু করতে চাইছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের জন্যে। নানা রকম ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্‌যোগে গড়ে উঠছিল নিত্য নতুন বেসরকারি সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গের এককালীন গভর্নর, সরোজিনী নাইডুর কন্যা, পদ্মজা নাইডুর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ এইড কমিটি। মৈত্রেয়ী দেবী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন— তাঁর সঙ্গে ছিলেন গৌরী আইয়ুব— সাম্প্রদায়িক মৈত্রী সমিতির এবং বাংলাদেশের দুস্থ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি শিশুভবন। পশ্চিমবঙ্গের লেখক-শিল্পীরাও একটা সহায়ক সংস্থা গঠন করেন। তার সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এর দপ্তর ছিল লেনিন সরণিতে *পরিচয়*-অফিসে। এলগিন রোডে নেতাজী-ভবনে স্থাপিত হয়েছিল ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কাউন্সিল ফর বাংলাদেশ। এর তিনজন সম্পাদক ছিলেন: শরৎচন্দ্র বসুর পুত্র বিশিষ্ট শিশু-চিকিৎসক ও নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর পরিচালক, ডা. শিশির বসু, আমাদের দিলীপকুমার চক্রবর্তী, আর বীণা ভৌমিক (পূর্বতন বীণা দাস- যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ডিগ্রি নিতে গিয়ে গভর্নর জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিলেন)। নেতাজী ভবনে জায়গা দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির আর্কাইভস কমিটিকে। এর পরিচালক ছিলেন সৈয়দ আলী আহ্‌সান এবং এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ড. সফর আলী আখন্দ, ড. মাহমুদ শাহ্ কোরেশী, শামসুল আলম (সাঈদ) ও মোহাম্মদ আবু জাফর। জামিল চৌধুরীর পরিচালনায় এখানেই গড়ে উঠেছিল তথ্যব্যাংক— মল্লিক সাহেবের দুই মেয়ে, এমি ও রানা, সেখানে প্রায় সর্বক্ষণ কাজ করতো। আমীরউল ইসলামের পরিচালনায় গঠিত হয় বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার কোর, এর উপ-পরিচালক ছিলেন শাহীন স্কুলের এককালীন অধ্যক্ষ মামুনুর রশীদ (বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি এই সংগঠনের পরিচালক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিলেন, পরে রহস্যজনক পরিস্থিতিতে সউদি আরবে মারা যান)। আমীরের কারণে এটি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিদেশী আনুকূল্য লাভ করেছিল। এঁদের হাতে ছিল ভারতীয় একটি জিপ গাড়ি, তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অনেকের ঈর্ষার কারণ।

আমাদের শিল্পী, সাহিত্যিক ও ক্রীড়াবিদেরাও একাধিক জোট বেঁধেছিলেন। মে মাসেই সন্‌জীদা খাতুনের সভাপতিত্বে এবং ওয়াহিদুল হকের পরিচালনায় গড়ে ওঠে বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা। শতাধিক শিল্পী ছিলেন এই সংগঠনে। এঁরা দায়িত্ব নিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধা-এবং শরণার্থী– শিবিরে সংগীত–পরিবেশনের। *মুক্তির গান* ছবিতে দেখা যায় মাহমুদুর রহমান বেনুর নেতৃত্বাধীন একটি স্কোয়াডের তৎপরতা। আরো স্কোয়াড গঠন করা হয়েছিল। আগস্ট মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অফ বাংলাদেশ-উপলক্ষে শিল্পী বাছাই করা হয়েছিল এই সংস্থা থেকে। বাংলাদেশের ফুটবল দল গড়ে তুলেছিলেন আমাদের খেলোয়াড়েরা এবং কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত একটি বিশেষ দলের সঙ্গে তাঁদের প্রীতি ম্যাচ খুব উপভোগ্য হয়েছিল। চিত্রশিল্পীরা আয়োজন করেছিলেন একটি চিত্রপ্রদর্শনীর এবং এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন কামরুল হাসান, দেবদাস চক্রবর্তী, মুস্তাফা মনোয়ার, নিতুন কুণ্ডু প্রমুখ শিল্পী। যেমন প্রত্যাশা করা গিয়েছিল, বেশির ভাগ ছবির বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। মুস্তাফা মনোয়ারের আঁকা ইয়াহিয়া খানের যে ছবিটি সেখানে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেটা এখন দেখতে পাবেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। ইয়াহিয়া–প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে মনে পড়ে কামরুল হাসানের সেই অনবদ্য পোস্টারটি : সেনাপতির বদন হয়ে গেছে রক্তলোলুপ হিংস্রজন্তুর মুখ, আর তার ওপরে–নিচে লেখা : ওরা মানুষ হত্যা করছে, আসুন আমরা জানোয়ার হত্যা করি। কামরুল হাসান যোগ দিয়েছিলেন সরকারের তথ্য দপ্তরে, নকশা বিভাগের পরিচালক হয়ে— ওই পোস্টার সরকারের তথ্য দপ্তর প্রচার করেছিলেন।

লেখকদের ঠিক আলাদা সংগঠন ছিল না। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ও বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অফ দি ইনটেলিজেনশিয়া মিলিয়েই তাঁরা ছিলেন। শেষদিকে ড. অজয় রায়ের সভাপতিত্বে ও আহমদ ছফার সম্পাদকতায় গঠিত বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংগ্রাম শিবিরেও অনেকে ছিলেন, তবে শিবিরের কর্মধারা সম্পর্কে আমি তেমন কিছু জানতাম না। চিত্তরঞ্জন সাহার অনুরোধে মে মাসের শেষে পাম অ্যাভিনিউতে ব্যারিস্টার আবদুস সালামের বাসভবনে বাংলাদেশের লেখকদের এক সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলাম। ব্যারিস্টার সালামের বাসায় সৈয়দ আলী আহসান এসে উঠেছিলেন আগরতলা থেকে এবং তাঁর পরিবার–পরিজন না আসা পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। ও–বাড়িতে আরো ছিলেন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও সাদেক খান। কেন জানি না সেখানেই সভা

আহূত হয়েছিল, কলকাতায় উপস্থিত আমাদের অনেক লেখকই তাতে যোগ দিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন সাহা বলেছিলেন যে, তিনি বাংলাদেশের লেখকদের একটা সংগঠন গড়ে তুলতে আগ্রহী ; এর নাম হবে স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ্। এই সংগঠনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকবে মুক্তধারা নামে প্রকাশনা সংস্থা; সেই সংস্থা থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ–সংক্রান্ত এবং বাংলাদেশের লেখকদের রচিত বই প্রকাশিত হবে। এর আর্থিক দায়দায়িত্ব তিনিই বহন করবেন। সাহিত্যে পরিষদের ব্যাপারে উপস্থিত ব্যক্তিদের খুব আগ্রহ দেখা দেয়নি, তবে প্রকাশনার ব্যাপারে সকলেই চিত্তবাবুকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। ওই সভায় বসেই ঠিক হয় যে, মুক্তধারার প্রথম বই হবে *রক্তাক্ত বাংলা* নামে একটি সংকলন— তাতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বাংলাদেশের বিভিন্ন লেখকের রচনা সংকলিত হবে। পরে চিত্তরঞ্জন সাহা আমাকে বইটির সম্পাদক হতে বলেছিলেন। কিন্তু কথাটা প্রথমদিনে না ওঠায় এবং অন্যবিধ ব্যস্ততার কারণে আমি সম্মত হইনি। অচ্যুতানন্দ সাহা অনামে বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন এবং রঞ্জন ছদ্মনামের আড়ালে তিনিই এর সম্পাদনা করেছিলেন। মুক্তধারা আমার *মুসলিম–মানস ও বাংলা সাহিত্য* পুনর্মুদ্রণ করেছিল। আমি বইয়ের কোনো কপি সঙ্গে নিয়ে যাইনি। প্রণবরঞ্জন রায় সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন নীহাররঞ্জন রায়কে আমার উপহার দেওয়া কপিটি। বই ছাপার শেষ পর্যায়ে প্রকাশক বললেন, নীহাররঞ্জন রায়ের একটা ভূমিকা থাকলে ভালো হতো। তার আগে ওঁর সঙ্গে আমার দিল্লিতে দেখা হয়েছে, অথচ ভূমিকা লেখার কথা কিছু বলিনি। কী আর করা? দিল্লির ঠিকানায় নীহাররঞ্জন রায়কে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানালাম। ওঁর অতো ব্যস্ততার মধ্যেও কয়েকদিনের মধ্যে নতুন সংস্করণের ভূমিকা লিখে দিলেন। মুক্তধারা থেকে আরো কয়েকটি বই বেরিয়েছিল। আবদুল গাফফার চৌধুরী–সম্পাদিত বাংলাদেশের ছোটগল্প-সংকলন *বাংলাদেশ কথা কয়* তার মধ্যে একটি। আমাদের স্বাধীনতালাভের পরে দেখেছিলাম, ওই বইয়ের আখ্যাপত্রে 'বাংলাদেশ কথা কয়' শব্দগুলোর নিচে কে যেন কালিকলমে লিখে রেখেছে 'কাজ করে না'।

পূর্ব পাকিস্তানের একটি সংগঠন কাগজপত্রে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল, তা হলো শান্তি পরিষদ। আসলে বিশ্ব শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল বুদাপেস্তে। বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের সরকার মনে করেছিলেন, এই আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের বিষয়টি উত্থাপিত হওয়া উচিত। তাই আবদুস সামাদ আজাদকে (মুক্তিযুদ্ধের সময়ে খানিকটা ছদ্মনামের মতো নামের শেষাংশ তিনি যোগ করেন) দলপতি ও ডা. সারোয়ার আলীকে সদস্য করে বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের একটি প্রতিনিধিদল সেখানে পাঠানো হয়। পাকিস্তানের আপত্তি এবং সংগঠকদের দুশ্চিন্তার মধ্যেও আমাদের প্রতিনিধিরা নিজেদের কথা বলার সুযোগ পান এবং বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি সম্মেলনের নৈতিক সমর্থন লাভ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সেই ছিল বাংলাদেশের প্রথম সমর্থনলাভের ঘটনা।

ওই সম্মেলন-উপলক্ষে আয়োজিত এক ভোজসভায় নৈশভোজোত্তর যে ভাষণ দিয়েছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা ডি পি ধর, তার বর্ণনা শুনেছিলাম সারোয়ার আলীর মুখে। তার মর্ম উদ্‌ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। ডি পি বলেছিলেন :

বিদেশে ভারতীয়দের নেমন্তন্ন করলে নিমন্ত্রণকর্তা প্রায়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হন, কেননা কে নিরামিষাশী, কে আমিষাশী, আবার কে কেমন নিরামিশভোজী, তা নির্ণয় করা সহজ নয়। এই নানা রুচির লোকের বর্ণনার জন্যে নানারকম শব্দও ব্যবহার করা হয়। এক ছোট্ট মেয়ে সে-ধরনের কিছু শব্দের অর্থ যাচাই করে নিচ্ছিল তার বাবার কাছ থেকে। তার প্রথম প্রশ্ন : 'ভেজিটারিয়ান কী?' বাবার উত্তর : 'যে কেবল তরকারি খায়, আমিষ ছোঁয় না।' 'এগিটারিয়ান?' 'যে তরকারি খায়, ডিমও খায়, কিন্তু মাছমাংস খায় না।' মেয়েটি একটু থেমে জিজ্ঞেস করল : 'আর হিউম্যানিটারিয়ান?' বাবা একটু ভেবে উত্তর দিল : 'ইয়াহিয়া খান।'

কলকাতার কথায় ফিরে আসি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির কাজ চলছিল পুরোদমে। আগেই বলেছি, দিলীপকুমার চক্রবর্তী ছিলেন এর প্রাণপুরুষ। যেমন তাঁর জীবনীশক্তি তেমনি জনসংযোগ, যেমন উৎসাহ তেমনি সাংগঠনিক দক্ষতা। তিনি করতেন সোশ্যালিস্ট পার্টির রাজনীতি, পরে জনতা পার্টি যেবারে কংগ্রেসকে হারিয়ে দেয়, সেবারে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুস্থানীয় আরো কজন অধ্যাপক সক্রিয় ছিলেন সমিতিতে। একজন জ্ঞানেশ পত্রনবীশ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এসসি ক্লাসের ছাত্রাবস্থায় ১৯৪৯ সালে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটে উস্‌কানিদানের অপরাধে জগন্নাথ হল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। একই অপরাধে শেখ মুজিবের জরিমানা হয়েছিল পনেরো টাকা। এই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি হাসতে হাসতে বলতেন, 'অন্তত ৪৯ সালে আমি মুজিবের চেয়ে বড়ো নেতা ছিলাম— তা বোঝা যাচ্ছে।' অপরজন ছিলেন সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য— তাঁর দল ছিল রেভোলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি বা আর এস পি। অফিসের কাজে নিয়মিত সাহায্য করতেন পি ডি সেনশর্মা— তিনি ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে এম এসসি পাশ করেছিলেন উদ্ভিদবিজ্ঞানে। তখন কলেজে পড়ান এবং ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের ক্যাপ্টেন। যতীন চট্টোপাধ্যায়ের কথা আগে বলেছি, মধ্যে মধ্যে আসতেন সন্দীপ দাস— তিনিও সোশ্যালিস্ট। নানা কাজে অংশ নিতেন শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের সদস্যা ও যোধপুর সার্ক গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা মৃন্ময়ী বসু। সমিতির কাজে ইলা মিত্র তেমন সময় দিতে পারতেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সহায়ক সমিতির অফিসে কমই আসতেন, তবে নিজের নিজের মতো সাহায্য করতেন। এঁদের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের বেলা দাশগুপ্তা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বঙ্গেন্দু গাঙ্গুলির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। বঙ্গেন্দু গাঙ্গুলি ও মীরা গাঙ্গুলির *বাংলাদেশ— দি ট্রুথ* ছিল সহায়ক সমিতির প্রথম প্রকাশনা। পরে সমিতি তাঁদের সম্পাদিত আরো একটি বই প্রকাশ করে : *বাংলাদেশ— থ্রোজ অফ এ নিউ লাইফ*। সহায়ক সমিতি এডওয়ার্ড মেসন, রবার্ট ডফম্যান ও স্টিফেন মারগলিনের *কনফ্লিক্ট ইন ইস্ট পাকিস্তান* পুস্তিকা-আকারে বের করেছিলেন। দুটি ছবির অ্যালবামও প্রকাশ করেছিলেন : *বাংলাদেশ থ্রু দি লেনস্* ও *ব্লিডিং বাংলাদেশ*। যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা করেছিলেন *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ*। ছয় দফা-কর্মসূচি এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণও পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন সমিতি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দুজন শিক্ষক সবসময়েই সহায়ক সমিতির অফিসে আসতেন, তাঁরা অনিল সরকার ও অনিরুদ্ধ রায়। হাজরা রোডে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্র-হস্টেল ছিল, অনিল ছিল তার সুপারিনটেনডেন্ট। ওই হস্টেলে সে বহু আশ্রয়হীন শিক্ষককে জায়গা দিয়েছিল। সেখানে স্থান-সংকুলান না হওয়ায় সুপারের কোয়ার্টারে তাদের তুলতে শুরু করেছিল। আমার মনে পড়ে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ড. আবু সালেহ যখন আশ্রয়প্রার্থীরূপে সহায়ক সমিতির অফিসে পৌঁছোন, তখন তাঁর কাছে নিজের পিএইচ ডি থিসিস ও কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছু ছিল না। অনিল তাঁকে নিজের কোয়ার্টারে স্থান দিয়েছিল। অনিলের স্ত্রী, ভারত সরকারের চাকুরে, মীরানন্দিতা সরকারকে আমি বলতাম, 'আমাদের হয়ে লড়ে যাচ্ছে দুই সরকার— ভারত সরকার আর অনিল সরকার।' অনিরুদ্ধ আমাদের কাজে এতো সময় দিতো যে, একবার এক ভদ্রমহিলা তার স্ত্রী ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'অরুর সঙ্গে তোমার শিগগির দেখা হবে?' ইন্দ্রাণী কিছু বলার আগে তৃতীয় একজন বলেছিলেন প্রশ্নকর্তীকে, 'কেন, অনিরুদ্ধ যে ইন্দ্রাণীর স্বামী, তা বুঝি তুমি জানো না?' প্রথমা বললেন, 'তা জানি, কিন্তু বাংলাদেশ নিয়ে সে যেরকম ব্যস্ত, তাতে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা হয় কিনা, কে জানে!' আমাদের সঙ্গে এতো মাখামাখি পছন্দ হয়নি অনিরুদ্ধের ঠাকুরমার। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাঁরা পাবনা ছেড়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যা শুনেছিলেন, তাতে মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর ভালো ধারণা ছিল না। ১৯৭১এ অনিরুদ্ধের মেয়ে দীয়ার যখন জন্ম হলো—মেয়ে হওয়ায়ও তিনি একটু অপ্রসন্ন ছিলেন—তখন তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন : মুসলমানে নিয়ে যাবে।

সহায়ক সমিতির অফিসই ছিল বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির অফিস। আমি রোজ যেতাম সকালে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে থেকে কিংবা বিকেলে সেখান থেকে বেরিয়ে অন্য কোনো কাজ সেরে ফিরতাম রাতে। ফুপুর বাড়িতে রাতে রুটি খাওয়া হতো, তাই ওই কমাস রোববার ছাড়া ভাত খাওয়ার সুযোগ পাইনি—তাতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি। যুগ্ম-সম্পাদক গোলাম মুরশিদকে কখনো আমাদের কাজে পাই নি, তবে আনোয়ারুজ্জামান প্রায় আসতেন। রাসবিহারী ঘোষ ছাড়া

নিয়মিত আসতো নিত্যগোপাল সাহা আর সুকুমার বিশ্বাস। স্বাধীনতার পরে রাসবিহারী জগন্নাথ কলেজে প্রাণিবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিল, তারপর কোথায় যে হারিয়ে গেল, কে জানে! নিত্য বাংলা একাডেমীতে, সুকুমার পিএইচ ডি করে সুপ্রতিষ্ঠিত—বাংলা একাডেমীর সহপরিচালক। মল্লিক সাহেব অফিসে বেশি আসতেন না, কাজেকর্মে আমাকেই যেতে হতো তাঁর বাসস্থানে। আগরতলা থেকে পরিবার আসার পরে পার্ক স্ট্রিট ছেড়ে তিনি কিছুদিন ছিলেন আলিপুরে, অরূপ চৌধুরীর বাড়িতে। একদিন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি তৈরি থাকি সকাল ছটায়, তুমি আসো সাড়ে নটা-দশটায়। এতো সময় নষ্ট হলে কাজ হবে কী করে?' ভাবি হেসে বললেন, 'তাহলে তো আনিসুজ্জামানকে এ বাসায়ই থাকতে হয়।' পরে কমল ঘোষ-ছায়া ঘোষ তাঁদের জন্যে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়ার ব্যবস্থা করেন সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউতে। সেটা ছিল আমার বাসস্থানের অনেকটা কাছে। মল্লিক সাহেব তারপর থেকে প্রায়ই বলতেন, আমি যেন পরিবার নিয়ে তাঁর বাসায় কয়েকদিন কাটিয়ে আসি। যাবো-যাবো করে যেদিন গেলাম— মুক্তিযুদ্ধ তখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে— সেদিন দেখি, তাঁর শ্যালিকাপুত্র ক্যাপ্টেন ফারুক অ্যাডভেঞ্চার করে পাকিস্তানিদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবে বলে এবং বাড়তি ঘরটা তার অধিকারে। আমরা যেতে ফারুককে ঘর ছেড়ে দিয়ে ড্রয়িং রুমে বিছানা পাততে হলো। এই ফারুকই বঙ্গবন্ধুর খুনীদের একজন। একটা কাকতালীয় যোগ এই যে, ফারুক বাহিনীর হাতে নিহত শেখ কামালকেও আমি প্রথম দেখি ড. মল্লিকের সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউর এই বাড়িতেই। সে তখন প্রধান সেনাপতির এডিসি।

শিক্ষক সমিতি থেকে মল্লিক সাহেবের স্বাক্ষরে চিঠি গিয়েছিল বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে— বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং শরণার্থী শিক্ষকদের বিষয়ে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে। ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের ভারতীয় জাতীয় কমিটির নির্বাহী সম্পাদক ডি এন তিয়াগরাজনকে আমি চিঠি লিখি দিল্লিতে, তিনি আমাকে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন নিউইয়র্কে, ডব্লিউ ইউ এসের সদর দপ্তরে, কে বি রাওয়ের সঙ্গে। বিদেশে আর যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করি, তার মধ্যে একজন ছিলেন অ্যামেরিকানস ফর ইস্ট পাকিস্তান রিফিউজিজের (অ্যান অক্সফ্যাম অ্যামেরিকান ফান্ড) কো-চেয়ারম্যান নিউইয়র্কবাসী জামশেদ আর খান। ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মৃন্ময় ভট্টাচার্য প্রাগে শিক্ষকদের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আর পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকদের ১৬টি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির স্বপ্না দেবও (পরে *প্রতিক্ষণ* পত্রিকার সম্পাদক) কিছু প্রয়োজনীয় যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছিলেন আর এই অবস্থায়ও সাক্ষরতা-অভিযানের ব্যাপারে পরামর্শ ছাড়া সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। শিক্ষক সমিতি, বিশেষ করে স্কুল

ও কলেজ শিক্ষকদের সমিতিগুলো, প্রায়ই ভারতীয় রাজনীতির ধারায় বিভক্ত ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদের মনোভাব নির্ণীত হয়েছিল অনেক পরিমাণে তাদের মূল রাজনৈতিক দলের ভূমিকার দ্বারা। আমার মনে পড়ে, সি পি আই (এম)–সমর্থিত অল বেঙ্গল প্রাইমারি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের (আশা করি, অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন নয়) অফিসে, আগে থেকে যোগাযোগ করে, গিয়ে অত্যন্ত শীতল অভ্যর্থনা পেয়ে ফিরে এসেছিলাম। তাঁরা আমার কথা শুনেছিলেন, তারপর বলেছিলেন যে, বিষয়টি নিয়ে সংগঠনে আলোচনা করে তার ফল আমাকে জানাবেন, কিন্তু কখনো আর যোগাযোগ করেননি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নকশালপন্থীদের মনোভাব ছিল স্পষ্টত বিরুদ্ধ। আমরা যেদিন আগরতলা থেকে কলকাতা এসে পৌঁছোই, সেদিন রাতে নাকি তাঁদের উদ্‌যোগে কলকাতার কোনো ছাত্রাবাসে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। অন্তত সংবাদপত্রে সেরকম খবরই বেরিয়েছিল।

সহায়ক সমিতি থেকে পুস্তিকা প্রকাশে আমরা সাহায্য করেছিলাম। ওসমান জামাল লিখেছিলেন *পাকিস্তানিজম অ্যান্ড বেঙ্গলি কালচার*, তার ভূমিকা লিখি আমি— যদিও তার প্রয়োজন ছিল না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আসাদুজ্জামান লেখেন *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ* এবং যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুকুমার বিশ্বাস সম্পাদনা করেন *মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি*। *বাংলাদেশ : দি ব্যাকগ্রাউন্ড* নামে আবদুল হালিমও একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন আমার সঙ্গে পরামর্শ করে, কিন্তু তার বক্তব্য নিয়ে কারো মনে খটকা লাগায় ওটা আর সহায়ক সমিতি থেকে বেরোতে পারেনি। মৃন্ময় ভট্টাচার্য আমাকে উদ্ধার করেছিলেন তাঁদের সংগঠন থেকে সেটা প্রকাশ করে। যুব ক্যাম্পে নিয়োগদানের জন্যে কিংবা শরণার্থী শিবিরে শিক্ষকতার জন্যে নাম বাছাই করে পাঠাই বাংলাদেশ সরকারের কাছে। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নাম— যদি কোথাও তাঁদের নিয়োগ হতে পারে। চাকরি পেয়ে গেলেন কজন : ড. এ এ জিয়াউদ্‌দীন আহমদ (মল্লিক সাহেবের বড়ো জামাতা, স্পার্সো থেকে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত)— হিমাচল প্রদেশ ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর পোস্টগ্রাজুয়েট স্টাডিজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে; ড. শামসুল হক পাতিয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগে যোগ দিলেন শহিদুল ইসলাম; সুব্রত মজুমদার কাজ পেলেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটে। হয়তো আরো কেউ কেউ পেয়ে থাকবেন— ঠিক স্মরণ নেই। আরবিতে একটা প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রির জোরে ফেরদৌসী মজুমদার চাকরি পেয়ে গেল জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর ওয়েস্ট এশিয়ান স্টাডিজে— একেবারেই বিজ্ঞাপনের জবাবে আবেদন করে, আমাদের কোনো ভূমিকা ছাড়াই। কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের কেউ কেউ কাজ পেলেন যুব শিবিরে, শরণার্থী শিবিরে। কিন্তু সে আর কয়জন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক দুর্দশাগ্রস্ত শিক্ষক প্রতিদিনই আসতে থাকেন। কাউকে কাউকে সামান্য যে টাকা হাতে তুলে দেই, তাতে নিজেরই লজ্জা লাগে। শুধু শিক্ষক নন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেরানি আসেন, টাইপিস্ট আসেন। তাঁদের ধারণা, আমরা একটু চেষ্টা করলে হয়ে যাবে। ভারত এতো বড়ো দেশ, এখানে কি কাজের অন্ত আছে! তার ওপরে রয়েছে বাংলাদেশ সরকার— তাদের তো সবরকম লোক চাই।

আমরা পরিকল্পনা বানাই— দুই সরকারের লোকজনকেই ধরাধরি করি। আমাদের নানা রকম পরিকল্পনায়— প্রায়োগিক ও বিদ্যায়তনিক— সাহায্য করতে আসেন অনেকে— বরুণ দের মতো ইতিহাসবিদ, অমিয় বাগচীর মতো অর্থনীতিবিদ (তাঁর স্ত্রী ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপিকা যশোধারা বাগচীও খুব সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন)। বরুণ দে এক সন্ধ্যায় ড. মল্লিক ও আমাকে নিয়ে গেলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বাসায়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল, তবু অপেক্ষা করতে হলো। টকটকে লাল হাওয়াই শার্ট এবং শর্ট শর্ট পরে সুদর্শন সিদ্ধার্থ দেখা দিলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই জিজ্ঞেস করলেন : 'শাজাহানের খবর কী?' মল্লিক সাহেবের জানা ছিল না, তবে আমি জানতাম, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ডাকনাম শাহজাহান। সুতরাং জবাবটা আমিই দিলাম : বিচারপতি চৌধুরী লন্ডনে আছেন, বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করছেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর বললেন, ওঁরা একসঙ্গে ব্যারিস্টারি পড়েছেন এবং সেইসূত্রে প্রীতির বন্ধন আছে ওঁদের। আমাদের যা বলার ছিল, বললাম। সিদ্ধার্থশঙ্কর হঠাৎ করে মল্লিক সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন : 'আপনার কী মনে হয়, মুক্তিযুদ্ধ সফল হতে কতোদিন লাগতে পারে?' মল্লিক সাহেব বললেন, 'এ বছরেই আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে যাবো।' এবারে গৃহকর্তার চমকাবার পালা : 'বলেন কী!' মল্লিক সাহেব তখন আরেকটু জোর দিয়ে বললেন : 'আই ইনভাইট ইউ অ্যাট দি নেক্সট ক্রিসমাস পার্টি অ্যাট দি ভাইস চ্যান্সেলর'স রেসিডেন্স ইন চিটাগাং।' সিদ্ধার্থশঙ্করও দমবার লোক নন : 'আই শ্যাল বি গ্ল্যাড টু অ্যাটেন্ড।' আমি কিন্তু দমে গেলাম। মনে হলো মল্লিক সাহেব বেশি বললেন, অনাবশ্যক ও অনুচিত আশা জাগালেন— আশাভঙ্গের বেদনা আমাদের সবাইকে বহন করতে হবে এবং তখন আশ্রয়দাতাদের কাছে আমাদের মাথা নত হবে।

তখন আমার নিজের কী ধারণা ছিল, তা বলি। মে মাসেই অনিরুদ্ধ একদিন আমাকে নিয়ে গেল ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে (এখন মীর্জা গালিব স্ট্রিট) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য বিভাগের দপ্তরে। সেখানে তার বন্ধু ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সদস্য অশোক ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। এক পর্যায়ে অশোক এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার ঘরে অনিরুদ্ধ ও আমাকে নিয়ে গেলেন। সে ভদ্রলোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথায় কথায় জানতে চাইলেন, কতদিনে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারবে বলে আমি আশা করি। আমি বললাম, তিন থেকে পাঁচ বছর। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এতদিন সাসটেন করতে পারবেন?' আমি বললাম, 'করতেই হবে। আমাদের কোনো বিকল্প পথ নেই।' শরণার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধিজনিত চাপ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের বিষয়টি তখনো হিসেবে নেওয়ার মতো অবস্থা হয়নি— অন্তত আমার কাছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১.

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের অপরিসর স্থান থেকে বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তর উঠে এলো ৮ থিয়েটার রোডে একটা দোতলা বাড়িতে। বাড়িটা নাকি এককালে ছিল খাজা নাজিমউদ্দীনের। বাড়ির মালিকানা যেমন বদলেছে, রাস্তারও নাম বদলে তেমনি হয়েছে শেকসপিয়র সরণি। বড়ো বাড়ি এবং সুপরিসর আঙিনা, তবু একটা সরকারের— তা প্রবাসী সরকার হলেও— স্থানসংকুলানের জন্যে যথেষ্ট নয়। ওপরতলায় ছিল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দপ্তর, অর্থমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও বসতেন ওপরে। নিচে অনতিপরিসর এক ঘরে প্রধানমন্ত্রী বসতেন, তার পেছনে একটা বড়ো ঘরে তিনি থাকতেন, খেতেন এবং প্রয়োজনে গোপনীয় কথাবার্তা বলতেন। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তাজউদ্দীন আহমদ পরিবারের সঙ্গে থাকেননি। শয়নকক্ষের সংলগ্ন বাথরুমে নিজের কাপড় তিনি নিজের হাতেই ধুতেন। প্রধানমন্ত্রীর অফিসে গোপনীয় কথাবার্তা বলা অসাধ্য না হলেও ছিল দুঃসাধ্য। বিএসএফের পাহারা পেরিয়ে—এই পেরোনো নিয়েও মাঝে মাঝে গোলযোগ হতো—যাঁরাই বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করতে সমর্থ হতেন, তাঁরাই মনে করতেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তাঁর নাগরিক অধিকার এবং তাঁর নিজস্ব সমস্যা শোনা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে অবশ্যকর্তব্য। প্রধানমন্ত্রীর দুই ব্যক্তিগত সচিব, ড. ফারুক আজিজ খান (স্পার্সোর চেয়ারম্যান হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত ও *স্প্রিং ১৯৭১*-এর লেখক) ও মতিউর রহমান ওরফে সেকেন্দার (শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর থেকে অবসরপ্রাপ্ত) সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সামাল দিতে হিমশিম খেয়ে যেতেন। ভারতের মাটিতে যারা পা দিয়েছে, তারা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। অতএব, জয় বাংলা, প্রধানমন্ত্রীকে যে আমলারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবেন, তা হতে দেওয়া যাবে না। ওই নিচের তলার আরেক অংশে ছিল প্রধান সেনাপতি কর্নেল মহম্মদ আতাউল গণী ওসমানীর দপ্তর এবং সংলগ্ন শয়নকক্ষ। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সংস্থাপন বিভাগের দপ্তরও ছিল নিচতলায়।

প্রশাসন ছিল রাজনীতিবিদ ও আমলাদের মিলিয়ে মিশিয়ে। যেমন, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কয়েকজন উপদেষ্টা ছিলেন জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে। তাঁদের মধ্যে আমার পূর্বপরিচিত সৈয়দ আবদুস সুলতান (পরে লন্ডনে বাংলাদেশের হাই কমিশনার) এবং ঢাকার প্রিয়নাথ হাই স্কুলে স্বল্পকালের জন্যে আমার শিক্ষক (পরে মন্ত্রী) কোরবান আলীর কথা মনে পড়ে। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন ব্যারিস্টার আমীরউল ইসলাম, তবে তাঁর একজন বেসরকারি রাজনৈতিক উপদেষ্টাও ছিলেন—তিনি মঈদুল হাসান, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফফর) রাজনীতি করলেও তাজউদ্দীনের খুব আস্থাভাজন ছিলেন। ভারত সরকারের ওপর মহলে তাঁর ভালো যোগাযোগ ছিল। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে তাজউদ্দীনের ভূমিকা সম্পর্কে, প্রামাণ্য গ্রন্থ *মূলধারা '৭১* লিখে মঈদুল হাসান খ্যাতি অর্জন করেছেন।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সচিব ছিলেন কাজী লুৎফুল হক। মন্ত্রিপরিষদ–সচিব এইচ টি ইমাম, সংস্থাপন–সচিব নূরুল কাদের (২৬ মার্চ থেকে তিনি খান পদবি বর্জন করেছিলেন), প্রতিরক্ষা–সচিব আবদুস সামাদ এবং অনেক পরে নিযুক্ত তথ্য–সচিব আনোয়ারুল হক খান সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে দায়ী ছিলেন, তবে তথ্য ও বেতার বিভাগ সামগ্রিকভাবে দেখতেন জাতীয় পরিষদ–সদস্য আবদুল মান্নান (পরে মন্ত্রী)। বাংলাদেশ সরকারের মুখপত্র *জয় বাংলা* বের হতো ওই বিভাগ থেকে। এই সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আবদুল গাফফার চৌধুরী, তবে জাতীয় পরিষদের কয়েকজন সদস্য নিয়ে এরও একটি উপদেষ্টামণ্ডলী ছিল, যদিও সব উপদেষ্টা সক্রিয়ভাবে পত্রিকা-প্রকাশে অংশ নেননি। প্রধানমন্ত্রীর সামরিক লিয়াজোঁ অফিসার ছিলেন মেজর নূরুল ইসলাম ওরফে শিশু। অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর হাতে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ও ছিল। খন্দকার আসাদুজ্জামান ছিলেন অর্থসচিব এবং রাজনীতিবিদ মোস্তফা সারওয়ার বাণিজ্য–সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান একই সঙ্গে কৃষি এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। স্বরাষ্ট্র–সচিব ছিলেন পুলিশ সার্ভিসের আবদুল খালেক, কৃষি-সচিব নূরুদ্দীন আহমদ (তাঁর স্ত্রী বেগম বদরুননেসা জাতীয় পরিষদ-সদস্য ছিলেন এবং পরে মন্ত্রী হয়েছিলেন)। ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের গড়নটা ছিল ভিন্ন। সেখানে কোনো সচিব ছিলেন না। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর নেতৃত্বে জাতীয় পরিষদের চার–পাঁচজন সদস্য ছিলেন ওপর দিকে, আমলাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ত্রাণ কমিশনার জয়গোবিন্দ ভৌমিক এবং তার পরে উপ–সচিব মামুনুর রশীদ। ডা. টি হোসেন ছিলেন স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ-সচিব, এই মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কে ছিলেন জানি না, হয়তো প্রধানমন্ত্রী নিজেই।

পররাষ্ট্র দপ্তর ছিল ৯ সার্কাস অ্যাভিনিউতে। বাড়িটা আদতে ছিল পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশনের অফিস। ১৮ এপ্রিলে ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলী,

পাঁচজন কর্মকর্তা ও ৬৫ জন কর্মচারী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করার পরে ওটি হয়ে ওঠে বাংলাদেশ মিশন। কলকাতায়—বোধহয় সারা ভারতেই—তখন এই একটি ভবনের শীর্ষদেশেই বাংলাদেশের পতাকা উড়তো। হোসেন আলী ও তাঁর সহকর্মীদের বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন ছিল একটি বড়ো ঘটনা। পাকিস্তান-সরকার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লিতে নিযুক্ত পাকিস্তান হাই কমিশনের মারফত ভারত সরকারের কাছে বাড়িটা ফেরত চেয়ে পাঠান এবং মেহদী মাসুদকে কলকাতায় ডেপুটি কমিশনার হিসেবে নিয়োগদান করেন। মেহদী মাসুদ সশরীরে কলকাতায় উপস্থিত হলেও বাড়ি ফিরে পাননি। তবে, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আমাদের বলেছিলেন যে, কলকাতার মুসলমান সমাজকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে মেহদী মাসুদ সমর্থ হন। উল্লেখযোগ্য যে, ৬ এপ্রিলে দিল্লিতে পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব কে এম শাহাবুদ্দীন এবং সহকারী প্রেস অ্যাটাশে—আমার সহপাঠী—আমজাদুল হক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সর্বাগ্রে আনুগত্য ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ মিশনের দোতলায় ছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দপ্তর। সেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মুশতাক আহমদ এবং পররাষ্ট্র-সচিব মাহবুবুল আলম চাষী বসতেন। আইন ও সংসদীয় মন্ত্রণালয়ও ছিল মুশতাকের অধীনে, তবে তাঁর সচিব আবদুল হান্নান চৌধুরী বেশির ভাগ সময়ে নদিয়ার দিকে যুদ্ধের ফ্রন্টে থাকতেন। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ কী করে যেন বাংলাদেশ মিশনেই জায়গা করে নিয়েছিলেন এবং কিছু কিছু লেখালিখির কাজে নিজেকে জড়িত করেছিলেন। জুলাই মাসে যখন বাংলাদেশের ডাকটিকিট বের হলো, তখন পোস্টমাস্টার জেনারেলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। প্রথম আটটি ডাকটিকিটের নকশা করেছিলেন বিমান মল্লিক নামে একজন ভারতীয় শিল্পী (সেজন্যে ইংরেজিতে বাংলাদেশ শব্দটি ভেঙে লেখা হয়েছিল বাংলা দেশ—অধিকাংশ ভারতীয় এইভাবেই লিখতেন), আর টিকিট ছাপবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ব্রিটিশ এম পি জন স্টোনহাউজ—মওদুদের দৌত্যে। টিকিট ছাপা হয়েছিল ইংল্যান্ডে, তবে এ নিয়ে পরবর্তীকালে নানা অপ্রীতিকর কথা উঠেছিল।

বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যাঁরা যোগাযোগ করতে চাইতেন, তাঁদের অধিকাংশকেই বাংলাদেশ মিশনে যেতে বলা হতো। অনেক বিদেশী অতিথিকেও নিয়ে আসা হতো এখানে। শুধু বিশেষ ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো জায়গায় প্রধানমন্ত্রী কিংবা কোনো মন্ত্রী অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতেন। বাংলাদেশ লিবারেশন কাউনসিল অফ দি ইনটেলিজেনসিয়ার অফিসের ঠিকানাও ছিল এটা। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সকলে অবশ্য সরাসরি থিয়েটার রোডেই যেতেন। ব্রিগেডিয়ার (পরে মেজর জেনারেল, এখন অবসরজীবনে কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউটে বিদেশী ভাষাশিক্ষা-কর্মসূচির প্রধান) বি এন সরকার এবং বি এস এফের (মূলত ভারতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলিশ সার্ভিসের) কর্মকর্তা শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এখানেই আমার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে যায়।

থিয়েটার রোড থেকে সার্কাস অ্যাভিনিউর দূরত্ব যে আসলে বাংলাদেশ সরকারের বাকি অংশের সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দূরত্বের প্রতীক, সেকথা পরে মনে হয়েছিল। তার জন্যে ১৯৭৫ সালের আগস্ট বা নভেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি, ১৯৭১ সালের আগস্টেই তা বোঝা গিয়েছিল। সে কথা যথাস্থানে বলবো।

থিয়েটার রোডে যাওয়ার প্রথম সুযোগেই আমি তাজউদ্দীনকে নিজের আগরতলার অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলাম, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যে ছাত্রলীগ ছাড়া অন্য দলের ছেলেদের নেওয়া হচ্ছে না, সেকথা জানিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আওয়ামী লীগের যেসব নেতাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি, বিষয়টা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বেরিয়ে প্রথম দেখা পেলাম মোহাম্মদ ইলিয়াসের। এককালে তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম সাধারণ সম্পাদক, গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। ছাত্রজীবনের শেষে তিনি সিলেট অঞ্চলে—তাঁর নিজের এলাকায়—চলে যান এবং চা-বাগানের শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং দলের মনোনয়ন পেয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ইলিয়াসের কাছে কথাটা পাড়তেই তিনি জানতে চাইলেন, 'তোমাকে লাল মিয়ারা [অর্থাৎ কমিউনিস্টরা] পাঠিয়েছে নাকি?' যখন বললাম, আমি কারো কথায় আসিনি, নিজের থেকেই কথাটা বলছি, তখন তিনি বললেন, 'ওদেরকে নেবে কেন? যারা বলেছে ছয় দফা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইঙ্গিতে রচিত, যারা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি, বিরুদ্ধ প্রচার করেছে সর্বশক্তি দিয়ে, তাদের আমরা নিতে যাবো কেন?' ইলিয়াস বেশ উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিলেন। এমনি সময়ে আবদুস সামাদ আজাদ আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন। তাঁর প্রশ্নের জবাবে আলোচনার বিষয়টা ভেঙে বললাম এবং মুক্তিযোদ্ধা-প্রবেশনের বিষয়ে আমার বক্তব্যও জানালাম। সামাদ আজাদ বললেন, 'কিছুদিন যেতে দিন, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।' তাজউদ্দীন কেন আমাকে পরিচিত নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে বলেছিলেন, তা বুঝতে পারলাম।

আমি কলতাকায় আসার পরে, প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা বা বিবৃতি লেখার সময় হলে, থিয়েটার রোডে আমার ডাক পড়তো। প্রধানমন্ত্রীর শয়নকক্ষে গিয়ে হয় দেখতাম অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ অপেক্ষা করছেন, নয় অনতিবিলম্বে তিনি এসে পড়তেন। প্রথমে তাজউদ্দীন আমাদের কাছে পরিস্থিতি—অথবা পরিস্থিতির যতোটা তিনি বলতে চান, তা—ব্যাখ্যা করতেন। তারপর বক্তৃতা বা বিবৃতিতে কী থাকা দরকার বলে উনি মনে করেন, সে কথা বলতেন এবং সে সম্পর্কে আমাদের পরামর্শ চাইতেন। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে কিছু যোগ করার বা তা থেকে

কিছু বাদ দেওয়ার কথা আমরা কেউ বললে, হয় তিনি তা মেনে নিতেন নয় আমাদের যুক্তি খণ্ডন করতেন। আমিই সাধারণত আলোচনার নোট রাখতাম। এমনি করে আলোচনার ভিত্তিতে একমত হওয়ার পরে হয় আমি বাংলা খসড়া করতাম এবং তার চূড়ান্ত রূপদানের পরে সারওয়ার মুরশিদ তার ইংরেজি ভাষ্য তৈরি করতেন, নয় তিনি প্রথমে ইংরেজি খসড়া করার পরে আমি চূড়ান্ত খসড়ার বাংলা রূপ দিতাম। দুই ভাষায়ই তাজউদ্দীনের অধিকার অসামান্য ছিল—একই শব্দের নানারকম অর্থভেদ সম্পর্কে তিনি খুব সচেতন ছিলেন এবং জুতসই শব্দ খোঁজার জন্যে তিনি সর্বদাই সময় দিতে তৈরি থাকতেন।

তাজউদ্দীন আমাকে খোলাখুলিই বলেছিলেন যে, তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের ব্যাপারে দলের মধ্যে বড়োরকম বিরোধিতা আছে। শেখ মণি যে এরকম একটি বিরোধী গ্রুপের নেতা, তা তিনি আমাকে বুঝতে দিয়েছিলেন, যদিও মনির সঙ্গে আগরতলায় আমার কথোপকথনের বিবরণ আমি কখনো তাঁকে দিইনি। তবে তাঁর বিরুদ্ধে দলের মধ্যে অন্য গ্রুপও যে সক্রিয়, তা তিনি জানিয়েছিলেন, কিন্তু সে গ্রুপে কারা ছিলেন, তা বলেননি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম যে তাজউদ্দীনকে বড়োরকম সমর্থন দিচ্ছেন, একথা তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করেছিলেন একাধিকবার। জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং দলীয় নেতাদের প্রচণ্ড চাপের মুখে তাঁকে কাজ করতে হচ্ছিল। দলের কাছে নিজের সফলতা প্রমাণের প্রথম সুযোগ তিনি পান দুটি ঘটনায়, মে মাসের শেষে স্বাধীন বাংলা বেতার-কেন্দ্র নতুন করে চালু হওয়ায় এবং কাছাকাছি সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অনেক পরিমাণে বাংলাদেশের সেনা-কর্মকর্তাদের হাতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ছেড়ে দেওয়ায়। জুন মাসের শেষে জাতীয় পরিষদ-সদস্যদের নেতৃত্বে পাঁচটি আঞ্চলিক প্রশাসন গঠন করে এবং আগস্ট মাসে আঞ্চলিক প্রশাসনের সংখ্যা নয়ে উন্নীত করে (পরে তা এগারোতে দাঁড়িয়েছিল) তিনি নির্বাচিত সদস্যদের সংশ্লিষ্টতার একটি আনুষ্ঠানিক রূপদানে সমর্থ হন। তাতে দায়িত্বলাভ করে ওসব সদস্য অনেকখানি সন্তুষ্ট হন এবং তাজউদ্দীন যে সবাইকে নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছেন, সে সম্পর্কে তাঁরা খানিকটা আস্থাবান হন। যুব-শিবির ও প্রশিক্ষণ-শিবিরের দায়িত্বেও ছিলেন জাতীয় পরিষদ সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। অবশ্য তাঁর অধীনে কর্মরত বিমানবাহিনীর দুজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা—উইং কমান্ডার এস আর মীর্জা আর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আহমেদ রেজা—দুজনের সঙ্গেই আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক—প্রকৃত দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের সূত্রেই, আমার সৌভাগ্যক্রমে, পরিচয় হয়েছিল গ্রুপ ক্যাপ্টেন (পরে এয়ার ভাইস মার্শাল) এ কে খোন্দকারের সঙ্গে।

নানারকম রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্যে এবং ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ-রক্ষার জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে বেশির ভাগ সময় দিতে হতো। ফলে শরণার্থী-শিবিরে বা যুদ্ধের ফ্রন্টে তিনি যতোটা যেতে চাইতেন, অতোটা পারতেন

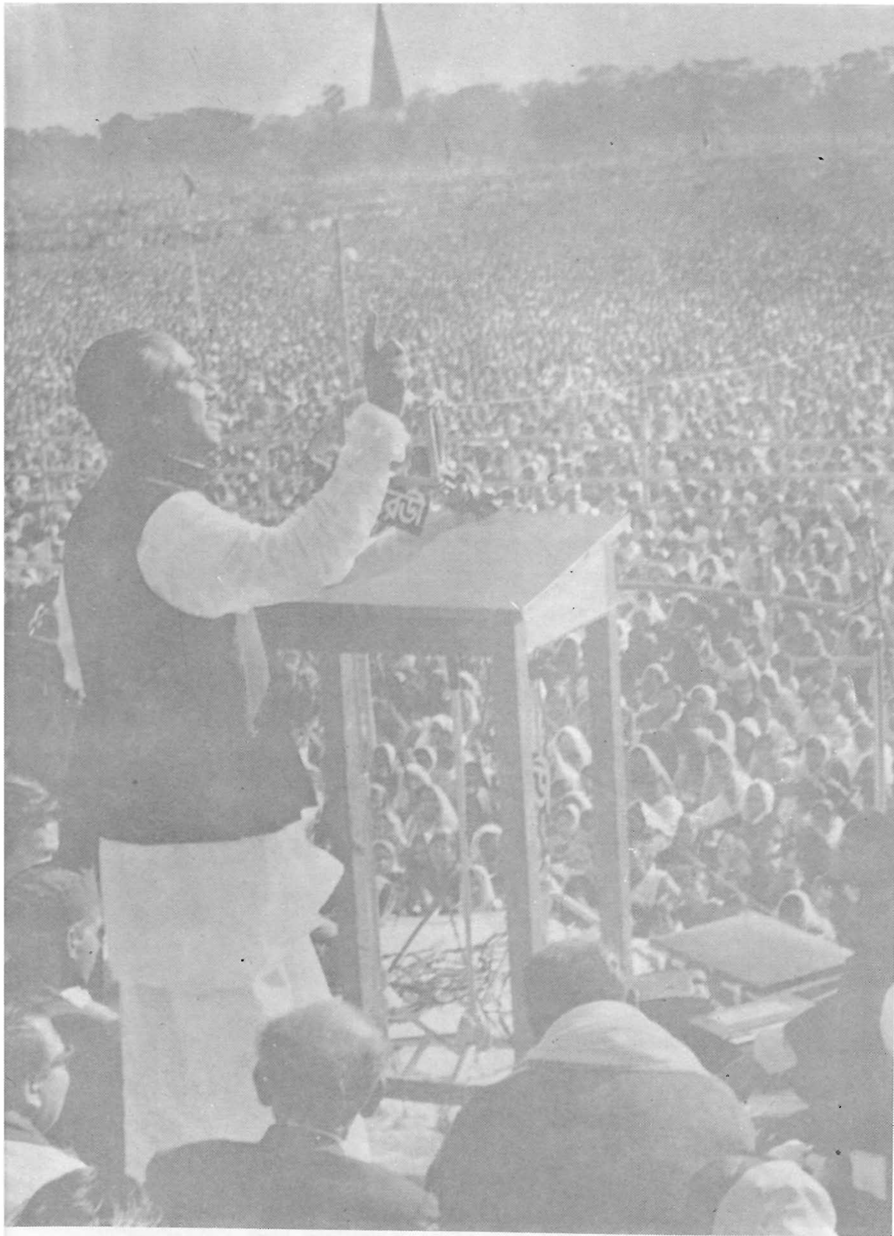
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। নিরাপত্তাজনিত বিবেচনায় ভারত সরকারও তাঁকে সীমান্তবর্তী এলাকায় যেতে নিরুৎসাহিত করতেন বলে আমার ধারণা। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিও অল্পই সফর করতেন। তবে স্বরাষ্ট্র ও ত্রাণমন্ত্রী যুব ও প্রশিক্ষণ শিবিরে এবং ত্রাণ–শিবিরে বেশ যেতেন। অধিকাংশ ত্রাণ-শিবিরের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। আমার সাবেক ছাত্র সলিলকুমার কাহালির কাছে কল্যাণী ক্যাম্পের বর্ণনা শুনেছিলাম (সলিলেরা ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে বেশির ভাগ পথ পায়ে হেঁটে ভারতে গিয়েছিল এবং সলিল–সমীর দু ভাই মিলে বৃদ্ধা ঠাকুরমাকে আক্ষরিক অর্থে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল)। তবে শরণার্থী-শিবিরের কথা মনে হলে যা সর্বাগ্রে মনে পড়ে, তা শুনেছিলাম খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা, অনিরুদ্ধের বন্ধু, অশোক ভট্টাচার্যের কাছে, বিভাগের দায়িত্বপালনের জন্যে তাঁকে মাঝে মাঝে শরণার্থী-শিবিরে যেতে হতো। অশোক তাঁর একবারের অভিজ্ঞতার কথা যা বলেছিলেন, তা এরকম :

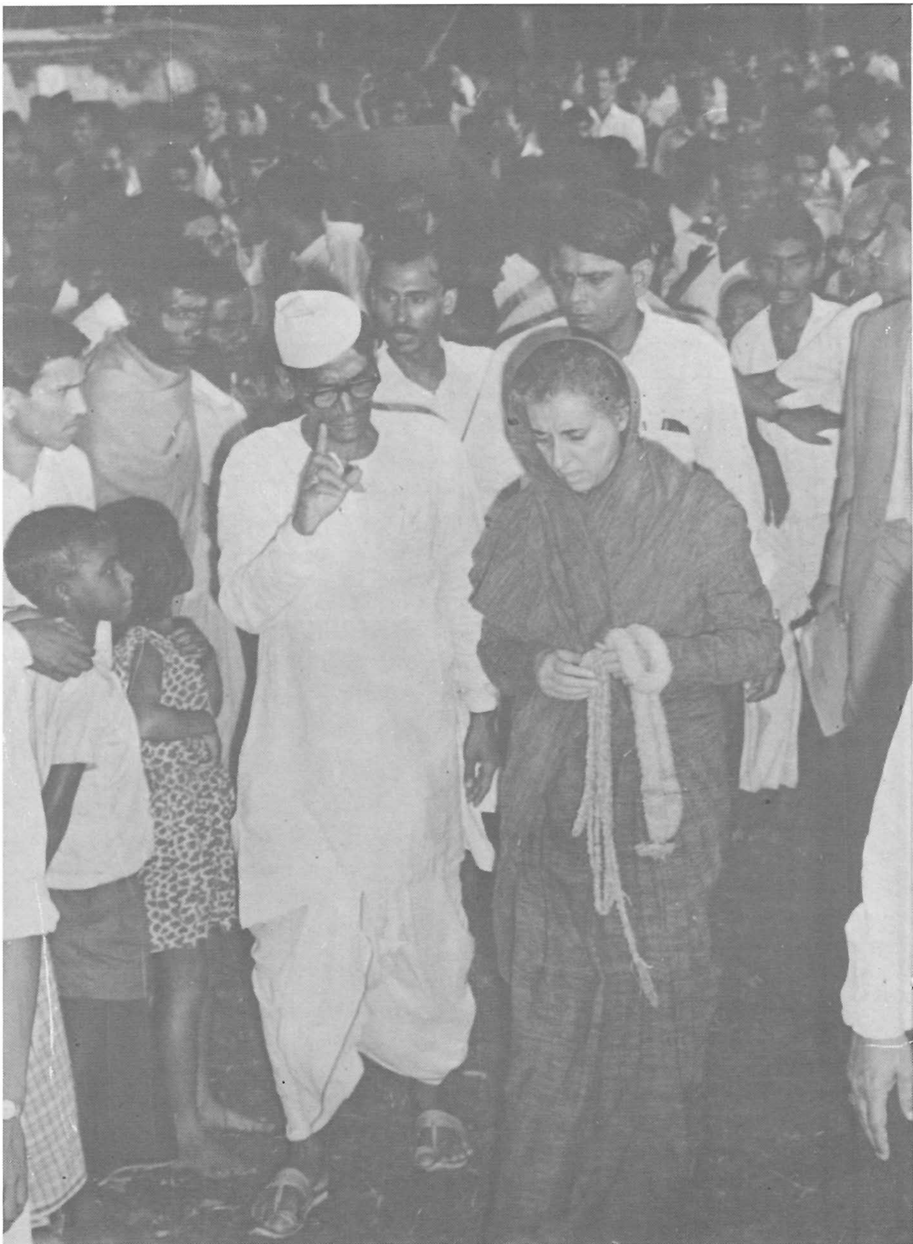
শরণার্থী-শিবিরে মানুষজনের ভিড় অতিরিক্ত। তাদের জন্যে বরাদ্দ সামগ্রীর কিছু সরকারি লোক আত্মসাৎ করে, কিছু নষ্ট হয়, ফলে ক্যাম্পে গিয়ে যা পৌঁছোয় তা অপর্যাপ্ত। ক্যাম্পে শিশুদের জন্যে দুধের ব্যবস্থা আছে, তাদের কোলে নিয়ে বা হাতে ধরে মায়েদের লাইনে দাঁড়াতে হয়। লাইনে দাঁড়াবার জন্যে হুড়োহুড়ি লেগে যায়, কেননা সবসময়ে সকলকে দেওয়ার মতো দুধ থাকে না। এরকম অবস্থায় যিনি দুধ দিচ্ছিলেন, তিনি জানিয়ে দিলেন, দুধ কম আছে, সবাইকে দেওয়া যাবে না; যাদের না দিলেই নয়, শুধু তাদের দেওয়া হবে। সামনে শিশু কোলে নিয়ে এক মা দাঁড়িয়ে, ভদ্রলোক তাকে যেই দুধ দিতে যাবেন, পেছন থেকে কেউ তখন বললো, ওকে দেবেন না—ও বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে পারে। ভদ্রলোক মগে দুধ উঠিয়েও ইতস্তত করছেন, দেবেন কি দেবেন না। ভদ্রলোকের মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকালো সামনে দাঁড়ানো মেয়েটি। তারপর কাপড় সরিয়ে ব্লাউজের বোতাম খুলে নিজের বুক অনাবৃত করে দিল—সন্তানকে স্তনদানের ক্ষমতা তার আছে কিনা, দাতা তা নিজেই বিচার করুন।

অশোকের মুখে শোনা এ ঘটনার স্মৃতি আজো আমাকে তাড়া করে ফেরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরণার্থী শিবির পরিদর্শনকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী : মে ১৯৭১

AN APPEAL FROM THE BANGLADESH LIBERATION COUNCIL OF THE INTELLIGENTSIA

The Bangladesh Liberation Council of the Intelligentsia is an organization of the displaced teachers, scientists, poets, painters, writers, journalists and actors from Bangladesh who managed to escape the wrath of the West Pakistani army, which is responsible for one of history's blackest mass murders and purges.

The object of the Council is to support the war efforts of the Government of the People's Republic of Bangladesh, to press to the attention of the world our case for independence, to document the crimes of West Pakistani army, to do educational work among our freedom fighters and to find for our members the means of their subsistence while they work for the liberation movement.

AMARBOI.COM

The community from which our membership is drawn has been a special target of the military action started on the night of March 25, 1971. A measure of the army's hostility to the intellectual community is its gunning down of twenty University teachers in cold blood before their wives and children. Their sins are their support for democratic and secular values, their opposition to dictatorship, their insistence on the linguistic and cultural individuality of the Bengalis, their articulation of the political, economic, and philosophical basis of the Bangladesh Movement. The army sought to liquidate the intellectuals as a class along with the political leaders with a view to silencing the demand for greater autonomy for the Bengalis.

The demand for autonomy arose from the wrongs and deprivation suffered for 23 years by

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

5) *to create pressure upon Pakistan military authority to release Sheikh Mujibar Rahman and other political prisoners ;*

6) *to give financial support to our cause.*

President

Dr. A. R. Mallick — Vice-Chancellor, Chittagong University

Vice-Presidents

Dr. K. S. Murshid — Head, Department of English, Dacca University

Prof. S. Ali Ahsan — Head, Department of Bengali, Chittagong University

Qumrul Hassan — Painter

Ranesh Dasgupta — Journalist

General Secretary

Zahir Raihan — Novelist and Film Director

Joint Secretary

Dr. M. Bilayet Hossain — Reader in Physics, Dacca University

Executive Secretaries

Hasan Imam — Actor

Sadeq Khan — Art Critic

Moudud Ahmed — Barrister

Dr. Motilal Paul — Economist

Brojen Das — International Sportsman

Wahidul Huq — Musician and Journalist

Alamgir Kabir — Journalist and Critic

Anupam Sen — Sociologist

Faiz Ahmed — Journalist

M. A. Khair — Film-maker

Kamal Lohani — Journalist

Mustafa Monwar — Painter and TV Producer

Bangladesh Liberation Council of Intelligentsia
9, Circus Avenue,
Calcutta-16, India.

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

STOP MURDER
of
SHEIKH MUJIB

JOIN PROTEST RALLY
and
PROCESSION AGAINST

YAHYA'S SHAM TRIAL

on

FRIDAY, 13TH AUGUST, 1971 AT 9-30 A. M

In front of

BANGLADESH MISSION
(9, Circus Avenue, Calcutta-16)

Organised Jointly by :

Bangladesh Liberaton Council of Intelligentsia and Bangladesh Teacher's Association.

AMARBOI.COM

বঙ্গবন্ধুর প্রহসনমূলক বিচারের প্রতিবাদে বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত মিছিল ও প্রতিবাদ-সমাবেশের প্রচারপত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বদলীয় উপদেষ্টা-পরিষদের সভা : মওলানা ভাসানী, তাজউদ্দীন, আবদুস সামাদ আজাদ, কামরুজ্জামান, মোজাফফর আহমদ, মনোরঞ্জন ধর ও মণি সিংহ

বঙ্গবন্ধুর প্রহসনমূলক বিচারের প্রতিবাদে বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির যৌথ উদ্‌যোগে কলকাতায় আয়োজিত সভায় কামরুল হাসান, জহির রায়হান ও অজয় রায় : অজয় রায়ের পেছনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির জ্ঞানেশ পত্রনবীশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



মুক্ত যশোরে আয়োজিত প্রথম জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ;
পেছনে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

In lieu of old RC no 778 dt- 14/X/71

Government of West Bengal

No. 6074/71

DECLARATION

To be made by any foreigner who enters or has entered into India from East Bengal without being in possession of a valid passport and a valid travel document.

(Authority)—Ministry of Home Affairs' order No. 11013/5/71-FI, dated the 5th May, 1971, made under section 3 of the Foreigners' Act, 1946)

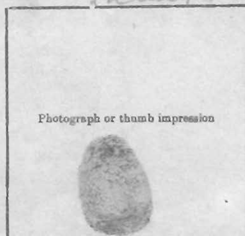
I, (name in full with *aliases*) Mr. A.T.M. Anisuzzaman son of Mr. A.T.M. Moazzam aged about 34 years (whose occupation or profession is that of ....) at present residing at C/o J.B. Chowdhury of 40A Dilkhusha St. of ...... P.S. Narkeldanga Dist. Cal. do hereby declare that—

1. I was born at Khulna on the 18 day of Feb 1937
2. My nationality is Bangladesh.
3. My religion is Islam
4. I attach/affix hereto my photograph/thumb impression and personal description as evidence of my identity.
5. I also annex personal description of my dependants who are below the age of 16 years.
6. I and my dependants have entered India and are desirous of staying in India for such period as we may be permitted to do so, for the following reasons : on 18/4/71.

   State the reasons here Due to Pak army atrocities

7. My permanent address in East Bengal was at (town/village) 27 Rama Charan Chakravarty Rd.

   P.S. Lalbagh Dist. Dacca.



Personal Description

(*a*) Sex male.

(*b*) Height 5' 6"

(*c*) Colour of eyes black

(*d*) Colour of hair do

(*e*) Special peculiarities Nil.

(*f*) Marks of identification One cut mark on his forehead on right side.

Personal description of dependants below the age of 16 years

Serial No.	Name	Sex	Age	Relationship	Identification mark

A.T.M. Anisuzzaman

Signature/thumb impression of foreigner

Permitted to stay in India at 40A Dilkhusha St.

till 31/3 1972.



Signature of the Authority)
Registration Authority
22/12.71
Registration Officer
3A, Theatre Road, Cal.

C.P.D. Press (199)—8-11-71-20M.

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া লেখকের ভারতে অবস্থানের অনুমতিপত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC
OF BANGLADESH

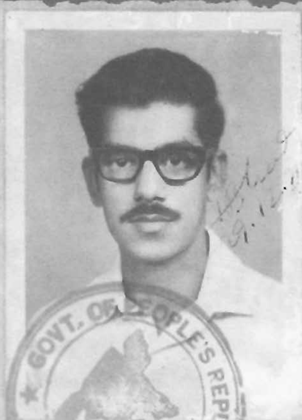
No. 1053

Date 29.12.71

Name: DR. Anisuzzaman

Designation Member
Planning cell

Issued at MUJIBNAGAR



Signature of holder

লেখকের সরকারি পরিচয়পত্র : অনেক দেরিতে করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতালাভের পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবর্ধনা : বসে— অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক, চাকসুর সভাপতি মোহাম্মদ ইবরাহিম, ডঃ এ আর মল্লিক ও লেখক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি পরামর্শ দিলেন ভারতীয় অ্যাকাডেমিক সমাজের কাছে এবং সেই সঙ্গে যতোটা সম্ভব রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মচারী ও নাগরিকদের কাছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে প্রচারাভিযান চালাতে। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি দল গঠন করা যেতে পারে। প্রথমটি যাবে উত্তর ভারতে, তার পরেরটি মধ্যপ্রদেশে, তারপর একটি বোম্বাই অঞ্চলে।

স্থির হলো, প্রথম প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন ড. এ আর মল্লিক, সঙ্গে আমি থাকবো। সহায়ক সমিতির পক্ষ থেকে রইবেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষক—বাণিজ্য বিভাগের অনিল সরকার, ইস্‌লামের ইতিহাস বিভাগের অনিরুদ্ধ রায়, হিন্দি বিভাগের বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, আর সিনেট–সদস্য সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। অন্যদের কথা আগে বলেছি, বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর কথা এখন বলি। সে আত্মপরিচয় দিতো এভাবে : আমার এই দেহ কাশ্মিরের, চিত্ত ও চিত্তেশ্বরী বেনারসের, হৃদয় বাংলার আর অহংকার সমগ্র ভারতবর্ষের। বিষ্ণুকান্ত সংস্কৃত পণ্ডিত, হিন্দির শিক্ষক, বাংলা খুব ভালো জানতো—ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে সে হিন্দিতে শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী এবং পূর্ব বাংলার আরো অনেক কবির কবিতা অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিল। অনেক কবিতা তার মুখস্থ ছিল এবং কখনো স্মৃতিবিভ্রম ঘটলে আমাকে খেই ধরিয়ে দিতে বলে সে বিপদে ফেলতো। ১৯৭১এ বিষ্ণুকান্তের কোনো রাজনীতি ছিল বলে আমার মনে হয়নি। পরে সে বি জে পিতে যোগ দিয়ে তার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়। ১৯৭১এর অভিজ্ঞতা নিয়ে বিষ্ণুকান্ত পত্র–পত্রিকায় হিন্দিতে লিখেছিল, পরে তা বই হয়ে বেরিয়েছিল।

আমাদের যাত্রার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, তখন বাংলাদেশ সরকারের তরফ

থেকে প্রস্তাব এলো যে, প্রতিনিধিদলে তাঁদের মনোনীত একজন সদস্য নিতে হবে। ১৯৭০ সালে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সুবিদ আলী হবেন আমাদের যাত্রাসঙ্গী। প্রস্তাবটা আমাদের একেবারেই ভালো লাগেনি, যদিও সুবিদ আলী আমার কিছু বয়োকনিষ্ঠ হলেও বন্ধুস্থানীয় ছিল। আমাদের মনে হলো, সরকার আবার আমাদের ওপর দলীয় একজনকে চাপিয়ে দিচ্ছেন; তাও শিক্ষক নন, এমন একজনকে। সুবিদ আলীকে আমি ছাড়া প্রতিনিধিদলের কেউ চিনতেন না। অনিল–অনিরুদ্ধ হেসে বললো, 'তোমাদের ওপর চোখ রাখার জন্য সরকার একজনকে সঙ্গে দিচ্ছে।' আমি মুখে বিস্বাদ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, 'যান না ওকে নিয়ে, কী হবে তাতে!' তারপর একটু রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, 'আপনাদের সুবিধাই হবে, একজন জনপ্রতিনিধি থাকবে সঙ্গে। তাছাড়া সুবিদ উর্দুতে বক্তৃতা দিতে পারবে।' আমি বললাম, 'তার কোনো দরকার হবে না। হিন্দিতে বক্তৃতা দেবে বিষ্ণুকান্ত, আমাদের উর্দু বক্তা লাগবে না।' উনি বললেন, 'আপনারা না চাইলে বক্তৃতা দেবে না, কিন্তু সঙ্গে যাক। হয়তো দেখবেন, পরে নিজে থেকেই চলে আসবে।' আমি বুঝতে পারলাম, কোথাও একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, উনিও সেটা বদল করতে ইচ্ছুক নন। আমি মুখ গোমড়া করে থাকলাম। তাজউদ্দীন জানতে চাইলেন, আমরা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি কিনা। আমি বললাম, 'আনুষ্ঠানিক চিঠি দেওয়া হয়েছে, দিল্লিতেও নাকি ফোনে কাউকে কাউকে বলা হয়েছে ব্যবস্থা করার জন্যে।' মনে হলো, সে খবর উনি পেয়ে গেছেন—হয়তো ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন ওঁর কাছে। তাজউদ্দীন বললেন, 'ওঁর সঙ্গে যখন দেখা করবেন, তখন ওঁর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পি এন হাকসারের সঙ্গেও আলোচনা করে আসবেন।' আমি ক্ষুব্ধচিত্তে ড. মল্লিকের বাসায় গিয়ে বললাম 'সুবিদকে নিতেই হবে, আর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, হাকসারের সঙ্গে যেন কথা বলে আসি।' মল্লিক সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'হাকসার কে?' সেখানে অর্থনীতিবিদ মুশারফ হোসেন বসে ছিলেন। উনি বললেন, 'বোধহয় ইন্দিরার টেলিফোন ধরে।' আমি জানালাম 'তাজউদ্দীন বলেছেন, তিনি মিসেস গান্ধীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি।'

১০ জুন রাতে আমরা হাওড়া থেকে ট্রেনে রওনা হয়ে পরদিন পৌঁছোলাম এলাহাবাদে। মল্লিক সাহেবকে তোলা হলো প্রথম শ্রেণীতে, সুবিদ আলীসহ আমরা ছজন তৃতীয় শ্রেণীতে। প্রথম বক্তৃতা হলো এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস–চান্সেলরের সভাপতিত্বে। ড. মল্লিক বক্তৃতা দিলেন মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংবিধান–রচনা ও রাষ্ট্র–পরিচালনার অধিকার হরণ করা সম্পর্কে, নিরস্ত্র মানুষের ওপর সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর সুপরিকল্পিত বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে। আমি বললাম পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীরা ২৪ বছর ধরে যে ভূমিকা পালন করেছেন, সে–বিষয়ে এবং বিশেষ করে ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-হত্যা সম্পর্কে। বিষ্ণুকান্ত হিন্দিতে বক্তৃতা করলো পূর্ব বাংলার সাহিত্যে প্রতিবাদী চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক বোধের বিকাশ সম্পর্কে। আমার বক্তৃতা খুব খারাপ হয়েছিল। জীবনে আর একবারই মাত্র অতো খারাপ বক্তৃতা দিয়েছিলাম।

পরদিন সন্ধ্যায় এলাহাবাদে নাগরিক সভা হলো, অনেকটাই অনানুষ্ঠানিক। মল্লিক সাহেব মূল বক্তা, আমি জোগানদার। শ্রোতাদের একজন জানতে চাইলেন, দেশের কতোটা এলাকা আছে আমাদের দখলে। মল্লিক সাহেব বললেন, শতকরা নব্বই ভাগ। তিনি বললেন, তাহলে আপনারা ভারত সরকারকে চাপ দিন বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্যে। 'টেরিটোরি' না থাকলে রাষ্ট্র হয় না, রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতিও দেওয়া যায় না। সেটা যখন আপনাদের আছে, তখন স্বীকৃতি দাবি করুন। — ভদ্রলোক নিশ্চয় ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে সিভিকস পড়েছিলেন।

একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হতে সম্মত? আমি বললাম, আমরা স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করছি। তিনি বললেন, যদি আপনারা ভারতের সঙ্গে নাই মিলবেন, তাহলে ভারতের কাছ থেকে সর্বাঙ্গীণ সাহায্যলাভের আশা করছেন কী করে? আমি জবাব দিলাম, নৈতিক কারণে। আপনারা ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রাম সমর্থন করছেন, সে নিশ্চয় এই আশায় নয় যে, ভিয়েতনাম ভারতের সঙ্গে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পেছনে রয়েছে বড়রকম নৈতিক বল। প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের সবচেয়ে বেশি বস্তুগত সাহায্য আমরা আশা করি এই ভরসায় যে, নৈতিকতার কারণে ভারত আমাদের পাশে দাঁড়াবে।

AMARBOI.COM

তার পরদিন সকালে প্রবাসী বাঙালিদের আয়োজিত সভা। মল্লিক সাহেব ঘরেই বিশ্রাম নিতে চাইলেন। সেখানে আমি বাংলায় বলার সুযোগ পেলাম এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বলা ছাড়াও পূর্ব বাংলার সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক দিক সম্পর্কেও কিছু বললাম। প্রথমবারের খারাপ বলার ক্ষতি এবার পূরণ করে নিয়েছিলাম। মনে পড়ে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ''একটি তুলসীগাছের কাহিনী'' গল্পের সারমর্ম শুনে অনেক শ্রোতার চোখ ছলছল করে উঠেছিল।

সভা থেকে ফিরে এসে দেখি, মল্লিক সাহেব খুব উৎকণ্ঠিত। ওই সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর কট্টর বিরোধী রাজ নারায়ণের সোশালিস্ট পার্টির এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল এলাহাবাদে। আমাদের উপস্থিতির খবর জেনে তাঁরা লোক পাঠিয়েছেন মল্লিক সাহেবের কাছে। বলেছেন, আমাদের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে এবং বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের স্বীকৃতিদানের দাবিতে তাঁরা সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। তাঁদের ইচ্ছে, তার আগে বাংলাদেশের সম্মানিত অতিথি সম্মেলনের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বলুন। আমরা আগেই স্থির করেছিলাম যে, ভারতের রাজনীতিতে কোনোভাবেই নিজেদের জড়াবো না। তাই শরীর খারাপ, এই

অজুহাতে মল্লিক সাহেব আমন্ত্রণকারীদের কাছে মাফ চেয়ে নিয়েছেন। তাঁরা বলে গেছেন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্য প্রতিনিধিদের কেউ তো অন্তত বলতে পারবেন তাঁদের সম্মেলনে—অতএব তাঁরা আবার আসবেন। মল্লিক সাহেবের দুশ্চিন্তা, এখন কী করা যায়?

আমি বললাম, 'কোনো রাজনৈতিক দলের মঞ্চে আমরা বক্তৃতা দেবো না—কংগ্রেসেরও নয়। এ কথাটাই বলে দেবো।'

অনিরুদ্ধ কিছুটা পরিহাস করেই বলল, 'সুবিদ আলীকে পাঠিয়ে দাও।'

আমি বললাম, 'তাও ঠিক হবে না, বিশেষত আমাদের সরকার বা তাদের দলের অনুমতি যেখানে নেই।'

বিকেলে সোশালিস্ট পার্টির কর্মকর্তারা যখন এলেন, তখন আমাকেই তাঁদের মোকাবেলা করতে হলো, কেননা মল্লিক সাহেব আরো 'অসুস্থ' হয়ে পড়েছেন। তাঁরা ফিরে গেলেন বটে, তবে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে। স্পষ্টই বলে গেলেন, আমরা আপনাদের কাজই করতে চাইছি, আর আপনারা সহযোগিতা করতে চাইছেন না।

এলাহাবাদে যা দেখেছিলাম, তার মধ্যে দুটি বাড়ি আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। একটা নেহরু-পরিবারের প্রাসাদোপম অট্টালিকা—আনন্দ-ভবন, যা তাঁরা দান করেছেন জনগণকে। আরেকটি এক গলির মধ্যে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর পরিবারের ছোট্ট বাসস্থান—প্রধানমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত এমন কি মন্ত্রী থাকতেও—এটাই ছিল তাঁর পরিবারের বাসগৃহ।

এলাহাবাদ থেকে মল্লিক সাহেব তাঁর প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে চাইলেন না। বললেন, একা একা খারাপ লাগে, আর একযাত্রায় পৃথক ফলও সংগত নয়। অতএব উনিও আমাদের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীতে চললেন।

আলিগড় স্টেশনে নেমে দেখি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি নিয়ে আমাদের নিতে এসেছেন দুজন শিক্ষক এবং জনসংযোগ-কর্মকর্তা। তাঁদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরম অতিথি-ভবনে পৌঁছোবার পর আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো সাইক্লোস্টাইল-করা কর্মসূচি। খাওয়া-দাওয়া, দেখা-শোনা—সবকিছুরই সময় দেওয়া আছে। বেশ কয়েকজন শিক্ষক এবং দুএকজন কর্মকর্তা এলেন দেখা করতে, রাত পোনে আটটার মধ্যে সবাই চলে গেলেন। আটটায় নৈশভোজ। তার পাঁচ মিনিট আগে এলেন ভাইস-চান্সেলর ড. আবদুল আলিম। আমরা এক সঙ্গে খেতে বসলাম। তিনি তখন জানালেন যে, পরদিন যে সভা আয়োজিত হয়েছে, তাতে তিনি সভাপতিত্ব করবেন এবং কেবল ড. মল্লিক বক্তৃতা করবেন।

অলিগড়ে সবকিছুই ছিল অত্যন্ত কেতাদুরস্ত, সময়ানুবর্তী, তবে আনুষ্ঠানিক, এবং হৃদয়ের উষ্ণতাহীন। পরদিন সকালে আমাদের ক্যাম্পাস ঘুরিয়ে দেখানো হলো। চিফ মেডিকেল অফিসার ড. এস এম ইউসুফের সঙ্গে বেশ আলাপ জমে উঠল চিকিৎসা-কেন্দ্রে, কেননা তিনি বেশ আগ্রহসহকারে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানতে চাইছিলেন। আমি একটু অবাকই হলাম। তাঁর কৌতূহলের কারণ জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি বললেন, আমার ভাই ছিলেন ঢাকায়।

তাই নাকি? কী করতেন সেখানে?— আমার প্রশ্ন।

তিনি ছিলেন সর্বশেষ সামরিক আইন-প্রশাসক।

সাহেবজাদা ইয়াকুব খান?

হ্যাঁ।

কোথায় তিনি এখন?

করাচিতে, গৃহবন্দি। আমাদের তার জন্যে দোওয়া করতে বলে একটা খবর পাঠিয়েছিল। তারপর আর কিছু জানি না।

তিনি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলেন আমাদের দেশে, বাংলাও শিখেছিলেন, আমাদের প্রতি অনেকটা সহানুভূতি তাঁর ছিল।

হ্যাঁ, তাই আজ গৃহবন্দি।

আপনি নামের শেষে খান লেখেন না?

না। আমার আদ্যক্ষরের পুরোটা হলো সাহেবজাদা মুহম্মদ। বিদায়, ভালো থেকো।

বিদায়।

আমার এটুকু বুঝতে বাকি রইলো না যে, সহোদরের অবস্থা দিয়ে ড. ইউসুফ আমাদের পরিস্থিতি খানিকটা বুঝতে পেরেছিলেন। সেইজন্যে তাঁর আচরণ ছিল অন্যদের চেয়ে ভিন্ন।

বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা। সুসজ্জিত নারীপুরুষ অনেকে এসেছেন। প্রায় সকলেই ব্যক্তিগতভাবে ড. মল্লিক ও আমার সঙ্গে পরিচয়-বিনিময় করলেন। সভার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হলো। সেদিন মল্লিক সাহেব আমার শোনা তাঁর শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। হয়তো আলিগড়ের ঠাণ্ডা পরিবেশ তাঁর ভিতরের আগুনকে উসকে দিয়েছিল। দেখলাম, শ্রোতাদের অনেকে বক্তৃতা শুনতে শুনতে চোখ মুছছেন। প্রথমদিকে আনুষ্ঠানিকতার যে-বেড়াটা ছিল, সেটা কখন যেন উড়ে গেল। সভাপতির ভাষণে ড. আলিম কিছুটা দার্শনিকোচিত কথাবার্তা বলেছিলেন, তবে তাতে মানবিকতার স্পর্শের অভাব ছিল না।

পরদিন শহরে আয়োজিত একটি সভায় আমি ও সুবিদ আলী বক্তৃতা করি। মল্লিক সাহেব যাননি ক্লান্তিবশত, বিষ্ণুকান্তকে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। সুবিদ আলী তার বক্তৃতায় বলেছিল, ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর শয়নকক্ষে সে উপস্থিত ছিল এবং তখন তার সঙ্গে যে-কথা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর, তারও একটা বিবরণ সে দিয়েছিল। সভাশেষে একজন সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, দেখো, ২৫ মার্চ রাতে, মনে হয়, শখানেক লোক অন্তত বঙ্গবন্ধুর শয়নকক্ষে উপস্থিত ছিল এবং তিনি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেছিলেন। এটা কি করে সম্ভবপর?

AMARBOI.com

১৩.

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি–ভবনে নানা কারণে স্বস্তিবোধ করছিলাম না। ব্যাপারটা টের পেয়ে আমাদের সঙ্গীরা ড. মল্লিক ও আমার জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা করে ফেললেন। দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিকসের অধ্যক্ষ ইতিহাসবিদ তপন রায়চৌধুরী এক সকালবেলায় গাড়ি করে এসে মল্লিক সাহেবকে নিয়ে গেলেন তাঁর বাসায়; সেদিন বিকেলে ট্যাক্সি করে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হলো আরেক ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহের ফ্ল্যাটে। রণজিৎ গুহের বাবা রাধিকারঞ্জন গুহ পঞ্চাশের দশকের শেষে ও ষাট দশকের গোড়ায় ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। রণজিৎ গুহ অবশ্য পড়াশোনা করেছেন কলকাতায়, পরে বিলেতে। ১৯৭১ সালে তিনি শিক্ষকতা করতেন সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে। জুন মাসে ছুটিতে এসেছিলেন দিল্লিতে। ১৯৬৯ সালে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ইংল্যান্ডে। রাজ্জাক সাহেবের কাছে আমার একটি বই দেখে কৌতূহলী হয়েছিলেন তার লেখক সম্পর্কে। অপরিচয়ের বাধাটা এভাবে অনেকখানি কেটে গিয়েছিল।

দিল্লিতে আমরা প্রধানত চেষ্টা করেছিলাম শরণার্থী–শিবিরে স্কুল খোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারত সরকারকে বোঝাতে। পরিকল্পনা কমিশনের সচিব ছিলেন তখন অশোক মিত্র আই সি এস। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি আমাদের কয়েকজনকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। ড. মল্লিক, অনিল সরকার, অনিরুদ্ধ রায় এবং আমি গেলাম। পরের দিন ওঁর অফিসে তিনি সরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে ডাকলেন; তাঁদের মধ্যে শিক্ষা, ত্রাণ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ছিলেন। আমরা পূর্বোক্ত চারজন থাকলাম। বক্তব্য উপস্থাপন করলাম আমি। অশোক মিত্রের আগ্রহ দেখেই শিক্ষা ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা বিষয়টি স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ে আলোচনা করতে সম্মত হলেন। বেঁকে বসলেন ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এক শিখ ভদ্রলোক। ১৯৪৭ সালে তাঁর

পরিবার পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। তিনি বারবার একটি কথাই বলতে থাকলেন, ১৯৪৭এ কিংবা তার পরে কখনো পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের জন্যে কোনো ক্যাম্প–স্কুল খোলা হয়নি। এখন তাহলে এ প্রশ্ন উঠছে কেন? অশোক মিত্র বললেন, ১৯৪৭ আর ১৯৭১ এক নয়। তখন দেশত্যাগ করে যারা এসেছিল, তারা ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এসেছিল, এখানকার জনসমষ্টির অংশ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭১এ যারা এসেছে, আশা করা যায়, যতশীঘ্রসম্ভব, তারা স্বদেশে ফিরে যাবে। উত্তরে সিং বললেন, এ রকম স্কুল খুললে তাদের স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। মধ্যাহ্ন–বিরতির পরে শুধু অশোক মিত্র, সিং ও আমি বসলাম। যুগ্ম–সচিবের অনমনীয়তা দেখে অশোক মিত্র রুষ্ট হয়ে সভা শেষ করে দিলেন। বললেন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে তিনি স্বতন্ত্রভাবে বিষয়টি বিবেচনা করতে বলবেন। আমার লিখিত প্রস্তাবটি যেন এই সভায় উত্থাপিত প্রশ্নের আলোকে কিছু ব্যাখ্যাসমেত তাঁকে দিয়ে যাই।

একই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জে পি নায়েকের সঙ্গে। যতোদূর মনে হয়, তখন তিনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের প্রধান ছিলেন। আর বিশ্ববিদ্যালয়–শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে আলাপ করি ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের চেয়ারম্যান, আরেক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ডি এস কোঠারির সঙ্গে। খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ও পার্লামেন্ট–সদস্য (পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল) প্রফেসর নুরুল হাসান তাঁর বাসায় একান্ত আলাপের জন্যে ড. মল্লিককে আমন্ত্রণ জানান। তাঁদের আলোচনার বিষয় মল্লিক সাহেব তখন আমাদের জানাননি। পরে জেনেছিলাম, নূরুল হাসানের সঙ্গে আলোচনার পরে তাঁর বাসা থেকে তিনি লন্ডনে টেলিফোন করে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে জরুরি আলাপ করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমরা দিল্লিতে বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বী কে এম শাহাবুদ্দীন ও আমজাদুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলাম।

দিল্লিতে আমার পক্ষে বিরল সৌভাগ্যজনক একটা ঘটনা ঘটেছিল। সাহিত্য অকাদেমির পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ এলো পূর্ব বাংলার সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার। অনুষ্ঠানটা হলো এক বিকেলে অকাদেমির প্রাঙ্গণে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। আমার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বক্তৃতার পরে সভাপতি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বক্তৃতা ও ভাষণ দুই দেওয়া হয় ইংরেজিতে। শ্রোতাদের মধ্যে অম্লান দত্তের মতো বাঙালি বিদ্বজ্জন ছিলেন, অনেকেই ছিলেন অবাঙালি। ড. মল্লিকসহ আমাদের প্রতিনিধিদলের প্রায় সকল সদস্য ঘাসের ওপর শ্রোতাদের কাতারে বসেছিলেন।

১৭ জুন সকালে খবর এলো, ওইদিনই দ্বিপ্রহরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আমাদের সাক্ষাতের সময় দিয়েছেন। সৌরীন ভট্টাচার্য কী কাজে যেন আগেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি আমাদের সঙ্গী হতে পারলেন না। আবার এর মধ্যে কলকাতা থেকে দিলীপ চক্রবর্তী চলে এসেছিলেন, তিনি আমাদের সঙ্গে গেলেন। আমাদের ভারতীয় বন্ধুরা এই সৌজন্য করেছিলেন যে, কথাবার্তা বলার ভার তাঁরা প্রধানত দিলেন ড. মল্লিক ও আমাকে। ইন্দিরা খুব ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের বক্তব্য শোনেন এবং খুব ধীরস্থিরভাবে যতিসমেত তাঁর কথা বলেন। আমরা ভারত সরকারকে ধন্যবাদ দিলাম সীমান্ত খুলে দিয়ে শরণার্থী আসার ও তাদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্যে; বাংলাদেশ সরকারকে স্থান দেওয়ার জন্যে; সীমিতভাবে হলেও আমাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করার জন্যে; এবং আমাদের মতো বেসরকারি সংগঠনকে অবাধে প্রচারাভিযান চালাবার সুযোগ দেওয়ার জন্যে। এরপরেও, আমরা বললাম, বাংলাদেশ সরকারকে ভারত আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের সরকার জোর পাচ্ছে না এবং বাইরের কোনো দেশও স্বীকৃতি দিতে ভরসা পাচ্ছে না। তাঁর কাছে আমাদের আবেদন, স্বীকৃতিদান ত্বরান্বিত করা হোক। ইন্দিরা বললেন, সময় হলে বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি জানানো হবে, কিন্তু তার অভাবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কাজ করতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে, না, শরণার্থীদের আশ্রয় পেতে কোনো বিঘ্ন ঘটছে? আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয়, স্বীকৃতিদান কেবল দুটি দেশের বিষয়, কিন্তু বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আসলে তা কেবল দুই পক্ষের ব্যাপার নয়—এর সঙ্গে অনেক পক্ষ জড়িত। অতএব বেশ কিছু জিনিস বিবেচনায় নিতে হবে। ভারত সরকারের সদিচ্ছায় আমরা যেন আস্থা রাখি, যেন ভরসা রাখি, ভারত কখনো বাংলাদেশ সরকারকে একা ফেলে দেবে না। এরপরে আমরা শরণার্থী-ক্যাম্পে স্কুল খোলার প্রস্তাবটি উত্থাপন করায় তিনি বললেন, এই লাখ লাখ মানুষকে সামান্য আহার ও পানীয় জোগাতেই ভারত সরকার হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, বিদেশী বা আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্যে হাত পাততে হচ্ছে। সেখানে স্কুল-প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দেওয়া দুষ্কর। তবে আমরা একটা পরিকল্পনা পেশ করলে তিনি তা পরীক্ষা করে দেখবেন। আমি যখন বললাম, অশোক মিত্রের কাছে আমরা খসড়া পরিকল্পনা দিয়ে এসেছি, তিনি বললেন, আমরা যেন অশোক মিত্রকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলি (এ কথা অশোক মিত্রকে জানালে তিনি বলেন, তাঁর মন্ত্রী না পাঠালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন না—এটাই দাপ্তরিক রীতি)। ইন্দিরা নিজে থেকে আমাদের বললেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের রচনা ও আবেদনের একটি সেট আমরা যেন বিলেতে মারি সিটনের কাছে (ইনি সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র সম্পর্কে বই লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন) পাঠিয়ে দিই। মারি সিটনকে কেন কাগজপত্র পাঠাতে বলেছিলেন, তখন তা বুঝি নি। পরে জানতে পারি, তিনি বিদেশে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল খুলেছিলেন বাঙালি শরণার্থীদের জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্দিরার একটি ব্যাপারে আমি অবাক হয়েছিলাম। ১৯৬৪ সালে তাঁকে প্রথম দেখি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি তখন ভারতের তথ্য ও বেতারমন্ত্রীরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করছিলেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করেন খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী–দম্পতি লয়েড ও সুজান রুডলফ। বক্তৃতার শেষে রুডলফেরা তাঁর সম্মানে চায়ের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার আনুষ্ঠানিক পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। দিল্লিতে সাক্ষাৎকারের সময়ে আমি যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রুডলফদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তখনো আছে কিনা, তিনি তাঁদের কথা মনে করতে পারলেন না।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের শেষে ড. মল্লিক ও আমি গেলাম পি এন হাকসারের সঙ্গে কথা বলতে। হাকসারের বয়স হয়েছে, কিন্তু সৌজন্যে বিন্দুমাত্র ঘাটতি হয়নি। নানা কথার পরে তিনি বললেন, দেখো, এখন তোমরা স্বদেশের মুক্তির জন্যে যুদ্ধ করছ। দেশের রাজনীতি দেশে ফিরে কোরো। এখানে যারা আছো, দলমতনির্বিশেষে তাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। তোমাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমার অভিবাদন জানিয়ে বলো, তিনি যেন এমন একটা উপায় বার করেন, যাতে বাংলাদেশের সকল দল মুক্তিযুদ্ধ–পরিচালনায় নিজেদের অংশীদার মনে করতে পারে।

হাকসারের দপ্তর থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম প্রধানমন্ত্রীর অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা পি এন ধরের অফিসে। তাঁর সঙ্গে আলাপটা হলো প্রায় আনুষ্ঠানিক—তাতে কোনো পক্ষেরই লাভ হয়েছিল বলে মনে হয় না।

AMARBOI.COM

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ফিরে আসার পরে সৌরীন ভট্টাচার্যের দেখা পাওয়া গেলো। অনিল, অনিরুদ্ধ ও আমি সমস্বরে তাঁকে বললাম, ‘সৌরীনদা, আপনি না থাকায় তো প্রধানমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছিলেন না।’ তিনি আমাদের কথা উড়িয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু যখন ড. মল্লিক গম্ভীর মুখে বললেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তো প্রথমেই আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, হোয়্যার ইজ সৌরীন?’, তখন তিনি আর অবিশ্বাস করতে পারলেন না। নিজের গুরুত্বে তিনি যেমন খুশি হলেন, তেমনি সময়মতো ঠিক জায়গায় না থাকায় লজ্জিতও বোধ করলেন। তাঁকে নিয়ে আমরা মাঝেসাঝে হাসিঠাট্টা করতাম, কিন্তু এবারের মতো তা কখনো কার্যকর হয়নি।

ওইদিনই নৈশভোজ ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে আর গণেশের বাসভবনে। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন আর দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী—ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি ও মোহন কুমারমঙ্গলম, আর কংগ্রেস–নেত্রী নন্দিনী সৎপথী (তিনি পরে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, সেই সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে আমার খুব জমে গিয়েছিল)। দিল্লির বেশ কজন নাম–করা সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ড. মল্লিককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছিলেন। আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারছিলাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্ত্রীদের সঙ্গে পূর্বব্যবস্থা–অনুযায়ী এই প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন হয়েছে এবং যদিও প্রশ্ন করছিলেন সাংবাদিকরা, তবে উত্তর শুনছিলেন মন্ত্রীরা। মল্লিক সাহেবই প্রধানত উত্তর দিচ্ছিলেন, আমি জোগান দিচ্ছিলাম মাত্র, তিনি এখানেও খুব যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। শেষকালে তিনি বললেন, আমাকে আপনারা অনেক প্রশ্ন করেছেন, এখানে উপস্থিত মন্ত্রীদের কি আমি দু–একটা প্রশ্ন করতে পারি? তাঁরা সম্মতিসূচক উত্তর দেওয়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, একথা এখন স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে ভারতের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া আমাদের মুক্তিযুদ্ধ প্রলম্বিত হবে। ভারত কি চায় যে, আমাদের লোকবল ও সম্পদের ক্রমাগত হানি হতে থাকুক, নাকি, তারা আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে সৈন্য পাঠিয়ে দ্রুত বাংলাদেশকে মুক্ত করতে সাহায্য করবে? এ রকম প্রত্যক্ষ প্রশ্ন আশা করেননি মন্ত্রীরা। তাঁরা সরাসরি উত্তর না দিয়েও যা বললেন তার মর্মকথা এই : দীর্ঘকাল শরণার্থীদের লালন করা ভারতের পক্ষে দুঃসাধ্য, সুতরাং ভারত চায় যতশীঘ্রসম্ভব তারা দেশে ফিরে যাক। বাংলাদেশকে এই কাজে আমরা সাহায্য করতে চাই, তবে এর সেরা উপায় কী হবে, তা আরো ভেবে দেখতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পক্ষে অনুকূল মতামত গড়ে তুলতে আরো সময় লাগবে—তার জন্যে পর্যাপ্ত কূটনৈতিক উদ্‌যোগ চাই। যেহেতু সামরিক সংঘাতের সম্ভাবনা এখন আর পরিহার করা যাচ্ছে না, সুতরাং নিজেদের সীমান্তের কথা আমাদের ভাবতে হবে, বিশেষ করে উত্তর–পূর্ব সীমান্তের কথা। তুষারপাতের পরে সেখানকার পথঘাট চলাচলের অযোগ্য হওয়া পর্যন্ত হয়তো অপেক্ষা করা দরকার।

ফেরার পথে গাড়িতে উঠেই মল্লিক সাহেব আমাকে ফিসফিস করে বললেন, 'ডিসেম্বর'।

দিল্লিতে এ যাত্রায় আর যাঁদের সঙ্গে আমাদের অর্থপূর্ণ যোগাযোগ ঘটে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য–মন্ত্রণালয়ের অর্থ–উপদেষ্টা ড. অশোক মিত্র (পরে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী), দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিকসের অধ্যাপক ড. অর্জুন সেনগুপ্ত (সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্র, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে অর্থনৈতিক কাউন্সেলর, পরে ব্রাসেলসে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, সর্বশেষে পরিকল্পনা কমিশনের সচিব); জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভাইস–চান্সেলর প্রফেসর মুনিস রাজা (এখন মরহুম), ড. শিশির গুপ্ত (পরে ভিয়েতনামে ভারতের রাষ্ট্রদূত) ও ড. পরিমল দাস; আমার শিক্ষকতুল্য ইতিহাসবিদ ড. নীহাররঞ্জন রায়; এবং সরল চ্যাটার্জি—এঁর কথা পরে বিস্তারিত বলবো। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. অনিরুদ্ধ গুপ্ত বেশ অবজ্ঞাই করেছিলেন আমাদের, বোধহয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল না বলে।

দিল্লিতে এক জনসমাবেশ হয়েছিল প্যান্ডেল খাটিয়ে, বোধহয় কালীবাড়ির কাছে। শ্রোতারা বেশির ভাগই ছিলেন বাঙালি, তবে সকলে নয়। তাই বক্তৃতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল ইংরেজিতে। অনিরুদ্ধের ওপরে ভার পড়েছিল বক্তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার। আমার পরিচয় দিতে গিয়ে—কী বলবে ভেবে না পেয়ে কিংবা ঘাবড়ে গিয়ে—সে বলে দিল, তিনি মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে অনেক বই লিখেছেন। আমি তো ভয়ে বাঁচি না! যদি কোনো শ্রোতা এসব বইয়ের নাম জিজ্ঞেস করে, তখন আমি কী বলব! যাহোক, শেষ পর্যন্ত তেমন বিপদ ঘটে নি।

দিল্লি থেকে আমরা গেলাম আগ্রায়, আগ্রা থেকে লখনউতে। আগ্রায় তাজমহল দেখলাম সূর্যোদয়ে এবং চাঁদনি রাতে। আগে দিনেই তাজমহল দেখেছিলাম, রাতে তার অপরূপ শোভা দেখার সুযোগ হলো এবারে। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক জনসমাবেশে বক্তৃতা করতে উঠে মল্লিক সাহেব আমার বক্তৃতাটা দিয়ে ফেলেন। আসলে আমরা বিভিন্ন জায়গায় একই বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। শুনতে শুনতে পরস্পরের কথা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। মল্লিক সাহেব যখন আমার বক্তব্য বলা আরম্ভ করলেন, তখন প্রথমে চমকে গেলাম বটে, কিন্তু একটুও উদ্‌বিগ্ন হলাম না। আমার বলার পালা যখন এলো, তখন আমি ওঁর বক্তৃতাটা দিয়ে ফেললাম।

লখনউতে আমাদের সম্মানে আয়োজিত এক সংবর্ধনায় এক মহিলার সঙ্গে কেউ আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি তখনই বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারাভিযান চালিয়ে ফিরেছেন। যিনি আমাদের পরিচয় ঘটালেন, তিনি আমাকে বললেন, মহিলার আত্মীয়-পরিবার আছে চট্টগ্রামে, তাদের কোনো খোঁজখবর না পেয়ে তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। আমি মহিলার কাছ থেকে তাঁর আত্মীয়দের নাম-ঠিকানা জেনে নিয়ে বললাম, আমি খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করবো—তবে সফল হবো কিনা সন্দেহ। মহিলা ম্লান হেসে বললেন, এখন কঠিন সময় যাচ্ছে। তাঁর আত্মীয়রা আদৌ বেঁচে আছেন কিনা সে-সম্পর্কে আমার সন্দেহ জাগলো। মহিলার মনেও যে সে-সন্দেহ জাগেনি, তা নয়। তবু তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্যে অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রচারাভিযান চালাচ্ছেন। কেবল আদর্শনিষ্ঠ মানুষের পক্ষেই এমন করা সম্ভবপর। মনে মনে আমি তাঁকে সহস্রবার ধন্যবাদ জানালাম।

আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম ২৭ জুনে। পরদিনই ড. মল্লিক ও আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে সফরের বিবরণ দিতে গেলাম। উনি অফিসে ছিলেন না। মল্লিক সাহেব চাইলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে। একসঙ্গেই গেলাম। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে মল্লিক সাহেব আমাদের নবলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা বললেন, আমিও কিছু যোগ করলাম। বিশেষ করে, পি এন হাকসার যে দলমতনির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, আমি তারই ওপরে জোর দিলাম।

পরে বুঝেছিলাম, কাজটা ঠিক হয়নি। সৈয়দ নজরুল ইসলামের মনে হয়েছিল, আমার নিজের অভিপ্রায়টা হয়তো আমি হাকসারের নামে চালিয়ে দিচ্ছি। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলক্ষণ বিরক্ত হয়েছিলেন, যদিও আমাদের সামনে তা প্রকাশ করেননি। পরে তাজউদ্দীন আমার কাছে জানতে চান, সৈয়দ সাহেবকে আমি চটালাম কেমন করে। উনি যে চটেছেন, তা-ই আমি বুঝতে পারিনি। তাজউদ্দীনকে সব কথা বললাম। তিনি বললেন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমাকে জানেন বামঘেঁষা হিসেবে। এ ধরনের ঐক্যপ্রয়াসে বামপন্থীরাই ছিলেন সবচেয়ে উৎসাহী। তাই তাঁর সন্দেহ অমূলক হলেও অযৌক্তিক ছিল না।

জুলাই মাসে তাজউদ্দীন যখন বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা সেল গঠন করার প্রস্তাব করেন এবং তাঁর একজন সদস্যরূপে আমার নাম উত্থাপন করেন, তখন, এরই জের হিসেবে, তাঁকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

আমাদের উত্তর ভারত-সফরের একটা ছোট পাদটীকা আছে। লখনউতে অনিল সরকার তিনটে শাড়ি কিনেছিল। কলকাতায় ফিরে এসে একটা উপহার দিয়েছিল বেবীকে। এ-উপহার বেবীর জন্যে যেমন অপ্রত্যাশিত ছিল, অনিলের অভিপ্রায় আমার জন্যে তেমনি ছিল অননুমেয়। এর অন্তরালবর্তী ভাবনা ও শুভেচ্ছা যে উপহারকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তা বলা বাহুল্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪.

আগরতলা থেকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অধ্যাপক এডওয়র্ড সি ডিমককে যে-চিঠি লিখেছিলাম, তা দেখে আমার কলকাতার ঠিকানায় এক শ ডলার দিয়ে পাঠালেন ড. এ এস জহুরুল হক। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে সহপাঠী ছিলাম, কিন্তু খুব যে অন্তরঙ্গ ছিলাম, তা নয়। পরীক্ষায় প্রথম স্থানটি নিজের প্রাপ্য বলে আমরা উভয়েই মনে করতাম; মতাদর্শের দিক দিয়ে আমরা ছিলাম দুই মেরুতে। ১৯৫৬ সালে অনার্স পাশ করে জহুর চলে যান করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পড়তে। তখন রেডিও পাকিস্তান থেকে সংবাদ পড়ে বেশ সুনাম অর্জন করেন। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো একটি বৃত্তি নিয়ে ইন্ডিয়ানা রাজ্যের ব্লুমিংটনে লোকসাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা করতে যান। ১৯৬৫ সালে আমি শিকাগো থেকে শিক্ষা-বিষয়ক এক সম্মেলনে যোগ দিতে ব্লুমিংটনে যাই এবং কাজের শেষে জহুরের নির্বন্ধে তাঁর বাসায় কদিন থেকে আসি। বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসুর সঙ্গে আমার পরিচয় এবং তাঁদের কৃতী পুত্র শুদ্ধশীল বসুর (এঁরা কেউই আর নেই) সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সূচনা হয় সেবারে জহুরের দেওয়া নৈশভোজে। বহু বছরের মধ্যে সে-ই তাঁর সঙ্গে একবার যোগাযোগ হয়েছিল। ১৯৭১এ জহুর কোনো এক কলেজে শিক্ষকতা করতেন এবং থাকতেন ব্লুমিংটনে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতে শিকাগোয় গেলে ডিমক তাঁকে আমার চিঠি দেখিয়েছিলেন। অর্থসাহায্য চাওয়া দূরের কথা, জহুরের সঙ্গে আমি কোনো যোগাযোগ করেও উঠতে পারিনি। তাঁর কাছ থেকে এই অযাচিত সাহায্য পেয়ে যে কতোখানি অভিভূত হয়েছিলাম, তা বোঝানো সহজ নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেকদিন পরে ঢাকায় জহুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে টাকাটা পরিশোধ করতে চেয়েছিলাম। তিনি নেননি। তাঁর সঙ্গে কিছুকাল বেশ যোগাযোগ ছিল, আবার তা ছিন্ন হয়ে গেছে।

আমার ঢাকাবাসী ভায়রা তফাজ্জুল আলী ওরফে মাখন (এখন আর বেঁচে নেই) লন্ডনে তাঁর সূত্রের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন এক শ পাউন্ড। সে ঋণ অবশ্য পরিশোধ করার চেষ্টা করিনি।

যুদ্ধের শেষদিকে অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থসাহায্য এসেছিল ক্যানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ব্যারি মরিসনের কাছ থেকে। তাঁর কথা একটু বিস্তৃত করে বলি—কেননা, পরে হয়তো সে-সুযোগ আর পাবো না। ব্যারি পিএইচ ডি করেছিলেন শিকাগো থেকে। সেই গবেষণার সূত্রে ১৯৬৩ সালে ঢাকায় এসে সপরিবার বছরখানেক ছিলেন। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সূচনা। ১৯৬৪তে আমার শিকাগো যাওয়ার অল্পকাল পরে ব্যারি সেখানে ফিরে যান এবং গবেষণার কাজ (পরে *পোলিটিকাল অ্যান্ড কালচারাল সেন্টার্স অফ অ্যানশেন্ট বেঙ্গল* নামে প্রকাশিত) শেষ করেন। তখন আমাদের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়। ইউনেসকোর জন্যে পূর্ব বাংলার গল্প-অনবাদের কাজে দুজনে হাত দিই, তবে সে-প্রকল্প শেষ হয়নি মূলত আমার সময়াভাবের জন্যে। ১৯৬৬ সালে ব্যারি আবার কিছুকালের জন্যে ঢাকায় আসেন, লালমাইয়ের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে সরেজমিনে গবেষণার উদ্দেশ্যে। সে-সময়ে তিনি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসস্থানেই ছিলেন। পাকিস্তান প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান ড. এফ এ খান তাঁর কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে নির্ধারিত সময়ের আগেই ব্যারি যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যান, তবে *লালমাই* সম্পর্কে তাঁর একটি উৎকৃষ্ট বই সেখান থেকে ঠিকই প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি ক্যানাডায় বসতিস্থাপন করেন এবং ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় যোগদান করেন। ১৯৭১ সালে নিজের বেশির ভাগ সময় তিনি ব্যয় করেছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ক্যানাডার সরকার ও জনসাধারণের সমর্থন আদায়ের কাজে।

ডিমকের কাছে আমার খবর পেয়ে ব্যারি আমাকে লেখেন যে, আমি সম্মত হলে সপরিবার আমাকে কানাডায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা তিনি করবেন। আমি তাঁকে সবিনয় জানাই যে, ওই অবস্থায় কলকাতা ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, সংগতও হবে না। তখন তিনি এক গবেষণা-প্রকল্প পেশ করেন ক্যানাডা-কাউনসিলের কাছে। তাতে আমাকে কলকাতায় অবস্থানকারী তাঁর গবেষণা-সহযোগীরূপে দেখিয়ে বেশ কিছু টাকা অগ্রিম দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। অর্থ-মনজুরির আগে ব্যারি বিষয়টা আমাকে জানান নি, তাই ক্যানাডা-কাউনসিলের চিঠি পেয়ে যুগপৎ বিস্মিত ও আশ্বস্ত হয়েছিলাম। তবে অর্থলাভ করলেও কাজ করার সময় এবারেও পেলাম না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে একবার চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু হয়ে উঠল না। কেননা উপকরণ সব কলকাতায়, আর আমি তখন ঢাকায় সংবিধানের বাংলা ভাষ্য নিয়ে ব্যস্ত। আমাকে লজ্জা থেকে বাঁচাতে ব্যারি নিজেই লিখেছিলেন যে, ১৯৭১ সালে আমার পক্ষে গবেষণায় মন দেওয়া যে সম্ভবপর ছিল না, সে কথা তিনি নিশ্চিতই জানতেন; সুতরাং এ নিয়ে আমি যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুশ্চিন্তা না করি। তবে ক্যানাডা-কাউনসিলের কাছে তিনি কী জবাবদিহি করেছিলেন, তা আমার জানা নেই।

ওই ১৯৭১ সালেই ব্যারির মনে হয়েছিল, ইতিহাসের নির্লিপ্ত গবেষণা না করে মানবহিতের সক্রিয় উদ্‌যোগ নেওয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে ১৯৭২এ তিনি ক্যানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন এবং শ্রীলঙ্কায় তাঁদের খাদ্য কিংবা কৃষি —সংক্রান্ত কর্মসূচি তদারক করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গেলেও তাঁর মনের অস্থিরতা দূর হয়নি। ১৯৭৪এ আমি মনট্রিলে এক সেমিনারে যোগ দিই। আমার চিঠি পেয়ে ব্যারি টরোন্টো থেকে রাতের কোচে করে মনট্রিলে আসেন এবং দিনটা আমার সঙ্গে কাটিয়ে আবার রাতের কোচে ফিরে যান। সেই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। ১৯৮০ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত আমার একটি বই তাঁকে উৎসর্গ করি। প্রকাশকের কাছ থেকে বই পেয়ে তা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে উৎসর্গ-লিপি তাঁর চোখে পড়ে। ব্যারি লেখেন, সে-মুহূর্তে অশ্রু সংবরণ করা তাঁর সাধ্য হয়নি। পরে আর তাঁর সঙ্গে আমার এবং আমাদের বেশির ভাগ মার্কিন বন্ধুদেরও আর যোগাযোগ থাকেনি।

বাংলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-শিক্ষকদের সাহায্য করতে কোনো কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থাও এগিয়ে এসেছিলেন। তার মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর কালচারাল ফ্রিডম এবং ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটির (আই আর সি) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। তবে *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্রের* পঞ্চদশ খণ্ডে (ঢাকা, ১৯৮৫)এ-বিষয়ে তিনি যা লিখেছেন, তার সঙ্গে আমার স্মৃতি সম্পূর্ণ মেলে না। আলী আহসান সাহেবকে প্রথমোক্ত সংস্থার সভাপতি চিঠি দিয়ে জানান যে, ভারতে শরণার্থী বাংলাদেশের বিদ্বজ্জন, বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের জন্যে তাঁরা পঁচিশ হাজার ডলার মনজুরি দিয়েছেন। ওই সংস্থার ভারতীয় কর্মসূচির পরিচালক এ বি শাহ্ বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং এই অর্থবণ্টনের উদ্দেশ্যে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এস এম মাসুদকে সভাপতি করে এবং অন্নদাশঙ্কর রায়, এ আর মল্লিক, সৈয়দ আলী আহসান, এ বি শাহ্, সুশীল ভদ্র ও সুশীল মুখোপাধ্যায়কে সদস্য করে একটি কমিটি গঠিত হয়। এসব কথা আমারও মনে পড়ে। কিন্তু জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতি মাসে এই কমিটির কাছ থেকে নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য পেয়েছেন বলে যে নামের তালিকা সৈয়দ আলী আহসান প্রকাশ করেছেন, সে সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হতে পারছি না। আমি যে জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নিয়মিত অর্থসাহায্য গ্রহণ করিনি, এ কথা বোধহয় বলতে পারি। ওসমান জামাল জুন মাসে আগরতলা থেকে কলকাতায় এসে আগস্ট মাসে ইংল্যান্ডে চলে যান। মতিলাল পাল (তালিকায় পদবি আছে রায়) আগস্টের শেষে বা সেপ্টেম্বরের গোড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। জুন থেকে ডিসেম্বর

পর্যন্ত টাকা নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাঁদের হয়ে আর কেউ টাকা নিয়ে থাকলে অবশ্য অন্য কথা।

আমার যতদূর মনে পড়ে, জুলাই মাসে ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটির পরিচালক লী থ (আলী আহসান তাঁকে ইন্টারন্যাশনাল রিফিউজি অর্গানাইজেশন নামে একটি স্বতন্ত্র সংগঠনের প্রতিনিধি বলে নির্দেশ করেছেন) কলকাতায় আসেন। এক সন্ধ্যায় ভদ্রমহিলা গ্র্যান্ড হোটেলে একটি ছোটখাটো সংবর্ধনায় আমাদের অনেক লেখক, শিল্পী, শিক্ষককে আমন্ত্রণ জানান। সংবর্ধনাশেষে বিদায় দেওয়ার সময়ে আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটি খাম তুলে দেওয়া হয়—তাতে কিছু অর্থ ছিল। ওই একবারই অন্তত ওসমান জামাল ও আমি টাকা নিয়েছিলাম বলে মনে পড়ে। এই অনুষ্ঠান যদি আই আর সির না হয়ে কালচারাল ফ্রিডমের হয়ে থাকে, তাহলেও ওই একটিবারই আমরা অর্থগ্রহণ করেছিলাম। আমাদের মধ্যে একমাত্র ফয়েজ আহ্‌মদ খামসুদ্ধ টাকাটা ফেরত দিয়েছিলেন।

ইন্টারন্যাশনাল রিফিউজি অর্গানাইজেশনের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ হয়নি, সুতরাং তাঁরা কী করেছিলেন, আমি তা বলতে পারব না। তবে মিসেস থ-র আন্তরিক প্রচেষ্টায় ক্যাম্প-স্কুল পরিচালনার বিষয়ে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতিকে আই আর সি সাহায্য করেছিলেন। শিক্ষক সমিতির অন্য প্রকল্পে এবং শিক্ষকদের নিজস্ব কোনো কোনো প্রকল্পেও আই আর সি থেকে সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। তার মধ্যে আমাদের আর্কাইভস-সংক্রান্ত প্রকল্প এবং অধ্যাপক মযহারুল ইসলামের লোকসাহিত্য-সংগ্রহের প্রকল্প ছিল বলে মনে হয়।

অনেক বিদেশী হিতৈষী এবং বিদেশী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি আমাদের খোঁজখবর নিতে এসেছিলেন। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দপ্তরে প্রোগ্রাম অফিসার জর্জ জাইডেনস্টাইন তাঁদের একজন। স্বাধীনতার পরে তিনি ঢাকায় ফোর্ড ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেছিলেন অনেকদিন। আমাকে অবাক করে দিয়েছিলেন ইয়েন মার্টিন। ইয়েন জাতে ইংরেজ; স্বল্পকাল ঢাকায় ফোর্ড ফাউন্ডেশনের দপ্তরে কর্মরত ছিলেন, পরে বদলি হয়ে যান করাচিতে। পূর্ব বাংলায় তাঁর পরিচিতজনের খবর নিতে তিনি করাচি থেকে ব্যাংকক ঘুরে কলকাতায় আসেন একেবারে নিজস্ব উদ্‌যোগে। তিনি ছিলেন অধ্যাপক মুশারফ হোসেনের ব্যক্তিগত বন্ধু। ইয়েন আমাকেও খুঁজে বের করেছিলেন এবং প্রথমে দু-চারটে কথা বলার পরে, মনে পড়ে, রাস্তায় অনেকক্ষণ আমরা হেঁটেছিলাম নিঃশব্দে। সমগ্র পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও অনিশ্চয়তা কিছুক্ষণের জন্যে যেন আমাদের কথা কেড়ে নিয়েছিল। অনেক পরে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে ইয়েনের খুব নাম হয়। তাঁর সঙ্গে আমার পরে ঢাকায় ও লন্ডনে বহুবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁর পূর্ব লন্ডনের বাড়িতে আমি একবার রাতও কাটিয়েছি। ওয়ার অন ওয়ান্টের চেয়ারম্যান ও ব্রিটিশ এম পি ডোনাল্ড চেজওয়ার্থের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে আমীরউল ইসলাম আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন গ্র্যান্ড হোটেলে। ডোনাল্ড চেজওয়ার্থ তার আগেও একবার কলকাতায় এসেছিলেন, কিন্তু তখন আমিই কলকাতায় এসে পৌছোইনি। ওয়ার অন ওয়ান্ট এবং অক্সফ্যাম মিলে এপ্রিলের গোড়া থেকেই শরণার্থীদের সাহায্যের কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন, দেশের মধ্যেও এক ধরনের দুর্ভিক্ষাবস্থার আশঙ্কা তাঁদের ছিল। শরণার্থী-শিবিরে স্কুল খোলা যে দরকার, সেকথা আমি ডোনাল্ড চেজওয়ার্থকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলাম। হেনরি স্টার্ন (তাঁর সংগঠনের নাম ভুলে গেছি) এবং কলকাতায় অস্থায়ীভাবে অবস্থানরত মার্কিন গবেষক ক্যারোল ফারবার বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি খুবই সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন।

অধ্যাপকদের মধ্যে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত আরন লেভেনন্টাইনের সঙ্গে। তিনি কাদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, তা এখন মনে নেই; তবে এটা মনে পড়ে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে শরণার্থী হওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল, তাই আমাদের প্রতি তাঁর সমবেদনা ছিল। অধ্যাপক মুশারফ হোসেন ও ড. স্বদেশরঞ্জন বসুর বন্ধু মার্কিন অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল থরনার এসেছিলেন প্যারিস থেকে। তাঁর সঙ্গে আমার সেই প্রথম পরিচয় হয়। এশিয়াটিক ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ ওরিয়েন্টালিস্টদের দ্বিশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ১৯৭৩ সালে প্যারিসে যে মহাসম্মেলন হয়, ড্যানিয়েলের সূত্রেই তাতে আমি আমন্ত্রিত হই এবং একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার গৌরব লাভ করি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ড্যানিয়েল (এখন লোকান্তরিত) এবং তাঁর স্ত্রী অ্যালিস (এখনো প্যারিসে) বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিকাল ইকোনমির অধ্যাপক এসরা বেনাথন ছিলেন ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ নামে ব্রিটিশ বিদ্বজ্জনদের গড়া একটি সংগঠনের প্রধান নির্বাহী। তিনি এসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। তাজউদ্দীনের সঙ্গে কথা বলে স্থির হলো স্বরাষ্ট্র ও ত্রাণমন্ত্রী কামরুজ্জামান তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। সোহরাওয়ার্দী অ্যাভিনিউতে প্ল্যানিং সেলের অফিসে তাঁদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলো। এসরা বেনাথন বলেছিলেন যে, তাঁরা দু-চারজন শরণার্থী-শিক্ষককে ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে পারেন। আমি বলেছিলাম, এখানেই আমাদের জন্যে সাহায্য পাঠান। এসরা কিছুটা কৌতুক কিছুটা গুরুত্বভঙ্গিতে আমাকে দেখিয়ে কামরুজ্জামানকে বললেন, মন্ত্রী মহোদয়, আমরা যদি ওকে বিলেতে নিয়ে যেতে চাই, আপনারা সম্মত হবেন কিনা? কামরুজ্জামান খুব সুন্দর করে উত্তর দিয়েছিলেন : আমি জানি, বিশ্ববিদ্যালয়ই ওঁর প্রকৃত ক্ষেত্র। কিন্তু এখন আমরা জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত। একজন সৈনিক চলে গেলেও আমরা দুর্বল হয়ে যাবো। আপনি বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মানুষ। আপনার বিবেচনায় যা সংগত হবে, তাতে সহযোগিতা করতে আমাদের সরকার সবসময়ে প্রস্তুত থাকবে। এরপর আর কাউকে নিয়ে যাওয়ার কথা এসরা বলেননি। আমি

তাঁকে আরেকটি প্রস্তাব দিয়েছিলাম: যুক্তরাজ্যে যেসব বাঙালি ছাত্রের বৃত্তি পাকিস্তান সরকার বন্ধ করে দিচ্ছে, ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ যদি তাঁদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সাহায্য করেন, তাহলে উপকার হয়। আমার পরামর্শ এসরার ভালো লেগেছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে এখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবের কথা চিন্তা করে তিনি দু-একজনের হাতে সাবান, টুথপেস্ট, শেভিং ক্রিম, ব্লেড, মোজা ইত্যাদি পাঠিয়েছিলেন। আমিও তার ভাগ পেয়েছিলাম। ১৯৭৪-৭৫ সালে আমার লন্ডন-প্রবাসের সময়ে আবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল।

জন গলব্রেথের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার হয়েছিল খুব কৌতূহলোদ্দীপক। একাধারে অর্থনীতিবিদ ও কূটনীতিক—ভারতেই তিনি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন—গলব্রেথ বাংলাদেশ মিশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শরণার্থী শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলতে চান। মিশনে ড. এ আর মল্লিক, সৈয়দ আলী আহসান, খান সারওয়ার মুরশিদ, মুশারফ হোসেন, রশীদুল হক এবং আরো দু-একজনের সঙ্গে আমিও উপস্থিত ছিলাম। মিশন-প্রধান হোসেন আলী পরিচয়পর্ব সাঙ্গ করে দুপক্ষকে অবাধে আলোচনার সুযোগ দিয়ে প্রস্থান করেন। গলব্রেথ প্রথমে জানতে চান কী সংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক শরণার্থী হয়ে এসেছেন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংঘাতের সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে, ইত্যাদি। তারপর তিনি এক অদ্ভুত প্রস্তাব দিলেন : মার্কিন অর্থে পশ্চিমবঙ্গে কোথাও তাঁরা একটি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি ইন ইন্ডিয়া গড়ে দেবেন; শরণার্থী শিবির থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রকে এখানে নিয়ে আসা হবে; সকল শরণার্থী শিক্ষক সেখানে পড়াবেন—প্রয়োজন হলে দু-এক ক্ষেত্রে ভারতীয় শিক্ষকও নিয়োগ করা যাবে খণ্ডকালের ভিত্তিতে। আমাদের হয়ে সারওয়ার মুরশিদ বললেন : বাংলাদেশ এখন পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধরত; এই যুদ্ধে আমাদের প্রধান সহায় যুবশক্তি; যারা যুদ্ধ করছে, তাদের আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি না; কেউ যুদ্ধ করবে আর কেউ নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করবে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তা সংগত হবে না। তারপর বোধহয় মুশারফ হোসেন বললেন : আমরা, শিক্ষকেরাও, যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় যথাসম্ভব সাহায্য করতে চাই; এখন ঠিক নিশ্চিন্ত অধ্যাপনার সময় নয়। গলব্রেথ বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন : তোমরা রাজনীতির কথা বলছ। আমি বললাম : আমরা প্রত্যেকে রাজনৈতিক সংকটের শিকার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছি, আমরা সকলে এক চরম রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করছি ; এই মুহূর্তে রাজনীতির বাইরে কিছু চিন্তা করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। গলব্রেথ একটু থেমে বললেন : বিদ্বজ্জনদের কাছ থেকে আমি অন্যরকম প্রত্যাশা করেছিলাম—হাজার হাজার ছাত্রের শিক্ষাজীবন ধ্বংসে হয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে শিক্ষকরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নন, এটা আশ্চর্যজনক। তখন কে যেন বললেন : কোটি কোটি বাঙালির জীবন যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ বিপন্ন, তা আপনার অজানা নয়। আমাদের সম্পদ, আমাদের স্বাভাবিক আশ্রয়, আমাদের দেশ পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত শুধু শিক্ষাজীবন নয়, আরো অনেক কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা আশা করি, মার্কিন সরকারের ওপর আপনার যে-প্রভাব আছে, তা খাটিয়ে এই ধ্বংসযজ্ঞের দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটাতে আপনি সাহায্য করবেন। গলব্রেথ একটু রক্তিমাভ হলেন এবং আমাদের ধন্যবাদ জানালেন। আমরা হোসেন আলীকে ডেকে দিয়ে গলব্রেথের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

ফেরার পথে আমার মনে হচ্ছিল, সমাজ-সচেতন পণ্ডিত হিসেবে গলব্রেথের প্রতি কত না শ্রদ্ধা আমাদের ছিল! আজ মনে হলো, মুক্তিযুদ্ধ থেকে আমাদের বিরত করার সংকল্প নিয়েই তিনি এসেছিলেন। অথচ তাঁর চেয়ে খ্যাত ও অখ্যাত কত অধ্যাপক কত দেশে আমাদের সংগ্রামের সমর্থনে এই মুহূর্তে নিজেদের শ্রম ও সময় ব্যয় করছেন!

জন গলব্রেথ আরো একটি কাজ করেছিলেন। সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেন যে, স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান হতে পারে। অর্থাৎ আমরা যখন স্বাধীনতার জন্যে লড়ছি, তখন তিনি সমাধান দেখছেন এক পাকিস্তানের কাঠামোয়। তাঁর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে অজয় রায় একটি কঠোর বিবৃতি দিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫.

জুনের শেষদিকে আমরা যখন উত্তর ভারত সফর করছি— রেহমান সোবহান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে চলে আসেন কলকাতায়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে খবরাখবর-বিনিময় ছাড়াও তিনি প্রস্তাব করেন যে, বাংলাদেশ সরকারের উচিত একটা পরিকল্পনা-কমিশন গঠন করা। প্রথমটায় তাজউদ্দীন এ ব্যাপারে উৎসাহিত হননি, কেননা তাঁর মনে হয়েছিল, অমন কিছু করার সময় তখনো হয়নি। কিন্তু রেহমান নিরুদ্যম হওয়ার পাত্র নন। তিনি লিখিতভাবে তাঁর প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর হাতে দেন এবং পরিকল্পনা-কমিশনের সদস্যরূপে নিয়োগ করার জন্যে মৌখিকভাবে কয়েকজনের নামও আলোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী স্থির করেন যে, পুরোপুরি পরিকল্পনা-কমিশন গঠন না করে প্রথমে একটা পরিকল্পনা-সেল গঠন করা হোক, পরে এটাকে কমিশনের রূপ দেওয়া যেতে পারে। ব্যাপারটা এই পর্যায়ে রেখে রেহমান ইউরোপ হয়ে আমেরিকায় ফিরে যান।

প্রধানমন্ত্রী যখন মন্ত্রিসভায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন তাঁদেরও মনোভাব ছিল শীতল। বিশেষ করে, তাজউদ্দীন যেসব নাম প্রস্তাব করেন, আওয়ামী লীগের প্রতি তাঁদের আনুগত্য সম্পর্কে অনেকে নিঃসংশয় ছিলেন না। তাছাড়া, তখন তাঁদের সামনে খুবই জরুরি একটা বিষয় অপেক্ষা করছিল : জনপ্রতিনিধিদের আনুষ্ঠানিক সম্মেলন।

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত বাংলাদেশের যেসব সদস্য ভারতে ছিলেন, জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে শিলিগুড়িতে তাঁদের দুদিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। এপ্রিলে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে পরিষদ-সদস্যদের অনেকেই এমন একটা আনুষ্ঠানিক সভা আহ্বানের জন্যে চাপ দিচ্ছিলেন। যাঁরা মন্ত্রিসভার গঠন—বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী-পদে তাজউদ্দীনের অধিষ্ঠান—পছন্দ করেননি, তাঁরা ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রণী। তাঁদের চ্যালেঞ্জের মুখে অন্যেরাও

মনে করছিলেন, একবারে ফয়সালা হয়ে যাওয়া ভালো। মন্ত্রিসভার প্রতি বিরূপ অথচ প্রভাবশালী কিছু রাজনীতিবিদ—বিশেষ করে, তরুণেরা—ভারত সরকারের কাছেও গিয়েছিলেন এমন একটা সভা ডাকার ব্যাপারে যেন তাজউদ্দীনকে চাপ দেওয়া হয়, সে দাবি জানাতে। ভারত সরকার সেই-অনুযায়ী পরামর্শও দিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে। তাজউদ্দীনের জন্যে এ সভা ছিল প্রকৃতপক্ষে আস্থাভোট-লাভের ব্যাপার। তিনি কীভাবে প্রধানমন্ত্রী হলেন, এ ছিল অনেকের প্রশ্ন। প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনমাসে তিনি কী সাফল্য লাভ করলেন, এ ছিল অনেকের জিজ্ঞাসা। তিনি একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ অধিকার করে থাকবেন কিনা, তাও ছিল অনেকের প্রকাশ্য উদ্বেগের বিষয়।

সমস্ত দিকটা খুব আন্তরিকতা, যোগ্যতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে সামলে নিয়েছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। শিলিগুড়িতে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাটি *বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ-দলিলপত্র* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে (ঢাকা, ১৯৮২, পৃ ৫৩৭-৪৭) মুদ্রিত আছে, তবে পটভূমিটি জানা না থাকলে তার তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। ভাষণে তিনি বলেছিলেন যে, "আমরা যে পাঁচজন শেখ সাহেবের পাশে ছিলাম এবং যাদের কাছে কথিত, লিখিত, অলিখিত সর্বপ্রকারের দায়িত্ব বঙ্গবন্ধু দিয়ে গিয়েছিলেন", ভারতে একত্র হওয়ার পর তাঁরাই স্বাধীনতা কার্যকর করার পরিকল্পনা রচনা করেন এবং যেহেতু সকল সদস্যকে ডেকে পরামর্শ ও মতামত নেওয়ার সুযোগ সে-সময়ে ছিল না, তাই অবিলম্বে তা বাস্তবায়নের জন্য উদ্‌যোগ নেন তাঁরাই। স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার (১০ এপ্রিল) পর তিনিই তাজউদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার অর্পণ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও বঙ্গবন্ধুর পূর্বতন নির্দেশের বলে খোন্দকার মোশতাক আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত করা হয়। তিনি আরো বলেন যে, দলের সকলে দীর্ঘকাল ধরে এঁদেরকে নেতৃত্বের আসনে রেখে যে-আস্থার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে, সবার সঙ্গে পরামর্শ না করেও, নিঃসঙ্কোচে ও নির্দ্বিধায় এঁদের ওপরে সরকার-পরিচালনার ভার দেওয়া যায়। তিন মাসে সরকার আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, এ কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেন। তবে, সমালোচনার আরেকজন পাত্র, কর্নেল ওসমানীর পক্ষ সমর্থন করে তিনি কিছু কথা বলেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলামের এই ভাষণের পর বিরুদ্ধপক্ষ কিছুটা নিরস্ত হয়ে যান। তারপর তাজউদ্দীন চলতি সমস্যার স্বরূপ ও বিপুলতা, ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রকৃতি এবং নিজেদের ঐক্যবদ্ধতা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি দলীয় সাধারণ সম্পাদকের পদ ত্যাগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে এ-বিষয়ে পাকাপাকি কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

তাজউদ্দীন ফিরে এসেছেন খবর পেয়ে দু-একদিন পরে আমি থিয়েটার রোডে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সদর দরজায় বি এস এফের সদস্যেরা বাধা দিলেন। বললেন, জরুরি সভা হচ্ছে, কারো যাওয়ার হুকুম নেই। ফিরে আসছি, এমন সময়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন মেজর জিয়াউর রহমান। রাস্তার ওপরে রাখা একটা জিপের দিকে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে কুশলপ্রশ্ন করলাম। তখন জানতে পারলাম, সেক্টর-কম্যান্ডারদের সম্মেলন হচ্ছে কয়েকদিন ধরে, তাতে যোগ দিতে এসেছেন। বৈঠক ফলপ্রসূ হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বললেন, কাজ যতো হচ্ছে, সময়ের অপচয় হচ্ছে তার চেয়ে বেশি। যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি কর্নেল ওসমানী সম্পর্কে তাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য করলেন।

পরে শুনেছিলাম যে, ওই সভাতেও ওসমানীর কঠোর সমালোচনা করেন মেজর জিয়া। তিনি নাকি বলেছিলেন যে, প্রধান সেনাপতির পদ উঠিয়ে দিয়ে ওসমানীকে বরং প্রতিরক্ষামন্ত্রী করা হোক, আর সেক্টর-কম্যান্ডারদের নিয়ে একটা ওয়ার-কাউন্সিল গঠন করে যুদ্ধ পরিচালিত হোক। মেজর খালেদ মোশাররফ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সাংগঠনিক ব্যবস্থার কিছু সংস্কারের কথা বলেন। মেজর জিয়ার কথায় ওসমানী এতোই আহত হন যে, তিনি প্রধান সেনাপতির পদ ত্যাগ করে ওইদিনই প্রধানমন্ত্রীকে পত্র লেখেন। তাঁকে বুঝিয়ে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করাতে তাজউদ্দীনের একটা দিন লেগে যায়। পরে ওসমানী আরো দুবার পদত্যাগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তা প্রত্যাহার করে নেন। আমি যতোদূর জানি, এই সম্মেলনেই কর্নেল ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি রেখে লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুর রবকে সেনা-প্রধান এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খোন্দকারকে উপ সেনা-প্রধান হিসেবে নিয়োগদানের সিদ্ধান্ত হয়।

AMARBOI.COM

প্রথমে রাজনৈতিক নেতাদের এবং পরে সামরিক নেতাদের সম্মেলন শেষ হলে তাজউদ্দীন—যেমন চেয়েছিলেন, তেমন করে—পরিকল্পনা-সেল গঠনের প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় পাশ করিয়ে নেন। আমরা চারজন সদস্য নিযুক্ত হই : খান সারওয়ার মুরশিদ, মুশারফ হোসেন, স্বদেশরঞ্জন বসু ও আমি। প্রধানমন্ত্রী আমাকে ডেকে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানান এবং আমার সামনে কোনো বিকল্প রাখেননি। অতএব, জুলাই মাসে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. অজয় রায়ের কাছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব হস্তান্তর করে পরিকল্পনা-সেলে যোগ দিলাম। অজয় কিছুকাল আগে আসামে পৌঁছে চিঠি লিখেছিলেন ড. মল্লিককে। উত্তরে আমি তাঁকে কলকাতায় আসতে বলি। তিনি এসেই শিক্ষক সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

পরিকল্পনা-সেলের অফিস স্থাপিত হলো সোহ্‌রাওয়ার্দী অ্যাভিনিউর একটি বাড়ির দোতলায়। সদস্যদের মধ্যে কাজের ক্ষেত্র একরকম ভাগ হলো—রেহমান সোবহান বাইরে থেকে সাহায্য করবেন, এমন কথাও হলো। সামান্য স্টাফ পাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলো। তবে কাজ শুরু করার আগে আমাকে আবার দিল্লি যেতে হলো।

কথাটা আগে থেকেই ঠিক হয়ে ছিল। বাঙ্গালোরে ক্রিশ্চিয়ান ইনস্টিটিউট ফর দি স্টাডি অফ রিলিজিয়ন অ্যান্ড সোসাইটি নামে একটি সংগঠন আছে। তখন তার অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর ছিলেন সরল কে চ্যাটার্জি। তিনিও ছিলেন সোশ্যালিস্ট শিবিরের সহযাত্রী। কলকাতার অধ্যাপক সন্দীপ দাস এবং চট্টগ্রামের অধ্যাপক পুলিন দে-র সঙ্গে তাঁর জানাশোনা ছিল। তিনি ওই ইনস্টিটিউটের উদ্‌যোগে আগস্টের প্রথম দিকে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি সেমিনারের আয়োজন করেন। রাজনীতিবিদদের মধ্যে আমন্ত্রিত হন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী। বাইরে থেকে ডাক পড়লো আমার—বোধহয় সন্দীপ দাস ও পুলিন দে-র সুপারিশে। এ কথা মনে হলো এ কারণে যে, ওঁরা খুব চাইছিলেন, আমি যেন সেমিনারে যাই। আমার যাওয়ার সিদ্ধান্ত যখন হলো, তখন এও স্থির হলো যে, দু-চারদিন আগে গিয়ে আগেরবারের কাজের ছিন্ন সূত্রগুলো কুড়িয়ে নেবো।

দিল্লিতে আমার থাকার ব্যবস্থা হলো জনপথে লোকসভা-সদস্য ত্রিদিব চৌধুরীর সরকারি বাসভবনে। লোকসভার অধিবেশন তখন ছিল না, তাই ত্রিদিব চৌধুরী ওই বাসায় থাকতেন না, কিন্তু আর সকলেই থাকতেন। কে যে গৃহবাসী, কে অতিথি, তা নির্ণয় করা ছিল দুঃসাধ্য।

দিল্লিতে পৌঁছে আমি এক চক্কর ঘুরলাম যাঁদের কাছে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্ল্যানিং-কমিশনের সচিব অশোক মিত্র, পে-কমিশনের সদস্য ড. নীহাররঞ্জন রায়, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের পরিচালক জে পি নায়েক, ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের চেয়ারম্যান ডি এস কোঠারি, কেন্দ্রীয় পূর্তমন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিকসের তপন রায়চৌধুরী। দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিকসের অর্জুন সেনগুপ্ত খাওয়ালো মধ্যাহ্নভোজ, আর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অর্থ-উপদেষ্টা ড. অশোক মিত্র দিলেন নৈশভোজ।

ড. অশোক মিত্রের অফিস থেকে *পাকিস্তান টাইমসের* বেশ কিছু কপি সংগ্রহ করে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাতে দেশের অবস্থা খানিকটা অনুমান করতে পেরেছিলাম। বিশেষ করে আমার মনে পড়ে সম্পাদকের কাছে লেখা বিস্মৃতনাম এক ভদ্রলোকের চিঠি আর বিশিষ্ট সাংবাদিক জেড এ সুলেরির একটি রচনার কথা। পত্রলেখকের নিক্ষিপ্ত বাণের লক্ষ্য ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। এক বক্তৃতায় ভুট্টো নাকি বলেছিলেন যে, ভারত যদি পাকিস্তানের সীমানার মধ্যে প্রবেশের ঔদ্ধত্য দেখায়, তবে তার ভয়ংকর পরিণতিও ঘটবে সেখানে। পত্রলেখকের দাবি—এই বক্তব্যের জন্যে দেশদ্রোহিতার দায়ে ভুট্টোর বিচার হওয়া উচিত। কেননা, পাকিস্তানের পবিত্র ভূমিতে ভারতীয় সৈন্যেরা পদার্পণ করতে পারে, এমন অসম্ভব একটা সম্ভাবনার কথা আছে ভুট্টোর বক্তৃতায়। কোনো দেশপ্রেমিক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানির পক্ষে কি এ কথা কল্পনা করা সম্ভবপর? সুলেরির লেখার প্রধান বিষয় ছিলেন অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক। রাজ্জাক সাহেব যে আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সেই কারণে আত্মগোপন করে রয়েছেন, সেই খবর জেনে সুলেরি তাঁর লেখাটি প্রকাশ করেন। রাজ্জাক সাহেব আর তিনি ১৯৪৫ সালে এক জাহাজে বিলেতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে একযোগে পাকিস্তান-আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেছিলেন। এহেন আবদুর রাজ্জাক কী করে পাকিস্তান ভাঙার জন্যে প্রাণপণ করতে পারেন, সুলেরি তা ভেবে পাননি। তিনি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে যা পড়ানো হয় এবং যাঁরা পড়ান, তাতে পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি শিক্ষার্থীদের কোনো আনুগত্য জাগে না। তিনি অবাক হয়ে ভাবেন, পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার এতো বছর পরেও পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু শিক্ষকের সংখ্যা এতো বেশি! ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। সুলেরির প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যেকার ব্যবধান এতোকিছুর মধ্যেও আমাকে অবাক করেছিল।

সেবারে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শিক্ষক-সমাবেশে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। এঁরা অধিকাংশই ওয়াকিবহাল, সুতরাং সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়েছিলাম। তবে বেশ কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম। একটি প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে অনেক অমুসলমান আছেন, অথচ মন্ত্রিসভায় একজনও অমুসলমান নেই কেন? আমি বলেছিলাম, সরকারের তরফ থেকে কিছু বলার অধিকার আমার নেই, তবে মনে হয়, তাঁদের মনোভাব এরকম : আমরা যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়তে যাচ্ছি, সেখানে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের কথা ওঠা অসংগত; তাছাড়া যাঁরা যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরা বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নন। ড. মোহাম্মদ আইউব (এখন বোধহয় ন্যাশনাল ইউনির্ভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক) হেসে বললেন, যারা সংখ্যালঘুদের জায়গা দিতে চায় না, তারা এই যুক্তিই দেখায়। আইউব আরো জিগ্যেস করেছিলেন, তবে কি দ্বিজাতিতত্ত্বের বদলে ত্রিজাতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে? আমি বললাম, হয়তো তাই। কেননা তিনটি জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তবে আমাদের রাষ্ট্রের ভিত্তি আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ হবে—ধর্মীয় নয়।

জনপথে কয়েকদিন থাকার পরে আমার জ্বর এসে গেলো। যে-মুসলমান চিকিৎসকের কাছে সরল চ্যাটার্জি আমাকে নিয়ে গেলেন, আমি বাংলাদেশের লোক শুনে তিনি ফিস তো নিলেনই না, একটা ওষুধও দিয়ে দিলেন বিনা পয়সায়। ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে সরল আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে তুললেন। নিজামউদ্দীনের কাছে একটা ছোট ফ্ল্যাটে তিনি একা থাকতেন—তাঁর পরিবার থাকতেন কলকাতায়। রোগীর পরিচর্যা করতে সরলের নিশ্চয় ঝামেলা হয়েছিল, তবে আমি তাঁর আন্তরিক আতিথ্য কৃতজ্ঞচিত্তে উপভোগ করেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে থাকতেই পাকিস্তানের নিউইয়র্ক–মিশন এবং ওয়াশিংটন–দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিকদের—আটজন কূটনীতিক ও ছজন স্টাফের (আবুল মাল আবদুল মুহিত আগেই বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন ৩০ জুনে)—পাকিস্তান–পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য–ঘোষণার খবর পাই। এঁরা সকলে মিলে সংবাদ–সম্মেলন করেন এবং খবরের কাগজে খুব বড়ো করে এ–সংবাদ ছাপা হয়। এতে যে কতো খুশি হয়েছিলাম, তা বলা বাহুল্য। এ–খবরের প্রত্যাশায় ছিলাম। তাজউদ্দীন আমাকে জুন মাসেই বলেছিলেন যে, দূতাবাসের সবার সঙ্গে যোগাযোগ আছে; সময় হলেই তাঁরা আনুগত্য ঘোষণা করবেন।

শরীর একটু ভালো হতেই এক সন্ধ্যায় সরল চ্যাটার্জি আমাকে নিয়ে গেলেন রাজনীতিবিদ রাজ নারায়ণের কাছে। রাজ নারায়ণ ইংরেজি জানলেও হিন্দি ছাড়া কিছু বলেন না, শুনতেও চান না। সরল বারবার বলতে লাগলেন, আমি যেন হিন্দিতে তাঁর সঙ্গে কথা বলি। আমি যা হিন্দি জানি, তাতে বাজার করা চলে, কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করা চলে না। আমি ইংরেজিতে কথা বলার চেষ্টা করতেই রাজ নারায়ণ স্বয়ং আমাকে হিন্দিতে—তা যতো খারাপই হোক না কেন—বলতে আদেশ করলেন। কথাবার্তার মর্ম এই ছিল যে, তাঁদের দলের একটি সম্মেলন হতে যাচ্ছে, সম্ভবত পূর্ব পাঞ্জাবের কোনো শহরে। সেখানে তাঁরা বাংলাদেশের বিষয়ে আলোচনা করবেন—আমি যেন উপস্থিত থাকি। আমি অকপটেই বললাম, রাজনৈতিক দলের সভায় যেতে পারবো না। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, তোমাকে তো আমাদের দেশীয় রাজনীতিতে জড়াতে চাইছি না যে তুমি ভয় পাচ্ছো। আমরা তোমাদের বিষয়ে কথা বলবো, তখন তুমিও তোমাদের সম্পর্কে বলবে। আমি তাঁর কথায় সম্মতি প্রকাশ না করায় তিনি বিরক্ত হলেন, তাঁর পারিষদেরা গেলেন চটে। ওঁরা বললেন, মিজানুর রহমান চৌধুরী যেতে রাজি হয়েছেন। আমি বললাম, তাহলে তো আমার উপস্থিতির কোনো প্রয়োজনই হবে না।

ওই সম্মেলনে গিয়ে মিজানুর রহমান চৌধুরী কেমন বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েছিলেন, সে কথা পরে জেনেছিলাম। সম্মেলনে বক্তৃতা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে রাজ নারায়ণ (বা তাঁর দলের নেতাদের কেউ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা ভারতের স্বীকৃতি চান কিনা? এর যা স্বাভাবিক উত্তর, মিজানুর রহমান চৌধুরী তাই দিয়েছিলেন—অবশ্যই চাই। এই কথার সূত্র ধরে রাজ নারায়ণ বক্তৃতায় বলেন, বাংলাদেশ স্বীকৃতি চায়, আর ইন্দিরা গান্ধী এ–কথা সে–কথা বলে স্বীকৃতিদান এড়িয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে কি বাংলাদেশের প্রকৃত বন্ধু বলা যায়? ওই সম্মেলনে এসব কথাবার্তা নিয়ে ভারত সরকার নাকি বাংলাদেশ সরকারের কাছে এই মর্মে নোট পাঠান যে, এতে করে তাঁরা বিব্রত হচ্ছেন।

সরল চ্যাটার্জির বাসায় একটু একটু করে আমার প্রবন্ধ লিখতে লাগলাম।

বিষয়—কনফ্লিক্টস অন কালচারাল প্লেন। সেমিনারের আগে তা দেওয়া হলো টাইপ করতে। কিন্তু কী যে হলো, সেমিনারের দিনে না পেলাম টাইপ–করা কপি, না পেলাম পাণ্ডুলিপি। শেষ পর্যন্ত মুখে মুখে বললাম, কোনো নোট ছাড়াই। ভূমিকায় বললাম, লেখাটা জনসমক্ষে উপস্থাপনের যোগ্য নয় বুঝতে পেরেই টাইপিস্ট তা লুকিয়ে ফেলেছে; এখন মৌখিক উপস্থাপন তো আরো মারাত্মক হবে। আমার অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন নীহাররঞ্জন রায়। তিনি বললেন, লেখাটা ভালো লাগায় টাইপিস্ট বোধহয় ওটা কাছছাড়া করতে চাইছে না। অপর অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন অম্লান দত্ত। মিজানুর রহমান চৌধুরী উদ্বোধনী–অধিবেশনে মৌখিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেমিনারটাকে খ্রিষ্টানদের সমাবেশ বলে ভুল করেছিলেন, এই যা। দুই অধিবেশন মিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন জয়ন্তকুমার রায় (তখন দিল্লির ইনস্টিটিউট অফ ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসেসের গবেষক, এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), সন্দীপ দাস, ওম প্রকাশ দীপক (হিন্দি *সোসালিস্ট* পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক), মিসেস কার্কি হাসান ও শিশির গুপ্ত (উভয়েই জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের)। সরল চ্যাটার্জি তো ছিলেনই। ১৯৭২ সালে প্রবন্ধগুলো মাদ্রাজ থেকে *প্রোফাইল অফ বাংলাদেশ* নামে প্রকাশিত হয়। সেমিনারের শেষ পর্যন্ত আমার থাকা হয়নি। তার আগেই কলকাতার পথে রওনা হয়ে যেতে হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬.

কলকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র আমার পূর্বপরিচিত বা আত্মীয় অনেকে ছিলেন, কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন না, তাঁদের সঙ্গে সাধারণত আমার যোগাযোগ হয়নি। ব্যতিক্রম যে ছিল না, তা নয়। যেমন, যাঁদের আশ্রয়ে ছিলাম, তাঁরা। ফুপা ফজলুর রহমান চৌধুরী মুক্তবুদ্ধির মানুষ, ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে মানবিক পরিচয় তাঁর কাছে বড়ো। পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর কোনো মোহ ছিল না, আমাদের দুর্দশাও তাঁর সহানুভূতি জাগিয়েছিল। সে-সহানুভূতি তাঁর ছোট ভাই হাবিব ও সানু এবং ছেলেমেয়ে ইমি ও সানির মধ্যেও ছড়িয়ে গিয়েছিল। তবে ফুপা ছিলেন কংগ্রেসবিরোধী, তাঁর সমর্থন ছিল জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং বিরোধী দলের কোনো কোনো নেতার প্রতি—যাঁরা পরে জনতা দলে যোগ দিয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীকে তিনি খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন না এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমাদের সরকারের সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা তিনি বিজ্ঞতার পরিচয় বলে মেনে নেননি। ব্যারি মরিসনের উদ্‌যোগের ফলে ক্যানাডা কাউনসিল থেকে টাকা পাওয়ার পরে—বোধহয় অক্টোবর মাসে— যখন স্থির করলাম যে, এবারে বাসা ভাড়া করে থাকবো, তখন ফুপা অন্যত্র যেতে নিষেধ করেছিলেন—যদিও আমরা দুই পরিবার সঙ্গে থাকায় তাঁদের অসুবিধে কিছু কম হচ্ছিল না। বাসা ভাড়া করার চেষ্টা অবশ্য সফল হয়নি, কেননা বাংলাদেশের লোককে বাড়িভাড়া দিতে মালিকেরা ভরসা পেতেন না— এমন কি, উপযুক্ত জামিনদার থাকলেও তাঁদের মন গলছিল না। তাই ফুপার কথা মানতেই হয়েছিল। তিনি শুধু একবারই রাগ করেছিলেন আমাদের ওপরে। বাংলাদেশ মিশনের সূত্রে একদিন *আনন্দবাজার পত্রিকায়* এই মর্মে খবর বেরিয়েছিল যে, কলকাতার একজন রাজনীতিবিদ এবং আরো দুজন বাসিন্দা পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন থেকে নিয়মিত টাকা পেতেন। এঁরা সকলেই ছিলেন মুসলমান। খবর পড়েই ফুপা রাগ করে আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছিলেন : 'তোমরা কি আমাদের টিকতে দেবে না? এরকম তথ্য দেবার ইমপ্লিকেশন এখানকার মুসলমানদের জন্য কী হতে পারে, তা তোমরা একবারও ভেবে দেখলে না?' ভাগ্যক্রমে তেমন কিছু ঘটেনি, তবে সেই রাজনীতিবিদকে ধরে নিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। কিন্তু পুলিশের হাতে তো কোনো সাক্ষাৎ প্রমাণ ছিল না, তাই তাঁর কিছুই হয়নি। বরঞ্চ পরবর্তীকালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী হয়েছিলেন।

ছোটফুপু সালমা চৌধুরী ছিলেন সর্বংসহা। তাঁদের আয় অঢেল ছিল না। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সঙ্গে সংসার চালাতেন তিনি। আমরা যাওয়ায় তাঁর বাড়তি নৈপুণ্য প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়েছিল, তাতে তিনি ব্যর্থ হননি। কলকাতার কিংবা বাংলাদেশের যাঁরা আমার কাছে আসতেন, তাঁদেরকেও চা খাওয়াতে তিনি কার্পণ্য করেননি কখনো। তাঁর সম্পর্কে সুবা ভাই একটা কথা বলেছিলেন, সেটা উদ্‌ধৃতিযোগ্য, তবে তার আগে সুবা ভাইয়ের অবস্থার কথা একটু বলা দরকার।

আগরতলায় বাংলাদেশের আঞ্চলিক প্রশাসনে তিনি চাকরি পেয়েছিলেন, তা আগে বলেছি, তবে সেখানে খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। আমরা চলে আসার পরে ড. মল্লিক, সৈয়দ আলী আহসান ও মোহাম্মদ শামসুল হক কলকাতায় চলে এলেন পরিবার নিয়ে। রশীদুল হক সপরিবারে চলে গেলেন শ্বশুরবাড়ি বর্ধমানের কুসুমপুরে—সেখান থেকে মাঝে মাঝে একা কলকাতায় এসে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। মা ও স্ত্রীকে নিয়ে ওসমান জামাল আশ্রয় নিলেন দমদমের উত্তরে এক বন্ধুর বাড়িতে। এই অবস্থায় সুবা ভাই জুলাই মাসে স্ত্রী ও সন্তানদের গৌহাটিতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে কলকাতায় বদলি হওয়ার চেষ্টায় থাকলেন। সংস্থাপন-সচিব নূরুল কাদেরের কাছে সেজন্যে আমিও তদবির করতে লাগলাম। সেপ্টেম্বরের শেষে কিংবা অক্টোবরের গোড়ায় সুবা ভাই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহকারী সচিব হিসেবে বদলি হলেন, তবে, থিয়েটার রোডে নয়, তাঁর অফিস হলো অন্যত্র। ডিসেম্বরে, যুদ্ধের সময়ে, তাঁকে নাইট ডিউটি করতে হতো অর্থাৎ, তাঁর ভাষায়, মাথার নিচে কিছু না দিয়ে সোয়েটার-ট্রাউজার পরে টেবিলের ওপরে শুয়ে রাত কাটাতে হতো। এ কথা শুনে ফুপু তাঁকে বালিশ সরবরাহ করেছিলেন। স্বাধীনতালাভের পরপরই সুবা ভাইকে কথাচ্ছলে বলেছিলাম, 'কী করে যে এতগুলো দিন কেটে গেল, টের পেলাম না।' সুবা ভাই মন্তব্য করলেন, 'তুমি টের না পেলেও ফুপু ঠিকই টের পেয়েছেন।' একথা শুনে ফুপু একচোট হেসেছিলেন।

আমাদের আরেক আত্মীয় প্রতি রোববার দুপুরে আমাদের নিমন্ত্রণ করে বিরিয়ানি খাওয়াতেন। সেইসঙ্গে একথাও বলতেন যে, পাকিস্তান ভেঙে দিয়ে আমরা ভুল করছি, বিশেষ করে এ কারণে যে, পাকিস্তান ছিল ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে একরকম রক্ষাকবচ। বেবী একদিন অসহিষ্ণুভাবে বলে ফেললো, 'তাহলে আপনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানে গেলেন না কেন?' তিনি উত্তর দিলেন যে, তাঁর আব্বা ছিলেন জাতীয়তাবাদী মুসলমান, কংগ্রেসপন্থী। মৃত্যুশয্যায় পুত্রকে তিনি ওয়াসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তিনি আর যেখানেই যান না কেন, পাকিস্তানে যেন বসবাস করতে না যান।

বেবীর এক মামা মুর্শিদাবাদের সালারে থাকতেন, সেখানে আমার নানিশাশুড়িও ছিলেন তখন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় অনেক পরে। আমার আপন খালাতো বোন হুগলিতে থাকতেন; আপন ফুপাতো ভাই (বৃদ্ধা ফুপুও) থাকতেন মেদিনীপুরে। তাঁরা আমার খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেননি, আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করিনি। কলকাতার অদূরে আমাদের পৈতৃক গ্রামে আমার বিধবা চাচি এবং তাঁর সন্তানেরা—কেউ কেউ বিবাহিত—বাস করতেন। তাঁদের পক্ষে অবশ্য আমার খোঁজ পাওয়া সম্ভব ছিল না, আমি নিজেও খোঁজ নেওয়ার কোনো উদ্‌যোগ নিইনি। একবার ভেবেছিলাম, মাতুলালয় বসিরহাট ঘুরে আসবো। কিন্তু যখন খবর পেলাম যে, যাঁর কাছে যাবো, আমার সেই মামা—মায়ের চাচাতো ভাই—ওই অঞ্চলে বাংলাদেশবিরোধী জনমতগঠনের প্রধান উদ্যোক্তা, তখন সে-বাসনা ত্যাগ করলাম। যিনি আমাকে এই সংবাদটা দেন, তিনি অবশ্য মামার পক্ষসমর্থন করে বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের রিফিউজিরা ওখানে বড়ো ঝামেলা করছে, তাই স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে তিনি নিজের দায়িত্বপালন করছেন মাত্র।

AMARBOI.COM

এই সংযোগহীনতা আত্মীয়স্বজনের ক্ষেত্রেই যে কেবল প্রযোজ্য ছিল, তা নয়। দিনের পর দিন আমি দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ে কাটিয়েছি। ওর পাশে আশুতোষ বিল্ডিংয়ে বাংলা বিভাগের অবস্থিতি। সে-সময়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বিভাগীয় অধ্যক্ষ। ঢাকায় তাঁর সঙ্গে দুবার দেখায় খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। অথচ আমি একদিনও তাঁর কাছে যাইনি, এমন কি, আশুতোষ বিল্ডিংয়ে শিক্ষকদের কমনরুমে গেলেও বাংলা বিভাগে পা দিইনি। ওই বিভাগের কোনো শিক্ষক সহায়ক সমিতির অফিসে কখনো এসেছেন বলে মনে পড়ে না।

পুরোনো ঘনিষ্ঠদের মধ্যে আমি যোগাযোগ করি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোপাল হালদারের সঙ্গে; আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক, বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক, ড. অনিমেষকান্তি পাল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিয়ে গেলেন লেনিন সরণিতে *পরিচয়*-অফিসে। সেটাই ছিল পশ্চিমবঙ্গ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশ সহায়ক পরিষদের দপ্তর। সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগেই জানতাম, অনেকদিন পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। নতুন পরিচয় হলো তরুণ সান্যালের সঙ্গে। সেদিন রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উপলক্ষে অনুষ্ঠান হচ্ছিল। আমার ডাক পড়লো, বক্তৃতা দেওয়ার বিষয়ও ওঁরা বেঁধে দিলেন : বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা। সভার শেষে *পরিচয়ে*র জন্যে লেখার দাবি জানালেন দীপেন ও তরুণ, উভয়েই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণ সান্যাল কাজটা একটু সহজ করে দিলেন। বললেন, যে-বক্তৃতা দিলাম, ওটা লিখে দিলেই চলবে। চলা সম্পর্কে যদিও আমার সন্দেহ ছিল, তবু লিখে দিলাম এবং সেটা যত্নের সঙ্গে *পরিচয়ে* ছাপা হলো।

আমাদের জীবনধারণের সমস্যা নিয়ে গোপাল হালদারের উদ্বেগের অন্ত ছিল না। আমার আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক কাজী আবদুল মান্নান তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। নিজের দুরবস্থার কথা সম্ভবত একটু অতিরঞ্জিত করেছিলেন তিনি। অগ্রজ রঙ্গীন হালদারকে বলে ড. মান্নানের একটা নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন গোপাল হালদার—খুব সম্ভব, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপরও তিনি ড. মান্নানের জন্যে হা-হুতাশ করছিলেন। আমার জন্যে কী করা যায় ভেবেও তিনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে অনেক চেষ্টায় নিরস্ত করা গেল। তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তাঁর বাসস্থানের কাছেই রমেন মিত্র ও ইলা মিত্রের বাসায়। রমেন মিত্রের তখন বয়স হয়েছে, অত সক্রিয় নন; ইলা মিত্র ভেঙে-দেওয়া বিধানসভার সদস্য, সি পি আইয়ের সক্রিয় নেতা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির যুগ্ম-সম্পাদকদের একজন।

পঞ্চাশের দশকে রমেন মিত্র যখন পূর্ব পাকিস্তানের বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির আত্মগোপনকারী নেতা, তখন তাঁকে আমি খুব ভালো করে জানতাম, কিন্তু একেবারেই ভিন্ন নামে। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সময়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন ঢাকায় আসেন এবং আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়, তখন ইলা মিত্র সদ্য কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে শিথিল পুলিশ-পাহারায় চিকিৎসাধীন। ইলা মিত্রকে সুভাষ দেখতে চাইলে আমি তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম হাসপাতালে। সুভাষ তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন *নাজিম হিকমতের কবিতা* বইটি। ইলা মিত্র তখন এত দুর্বল যে কথা বলতে পারেন না। তাঁর ইঙ্গিত অনুসরণ করে বইটি থেকে কবি দুটি কবিতাও পড়ে শুনিয়েছিলেন। এরপরে যেদিন রমেন মিত্র আমাদের বাসায় এলেন, আমি মহা উত্তেজিতভাবে ঘটনাটা বিবৃত করলাম তাঁর কাছে—ইলা মিত্র যে তাঁর স্ত্রী, তা না জেনেই। তিনিও নিতান্ত আগ্রহ নিয়ে আমার কথা শুনলেন। পরে যখন জেনেছিলাম যে, তিনিই রমেন মিত্র, তখন আমার মনে হয়েছিল যে, মায়ের কাছে মাসির গল্পের চেয়েও উৎকৃষ্ট বাগ্‌ধারা হতে পারে স্বামীর কাছে স্ত্রীর গল্প। এতদিনে, ১৯৭১ সালে, সেই স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে দেখলাম। রমেন মিত্র তো আমাকে দেখে মহা কলরব করে উঠলেন এবং ইলা মিত্রকে আমার অল্পবয়সের নানা গুণপনার পরিচয় দিতে থাকলেন। সেখানে বসে সেদিন—এবং পরেও—মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে অনেক শিক্ষাপ্রদ আলোচনা হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, এমন একজনকে ফোন করেছিলাম। গোপালচন্দ্র ল, ব্যারিস্টার অ্যাট ল—নিমতলা অঞ্চলের বিখ্যাত ল (লাহা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবারের সন্তান। ১৯৬৫তে তিনি যখন ব্যারিস্টারি পড়েন, তখন লন্ডনে তাঁর সঙ্গে আমার বেশ ভালো পরিচয় হয়েছিল। আমার ফোনের উত্তরে তিনি বললেন কলকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরিতে দেখা করতে। সেখানে গেলে তিনি প্রথমে একটা কৈফিয়ত দিলেন আমাকে তাঁর বাড়িতে যেতে বলেন নি কেন, সে-বিষয়ে। বললেন, এলাকাটায় নকশালদের আধিপত্য। পাড়ায় নতুন কাউকে দেখলে পুলিশের চর সন্দেহ করে তারা আগে সংহার করে, তারপরে পরিচয় সন্ধান করে। সুতরাং আমাকে ওই অবস্থার মধ্যে তিনি ফেলতে চান নি। গোপাল ল চা খাওয়ালেন, আন্তরিকভাবেই কথা বললেন, কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল বলে আমার মনে হলো না। তাঁর সঙ্গে পরে আর দেখা হয়নি।

খুব একজন বড়ো মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমার একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। নভেম্বরের শেষে বা ডিসেম্বরের গোড়ায় গোপাল হালদার একদিন ফোন করে বললেন, 'কাকাবাবু আপনার খোঁজ করছেন—শিগগির গিয়ে দেখা করে আসুন, ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।' কাকাবাবু মানে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। তিনি যে আমার খোঁজ করেছিলেন, তার একটা ছোট ইতিহাস আছে। ১৯৫৯ সালে আমার গবেষণার মালমসলা সংগ্রহ করতে কলকাতায় যাই এবং আতিথ্যগ্রহণ করি তখন পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনের দ্বিতীয় সচিব এনায়েত করিমের (১৯৭১এ তিনি অসুস্থ অবস্থায় ওয়াশিংটনের দূতাবাস থেকে বাংলাদেশের পক্ষ গ্রহণ করেন এবং ১৯৭২এ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র-সচিব হন)। আমার ইচ্ছে ছিল, কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে দেখা করে বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি, নজরুল ইসলাম এবং তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ লেখকদের সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করবো। আমার অভিপ্রায় জানাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে, তিনি আমাকে নিয়ে আসবেন বলে জানান মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে। এনায়েত করিমকে একথা বলায় তিনি আমাকে যেতে নিষেধ করেন এই বলে যে, পাকিস্তানি গোয়েন্দারাও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বাড়ির ওপর নজর রাখে। আমি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বলি যে, এ-অবস্থায় আমার না-যাওয়াই সমীচীন এবং তিনিও বোধহয় আমার না-যাওয়ার কৈফিয়ত হিসেবে কথাটা জানান কাকাবাবুকে। ১৯৭১ সালে আমি যে কলকাতায় এসেছি, একথাটা দেরিতে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের কানে যায়। ততোদিনে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে গেলেও কাকাবাবুর প্রতি গোপাল হালদারের শ্রদ্ধা কিংবা গোপাল হালদারের প্রতি মুজফফর আহমদের প্রীতি ও দাবি কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। গোপাল হালদারকে খবর দিলে তিনি আমাকে খুঁজে পাবেন ধরে নিয়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ফোন করেন তাঁকে; আমাকে পাঠিয়ে দেবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গোপাল হালদার তক্ষুনি খবর দেন আমাকে।

আমি যখন মুজফ্‌ফর আহমদের বাসায় গেলাম, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। পরিচয়পর্ব শেষ হতেই তিনি বিদায় নিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুজফ্‌ফর আহমদ ১৯৫৯ সালের কথাটা উল্লেখ করলেন এবং বললেন যে, এখন আর তখনকার শঙ্কা নেই বলে আমাকে খবর পাঠিয়েছেন। আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, আমারই আগে আসা উচিত ছিল, তবে এখানকার অনিশ্চয়তা ও ব্যস্ততার কারণে তা হয়ে ওঠেনি। মনে হয়, আমার কৈফিয়ত তাঁর কাছে বাহুল্য মনে হলো। তিনি আমার পারিবারিক পরিচয় জানতে চাইলেন। জবাব দিলাম, 'আমার আব্বার নাম ডা. এ টি এম মোয়াজ্জম। আপনি আমার দাদাকে চিনতেন—শেখ আবদুর রহিম।' উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আবদুর রহিম সাহেবের এক ছেলে বসিরহাটে সাইকেলে চড়ে হোমিওপ্যাথি করতেন, তিনি কি আপনার বাবা?' বললাম, 'জি।' তিনি জানতে চাইলেন, মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বেঁচে আছেন কিনা; কেননা তিনি পরস্পরবিরোধী অনেক কথা শুনেছেন। বললাম, ওঁরা উভয়েই আমার শিক্ষক এবং জীবিত, তবে দুজনেরই মৃত্যুর গুজব রটেছিল। তিনি জানালেন, মুনীর চৌধুরীর বাবা আবদুল হালিম চৌধুরীকে উনি চিনতেন, মুনীরকেও একবার দেখেছেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরীদের সঙ্গে মোফাজ্জল হায়দারের কোনো আত্মীয়তা আছে কিনা। বললাম ঠিক জানি না, তবে মনে হয়, নেই। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জামাতা কবি আবদুল কাদিরের সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথা বললাম, উনি এ-বিষয়ে তেমন আগ্রহ দেখালেন না। উনি বললেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের একজন লেকচারার বহুকাল আগে ওঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি নজরুল ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন এবং নজরুল সম্পর্কে তাঁর সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করেছিলেন। সে-ভদ্রলোকের কাজ শেষ হয়েছে কিনা জানতে চাইলেন। আমি উত্তর দিলাম, তিনি রফিকুল ইসলাম, এখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন, তবে নজরুল সম্পর্কে গবেষণার মাঝখানে তিনি আমেরিকায় যান ভাষাতত্ত্ব পড়তে। *নজরুল-নির্দেশিকা* নামে তাঁর একটি বই বেরিয়েছে, তবে গবেষণা শেষ হয়নি। মুজফ্‌ফর আহমদ বললেন, নজরুল সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথা যেহেতু এখন বই হয়ে বেরিয়ে গেছে, সুতরাং সেই পুরোনো সাক্ষাৎকার আর রফিকুল ইসলামের ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না। তাঁর সেই বই আমি দেখেছি কিনা জানতে চাইলে বললাম, আমার কাছে দুই সংস্করণই আছে, তবে তাঁর *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি* বইটি দেখা হয়নি। তিনি তাঁর বইয়ের শেলফের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওটির কপি আমার কাছে নেই, থাকলে আপনাকে দিতাম।' আমি শশব্যস্তে বললাম, 'না, না, আমি জোগাড় করে নেবো।' তিনি উঠে গিয়ে তাঁর *প্রবন্ধ-সংকলনের* একটি কপি বের করে নিয়ে আমাকে উপহার দিলেন। বললেন, *আমার জীবন* আনিয়ে আমাকে খবর দেবেন, আমি যেন এসে নিয়ে যাই। তিনি আবার যখন খবর দিলেন, তখন আমাদের যুদ্ধজয় হয়ে গেছে। আমি গিয়ে বই নিয়ে এলাম। বইতে তাঁর স্বাক্ষরের তারিখ দেখছি ২৭.১২.১৯৭১। সেদিন তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু জানতে চাইলেন, কবে দেশে ফিরবো। দুদিনের একদিনও বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো কথা হলো না।

ড. অনিমেষ পাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলেও আমার সমসাময়িক। এম এ পাশ করে তিনি ভাষাতত্ত্বে গবেষণা করেন। তারই একেবারে সূচনায় ঢাকায় এসেছিলেন। সুস্মিতা আনোয়ারের (পরে ইসলাম) সঙ্গে তাঁর আগে থেকে পরিচয় ছিল। এই সূত্রে আমার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ১৯৭১ সালে তিনি আমাকে খুঁজে বের করেন এবং আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন কলকাতার মওলানা আজাদ কলেজের ফারসির শিক্ষক ড. আবদুল সুবহানের। সুবহান বেশ সহৃদয় মানুষ—আমার যথেষ্ট খোঁজখবর নিয়েছেন। আর অনিমেষের নিমন্ত্রণরক্ষা করতে মেদিনীপুরে যেতে না পারলেও যখনই তিনি কলকাতায় এসেছেন, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি ও আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

মানুষ জীবনে কতরকম পরিস্থিতিতে পড়ে এবং কতরকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কিংবা অব্যক্ত রাখে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭.

কলকাতায় যাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সমর্থনদান এবং শরণার্থীদের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য করেছিলেন, তাঁদের কারো কারো কথা আগে বলেছি, আরো কারো কারো কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এস এম মাসুদ ছিলেন বিচারপতি সৈয়দ নাসিম আলীর পুত্র (বিচারপতি মাসুদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ মনজুর এলাহী বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং সম্প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছিলেন)। আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন তিনি বিশ্বভারতীর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতেন, তবে যতোটা মনের আনন্দে, ততোটা শ্রোতাদের জন্যে নয়। নাসিরউদ্দীন রোডে বহুফ্ল্যাট-বিশিষ্ট বিশাল পৈতৃক বাড়ি ছিল তাঁর। সেখানে শওকত ওসমানের স্থান হয়েছিল; স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে গোলাম মুরশিদ বাস করেছিলেন দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত ; ওয়াহিদুল হক ও সন্‌জীদা খাতুনও কিছুদিন সেখানেই ছিলেন। মাসুদ সাহেব যতোটা পারতেন, সময় দিতেন বাংলাদেশের মানুষের জন্যে। মনে পড়ে, আমরা যখন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি গঠন করলাম, তখন তিনি বলেছিলেন, সংগঠনের নামটা যেন ঠিক শোনাচ্ছে না। দেশে স্বাভাবিক অবস্থায় গড়া একটা সংগঠনের নাম ওরকম হতে পারে, কিন্তু এটা যে দেশের যুদ্ধাবস্থায় বিদেশে আশ্রয়লাভকারী শিক্ষকদের একটা অস্থায়ী সমিতি, এর যে একটা বিশেষ লক্ষ্য আছে, নাম থেকে তা বোঝা যাচ্ছে না। তাঁর এই সমালোচনায় যথেষ্ট যুক্তি ছিল। বাংলাদেশ শরণার্থী শিক্ষক সমিতি—এই নামটা আমরা বিবেচনা করেও বাদ দিয়েছিলাম এই ভেবে যে, এতে এমন একটা ছবি ভেসে ওঠে যেন আমরা ভিক্ষাপাত্র হাতে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছি। বিচারপতি মাসুদের সঙ্গে আগে কথা বলে নিলে হয়তো আরো জুতসই নাম পাওয়া যেতো। কিন্তু ততোক্ষণে বাণ ছুটে গেছে, তা আর নিবার্য নয়। মাসুদ সাহেবের দ্বার আমাদের জন্যে অবারিত ছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে আমার মনে হয়, তাঁর সঙ্গে বিশেষ সখ্য ছিল শওকত ওসমান, খান সারওয়ার মুরশিদ ও এ আর মল্লিকের। কয়েকবছর আগে বিচারপতি মাসুদ মৃত্যুবরণ করেন, তার কিছুকাল পরে তাঁর সম্পর্কে একটি ছোট বই লিখেছিলেন শওকত ওসমান।

গৌতম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বেসরকারি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক এবং সি পি আইয়ের সক্রিয় সদস্য। তিনিও ছিলেন ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতামহী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পৌত্রী মতিমালা দেবী (বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের কনিষ্ঠা কন্যা), আর মা মঞ্জুশ্রী দেবী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা)। গৌতমের লোকান্তরিত পিতা ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—কে পি চট্টোপাধ্যায় নামে অধিকতর পরিচিত—ছিলেন খ্যাতনামা নৃতাত্ত্বিক এবং এককালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান। গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের অধ্যয়ন ও গবেষণার বিশেষ ক্ষেত্র উনিশ শতকের বঙ্গদেশ। তাঁর স্ত্রী মঞ্জু দেবীও কোনো কলেজে ইতিহাস পড়াতেন। গৌতমদার অনুজ গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় তখন গবেষণা করছিলেন ম্যানচেস্টারে। অগ্রজের পরামর্শে তাঁর কাছে বাংলাদেশ–সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র পাঠাই। উনি সেখানে আমাদের হয়ে কিছু প্রচার চালিয়েছিলেন। দেশে গৌতম ও মঞ্জু দেবী প্রায় সর্বক্ষণ ব্যয় করেছিলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের জন্যে। তাঁদের প্রধান কাজই ছিল কখনো অর্থ, কখনো খাদ্য, কখনো বস্ত্র, কখনো অন্য কিছু নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ–শিবিরে পৌঁছে দিয়ে আসা এবং তাদের কী প্রয়োজন তা জেনে এসে তা সরবরাহ করা। আমি নিজে কখনো এরকম দরকারি কাজ করতে সমর্থ হইনি বলে মনে মনে লজ্জিত হতাম, যদিও গৌতমদার কথায় কখনো আত্মশ্লাঘার প্রকাশ দেখি নি। এসব শিবিরের তরুণ যোদ্ধাদের যেসব বিবরণ তিনি সোৎসাহে দিতেন, তা আমাদেরও অনুপ্রাণিত করতো। এমন দুটি ঘটনা আমার পক্ষে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

গৌতম চট্টোপাধ্যায় গিয়েছিলেন যে–শিবিরে, তাতে বছর বারো বয়সের এক মুক্তিযোদ্ধা ছিল। ক্যাম্প–কমান্ডান্ট তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, ও–ই ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে কমবয়সী মুক্তিযোদ্ধা। বয়সোচিত নিরীহ চেহারা, কিন্তু নির্দিষ্ট লক্ষ্যে দ্রুত ও অব্যর্থ গ্রেনেড ছোঁড়ায় তার জুড়ি নেই। নিতান্ত মলিন বসনে ছেলেটি বসে ছিল জানলার ধারে। আসলে সেদিনই সে ফিরে এসেছে একটা অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন করে, তবে তা বোঝার উপায় নেই। গৌতম তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আবার যখন আসবেন, তখন কী নিয়ে আসবেন তার জন্যে। তিনি জানতেন, এরা ভালো খেতে পায় না, এদের জুতো–জামা যথোপযুক্ত নয়। তাই ভেবেছিলেন, ওরকম একটা অভাবপূরণের ব্যবস্থা করবেন। ছেলেটি প্রথমে কিছুই বলতে চায় না, পরে তাঁর পীড়াপিড়িতে লাজুক মুখে বললো : ‘আমাদের ক্যাম্পের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রানজিসটরে স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রোগ্রাম ভালো শোনা যায় না। যদি একটা ভালো ট্রানজিসটর—।' গৌতমদা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, ঘটনাটা আমার কাছে বলার সময়ে তাঁর দুচোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছিল : 'জামা নয়, কাপড় নয়, খাবার নয়, চাইলো একটা ট্রানজিসটর রেডিও—স্বাধীন বাংলার অনুষ্ঠান শোনার জন্যে! যে দেশে এমন ছেলে জন্মায়, সে দেশ স্বাধীন না হয়ে পারে না।'

দ্বিতীয় ঘটনাও এরই অনুরূপ। আরেক ক্ষেত্রে গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের চাপাচাপিতে এক মুক্তিযোদ্ধা নতমুখে চেয়েছিল জীবনানন্দ দাশের *রূপসী বাংলার* একটি কপি। গৌতমদার বিস্ময় ও উচ্ছ্বাস, প্রশংসা ও আস্থার শেষ হয় না। যাদের মধ্যে এমন আত্মত্যাগের মনোভাব, এমন স্বার্থশূন্যতা, দেশের ও সংস্কৃতির জন্যে এতো ভালোবাসা, অধীনতার শৃঙ্খলে তাদের বেঁধে রাখতে পারবে কে? তাঁর কর্মস্পৃহা আরো বেড়ে যায়। কথা শেষ করে ঝোলা কাঁধে তিনি বেরিয়ে পড়েন—ওদের জন্যে আরো কী করতে পারা যায়, তার খোঁজে। আমাকে শুধু বলে যান : 'বাসায় এসো কিন্তু।' পাম প্লেসে, মার্বেল পাথরে কেবল পিতার নামখচিত বড়ো বাড়িতে, থাকেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়। আমার আস্তানা দিলখুশা স্ট্রিট থেকে দূরে নয়। তাঁর বাড়িতে ঢুকলে আরামও পাওয়া যায়, তিন পুরুষের পুস্তকসংগ্রহ দেখে সময় কাটে ভালো। কিন্তু ভালো কাটাবার মতো সময় আমার হাতেও বা কই! যতোবার যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিই, ততোবার রাখা হয় না।

শান্তিময় রায় সি পি আইয়ের প্রবীণতর সদস্য। দীর্ঘকাল ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্যে কাজ করাই হয়েছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। ইন্ডিয়ান কাউনসিল ফর ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশনে বড়োরকম দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে, আর স্বাধীনতা-সংগ্রামে মুসলমানের অবদান-বিষয়ে বই লিখেছিলেন ইংরেজি ও বাংলায়—মুসলমানেরা সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদপুষ্ট, এ ভুল ভাঙাতে। ১৯৭১এ তিনি দিনরাত এক করে ফেললেন। বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীর বেশির ভাগই হিন্দু। যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে ব্যর্থ হলে তাদের প্রতি কৃত অত্যাচার শুধু সাম্প্রদায়িক মনে হবে। ভারতে সাম্প্রদায়িক শক্তি যেন মাথা তুলে উঠতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই বয়সেও তাঁর ছোটাছুটি অবিশ্রাম। যাচ্ছেন শরণার্থী শিবিরে, সেখানকার কোনো দুরবস্থার প্রতিকার খুঁজতে আবার দৌড়োচ্ছেন সরকারি দপ্তরে। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন একদিকে, আবার কোনো সাহায্যপ্রার্থী এসে উপস্থিত হলে তার জন্যেও করছেন যথাসাধ্য।

গৌরী আইয়ুবের খানিকটা যোগ ছিল অসহায় শিশুদের জন্যে মৈত্রেয়ী দেবী যে-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার সঙ্গে। সেখানে একদিন গিয়েছিলাম। বাংলাদেশের কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির কথায় সেদিন মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন মৈত্রেয়ী দেবী। হাতের কাছে আমাকে পেয়ে সেই সূত্রে যা বলেছিলেন, তা মধুর ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে ওদিকে আর পা বাড়াইনি। কিন্তু দেখা হওয়ামাত্র গৌরীদির সঙ্গে সেই যে হৃদ্যতা হয়েছিল, তা আজো অক্ষুণ্ন আছে। আবু সয়ীদ আইয়ুব বোধহয় তখন সিমলার ইন্ডিয়ান ইন্‌সটিটিউট অফ অ্যাডভান্‌স্‌ড স্টাডিজে কাজের মেয়াদ শেষ করে সদ্য কলকাতায় ফিরে এসেছেন, তাঁর শরীর ভালো নেই। অসুস্থ স্বামীকে দেখাশোনা করতে বেশ কিছু সময় যেতো গৌরী আইয়ুবের। তারপর যতোটা পারতেন, বাংলাদেশের কাজে সময় দিতেন। একদিকে নারী ও শিশুদের দিকে লক্ষ্য রাখতে চাইতেন তিনি, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্যে ছিলেন খুবই সচেষ্ট। তাঁর আমন্ত্রণে আইয়ুবের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলাম একদিন, কিন্তু সে আলাপ একেবারেই জমে নি। কথাবার্তার প্রায় প্রথম দিকেই আইয়ুব জানতে চেয়েছিলেন, দেশ ছাড়ার আগে কী নিয়ে কাজ করছিলাম আমি। বললাম, *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার* নতুন সংস্করণের জন্যে দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্য-বিষয়ে লেখার দায়িত্ব পেয়েছিলাম, সেটাই রচনার চেষ্টায় ছিলাম। মনে হলো, কথাটা আইয়ুবের বিশ্বাস হলো না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি সংস্কৃত জানি কিনা এবং দক্ষিণ এশিয়ার আধুনিক ভাষাই বা কটা জানি। তাঁর মনোভাব বুঝেই আমি বললাম যে, বাংলা ও ইংরেজি ছাড়া কোনো ভাষাই আমার আয়ত্ত নয়; এমন একটা ভুক্তি লেখার যোগ্য আমি নই; তবে আমি বছরখানেক শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম এবং এখন ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা* বের হয়; সম্ভবত সেখানকার প্রভাবশালী কোনো অধ্যাপক স্নেহাধিক্যবশত অপাত্রে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন ; এবং আমিও এমন একটা ভুবনবিখ্যাত ক্ষেত্রে স্বাক্ষর রাখার লোভ সামলাতে না পেরে সম্মত হয়ে গেছি। এতেও তাঁর প্রত্যয় উৎপাদন করতে সমর্থ হলাম বলে মনে হলো না। ফলে বাকি সময়ে কথা যা হলো, তা নিতান্ত সৌজন্যসূচক এবং আড়ষ্ট।

বিষ্ণু দে-র সঙ্গে আলাপের সুরটা ছিল বরং এর উলটো। আমার পরিচয় পাওয়ামাত্র তিনি বললেন : 'আপনার একটা কবিতা আমার সংকলনে নিয়েছি।' পাঠকের কাছে এ কথাটা অতিরঞ্জিত মনে হবে, তাই একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। একুশে ফেব্রুয়ারি-উপলক্ষে লেখার দাবি মেটাতে একবার সুরেলা গদ্যে দুটি ছোটো রচনা তৈরি করি। তার একটা প্রকাশ পেয়েছিল আবদুল মোমেন (এখন ডক্টর এবং বস্টনের মেরিম্যাক কলেজের অধ্যাপক)-সম্পাদিত সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের ছাত্রদের কোনো সংকলনে। আমার পাণ্ডুলিপির ছত্র অনুসরণ করে তা মুদ্রিত হয়, ফলে কাটাকুটি বাদ দিয়ে ছেপে তার চেহারাটা দাঁড়ায় কবিতার মতো। এটা পুনর্মুদ্রিত হয় মিহির আচার্যের *পূর্ব বাংলার কবিতা* সংকলনে এবং সেখান থেকে বিষ্ণু দে গ্রহণ করেন তাঁর সম্পাদিত *বাংলাদেশের কবিতায়* (বইটা আমার দেখা হয়নি)। জনান্তিকে বলে রাখি, ওই 'কবিতা'র দুটি ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন ভারতে পৃথ্বীশ নন্দী এবং নিউজিল্যান্ডে প্রকাশিত একটি সংগ্রহে পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরাসিতে অনুবাদ করেন পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অনুবাদকদের নামের মিল লক্ষণীয়) এবং তাঁর সম্পাদিত *পোয়েমস দু বাংলাদেশ* (প্যারিস, ১৯৭৪) গ্রন্থে তা সংকলিত হয়, আর প্যারিস থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের কবিতার একটি রেকর্ডে তা আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট এক ফরাসি অভিনেতা। আমার আর কোনো রচনার ভাগ্যে এমন সমাদর জোটেনি। যা হোক, বিষ্ণু দে আমার কবিতার উল্লেখ করতেই আমি জড়োসড়ো হয়ে বললাম, আমি কবিতা লিখি না। তারপর উনি যখন বললেন, 'কেন, আমি তো ছেপেছি' (উনি বোধহয় মুহূর্তের জন্যে ভাবছিলেন একই নামের ভুল লোককে বলছেন কিনা), তখন মনে হলো, কোনটা কবিতা আর কোনটা কবিতা নয়, তা তাঁকে বলা অন্তত আমার সাজে না। বিষ্ণু দে খুব আন্তরিকভাবে কথা বলেছিলেন। তাঁর কাছেই জানতে পারি যে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ইংরেজি রচনার সংকলন *(দি ওয়র্লড অফ টোয়াইলাইট,* কলকাতা, ১৯৭০) বেরিয়ে গেছে এবং এডওয়র্ড ডিমক ও আমি মিলে সুধীন্দ্রনাথের যে-দুটি প্রবন্ধ অনুবাদ করেছিলাম, তা সে-বইতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (কলকাতার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসে গিয়ে এরপরে বইটি নিয়ে এসেছিলাম)। পরে আরেকদিন যখন তাঁর বাসায় যাই, তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ, তাই বেশি কথা হয়নি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নৈতিক সমর্থন থাকলেও তার কাজে বিষ্ণু দে জড়িত হন নি, জড়িত হয়েছিলেন তাঁর পুত্র জিষ্ণু। আসলে দুবারই ও-বাড়ি গিয়েছিলাম জিষ্ণুরই কাছে। বিষ্ণু দে-র জামাতা ভূগোলবিদ্ সত্যেশ চক্রবর্তীও আমাদের কিছু অ্যাকাডেমিক কাজের উদ্‌যোগের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন। সত্যেশ চক্রবর্তী ঢাকার মানুষ, বাংলা বলতে সর্বদা ঢাকার উপভাষায় কথা বলতেন এবং তাতে বিশেষ গর্ববোধ করতেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক অরুণ দাশগুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রী দর্শন ও মনস্তত্ত্ববিদ্ মানসী দাশগুপ্ত (তাঁর *রবীন্দ্রনাথ : এক অসমন্বিত দ্বন্দ্ব* বইটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে) ছিলেন আমাদের সহায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক আলী আনোয়ার সপরিবার অনেকদিন ছিলেন তাঁদের বাড়িতে।

ব্যারিস্টার সুব্রত রায়চৌধুরীর বাড়িতে উঠেছিলেন অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম। তাঁর কলকাতায় পৌঁছোনোর সংবাদ প্রথম পাই *স্টেটসম্যান*-এ। তাতে তাঁকে অভিহিত করা হয়েছিল, ঢাকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত উপাচার্য (ভাইস-চান্সেলর ডেজিগনেট অফ দি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ইন ঢাকা) বলে। দেখা হলে তাঁর কাছে আমি বিষয়টা পরিষ্কার করে নিতে চাই। তিনি বলেছিলেন যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে তিনি নিয়োগলাভ করেছিলেন, তবে অসহযোগ আন্দোলনের কারণে ওই পদে যোগদান করেন নি। অচিরেই তিনি বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির অন্তর্ভুক্ত হন। এই সূত্রেই শরণার্থী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিবিরে ফোকলোর–সংগ্রহের একটি প্রকল্প তিনি হাতে নেন, সেকথা আগে বলেছি। সুব্রত রায়চৌধুরী কেবল তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তা নয়, বাংলাদেশ সরকারকে আন্তর্জাতিক আইন–সংক্রান্ত নানা পরামর্শও দিয়েছিলেন। তার ওপরে, আইনের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে একটি গ্রন্থ–রচনায়ও তিনি এ সময়ে হাত দেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর লেখালেখির কাজে সহায়তা করার জন্যে তিনি আমাদের সহকর্মীদের কাউকে কাউকে নিযুক্ত করেছিলেন। চট্টগ্রাম (এখন ঢাকা) বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের শিক্ষক মোহাম্মদ আবু জাফর ছিলেন তাঁদের একজন। সুব্রত রায়চৌধুরীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পূর্বতন চিফ পাইলট আমিনুর রহমানের এবং তাঁর পুত্র (পরবর্তীকালে ব্যারিস্টার) তওফিক নওয়াজের।

আরো অনেকের কথা মনে পড়ে। রঘুবীর চক্রবর্তী ছিলেন কোনো কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। বোধহয় সোশালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের সঙ্গে তাঁর কিছু যোগাযোগ ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তিনি একটি প্রবন্ধ–সংকলন প্রকাশ করেন। তার জন্যে আমাকে ফরমাশ দিয়ে 'রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও বাংলাদেশ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়ে নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনাসভার উদ্‌যোগের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল এবং তিনি সেখানে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বক্তৃতা দেওয়াবার জন্যে। তিনি আমাকে নান্দীকারের *তিন পয়সার পালা* দেখাতে নিয়ে যান—এটি ছিল ব্রেশটের *থ্রি–পেনি অপেরার* বাংলা ভাষ্য। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সিনেমা–থিয়েটার–সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্যে এই একটিতেই শুধু গিয়েছিলাম। বেবী যায় নি। তার প্রতিজ্ঞা ছিল, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত কোনো বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে যাবে না।

ব্যক্তিগতভাবে আমাদের খুব খোঁজখবর করেছিলেন প্রণবরঞ্জন রায়। তাঁর কথা আগেও বলেছি। তাঁর বন্ধু তরুণ মিত্র ছিলেন আমেরিকান ইন্‌সটিটিউট অফ ইন্ডিয়ান স্টাডিজের কলকাতা দপ্তরের সচিব। আই আর সি–র বেশির ভাগ প্রকল্পের সঙ্গেই ওই সুবাদে তিনি যুক্ত ছিলেন। সমষ্টিগতভাবে আমরা তাঁর আনুকূল্য লাভ করেছি।

শরণার্থী–জীবনে মানুষের আনুকূল্য পাওয়াটা যে কতো মূল্যবান, সে কথা বিশেষ করে অনুভব করেছিলাম আকিয়াব থেকে আমার ছাত্র আবদুল আউয়ালের চিঠি পেয়ে। ১৯৭১ সালে আউয়াল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম এ পরীক্ষা দিচ্ছিল। সে ছিল ছাত্র ইউনিয়নের একনিষ্ঠ কর্মী। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সে চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে নিজের এলাকায় চলে যায়, তারপর অবস্থাবৈগুণ্যে সীমান্ত পার হয়ে বার্মায় আশ্রয় নেয়। সেখানকার মাটিতে পা দেওয়ামাত্র পুলিশ তাকে—এবং তার মতো আরো অনেক শরণার্থীকে—ধরে নিয়ে ক্যাম্পের মতো একটা অস্থায়ী জেলে আটক করে রাখে। তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল নিতান্ত অপ্রতুল, খাবার পানির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে অনেক সময়ে নির্ভর করতে হতো বৃষ্টির ওপরে। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করা ছিল একেবারে নিষিদ্ধ। আকিয়ারের মংডাউ এলাকার এক ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ইকবাল হোসেনের আনুকূল্যে সে মুক্তিযুদ্ধের কিছু খবর সংগ্রহ করতে এবং আমার কাছে চিঠি লিখতে সমর্থ হয়। তাদের ঐ বন্দিজীবন থেকে মুক্তিলাভের ব্যাপারে আমরা কিছু করতে পারি কিনা, এ ছিল আউয়ালের প্রধান জিজ্ঞাসা। এই সংকটের বিষয়ে আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি, কিন্তু বার্মা সরকারকে প্রভাবান্বিত করার কোনো সম্ভাবনা তখন তিনি দেখতে পান নি। অনেক পরে আউয়ালেরা ছাড়া পেয়েছিল।

আউয়ালের চিঠি পাওয়ার পরে বিশেষ করে মনে হয়েছিল, আমরা কতো ভালো আছি। কতোজনের আন্তরিক ভালোবাসা ও অকৃত্রিম সমর্থন আমাদের ঘিরে রেখেছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮.

দ্বিতীয়বার দিল্লি থেকে ফিরে আসার পর খবর পেলাম, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী কলকাতায় এসে পৌছেছেন। সেদিনই সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ছুটলাম শিয়ালদা স্টেশনের উল্টোদিকে হোটেল পূর্বরাগ নামে একটি ছোট হোটেলে। অত্যন্ত বিষণ্ন চেহারা। যদিও তিনি নিজের জীবনের আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তবু পরিবার-পরিজন নিয়ে চলে আসতে পারছিলেন না, আবার তাঁদের ফেলেও আসতে তাঁর মন চাইছিল না। এই অবস্থায় তাঁকে একাই একরকম জোর করে ঠেলে পাঠিয়েছিলেন তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা। নিঃসঙ্গ উদ্বাস্তু জীবনে একটা সাধারণ হোটেলের অনাত্মীয় পরিবেশে বিষণ্ন না হওয়াই আশ্চর্যের বিষয় হতো। তবে তাঁর বিষণ্নতার মাত্রা বোঝাবার জন্যে একটা ঘটনার কথা বলি। সেবার ঈদের দিনে সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হোটেল পূর্বরাগে যাই। ঘরের দরজা খুলে দিয়ে তিনি আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আমি যাওয়ার আগে থেকেই তিনি কাঁদছিলেন, আমি যাওয়ার পরেও নীরব অশ্রু তাঁর বালিশ ভিজিয়ে দিচ্ছিল।

মোজাফফর সাহেব আসার পরে আমাদের প্ল্যানিং সেল উন্নীত হলো প্ল্যানিং কমিশনে (যদিও কাগজপত্রে প্রায় শেষ পর্যন্ত প্ল্যানিং সেল নামটাও চলেছিল) এবং তিনি তার সভাপতি নিযুক্ত হলেন। আমাদের কাজের এক ধরনের ভাগ আগেই হয়ে ছিল, এবারে তাঁর জন্যে কিছু নতুন দায়িত্ব ধার্য করা হলো। বিন্যাসটা হলো মোটামুটি এরকম : মোজাফফর আহমদ চৌধুরী রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও লোকপ্রশাসন সম্পর্কে কাগজপত্র তৈরি করবেন; খান সারওয়ার মুরশিদ করবেন সামাজিক দিকটা নিয়ে—বিশেষ করে, মুক্তিযোদ্ধাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও নির্যাতিতা মহিলাদের পুনর্বাসন-সম্পর্কিত পরিকল্পনা করা হবে তাঁর দায়িত্ব; মুশারফ হোসেন দেখবেন অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকটা; স্বদেশরঞ্জন বসু অভ্যন্তরীণ ব্যবসা ও বহির্বাণিজ্য

নিয়ে কাজ করবেন; আর শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করবো আমি।

প্রথমে মনে করা হয়েছিল যে, আমরা দুটি পরিকল্পনা তৈরি করবো : একটি স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা—দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা বাস্তবায়িত হবে; আরেকটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা—যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি ও ভৌত কাঠামো সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার করে নতুন পরিকল্পনা প্রণয়নের মতো অবস্থা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তা প্রয়োগযোগ্য হবে। এখন সিদ্ধান্ত হলো, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রের প্রতিশ্রুতি, দলীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এর মধ্যে ঘোষিত নীতি ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচনা করবো; এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় খাপ খায় এমন একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে—এর লক্ষ্য হবে জাতীয় অর্থনীতি ও জীবনধারার পুনর্গঠন; আর দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হবে এমন একটি স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাও তৈরি করবো। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় যেসব বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার কথা তার মধ্যে ছিল : শরণার্থীদের পুনর্বাসন; দেশের অভ্যন্তরে যাঁরা ঘরবাড়ি হারিয়েছেন কিংবা নিজের এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের পুনর্বসতি; সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের যথাসম্ভব অব্যাহতিদান (ডিমবিলাইজেশন) এবং অপেশাদার তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের শিক্ষাক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনা কিংবা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা; আইনশৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা; খাদ্য, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান; যোগাযোগ-ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার; বন্দর এবং কল-কারখানা চালু করা; ব্যবসা ও বাণিজ্যের পুনঃপ্রচলন; রাষ্ট্রায়ত্তকরণের নীতি অনুসরণ করে ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করা; এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন করে কাজ আরম্ভ করা।

AMARBOI.COM

আমি নিজে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় হাত দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলাম না। আমার মনে হয়েছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আশু সমস্যাগুলো সমাধান করার পরিকল্পনা-গ্রহণই হওয়া উচিত আমাদের কাজের সীমানা। দেশে স্বাভাবিক অবস্থা যখন ফিরে আসবে, তখন সরকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা-প্রণয়নের উদ্‌যোগ নিতে পারবেন। তবে তিনটি পরিকল্পনা-প্রণয়নের সিদ্ধান্ত ছিল রাজনৈতিক—তা গৃহীত হয়েছিল মন্ত্রিসভা-পর্যায়ে।

মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরিকল্পনা-কমিশনের আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়েছিল মাত্র একদিন। মন্ত্রিসভার সদস্যেরা ছাড়াও তাতে উপস্থিত ছিলেন প্রধান সেনাপতি। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের বিষয়ে কর্নেল ওসমানী খুব উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, তাতে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। তিনি একাধিকবার আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করছিলেন মিশরে তুলো-জাতীয়করণের দৃষ্টান্ত। কর্নেল ওসমানীর আরো একটি কথা আমার খুব ভালো লেগেছিল। ইসরাইলের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশে স্থায়ী সেনাবাহিনীর (স্ট্যান্ডিং আর্মি) আকার হওয়া উচিত খুব ছোট, তবে সামরিক শিক্ষা হওয়া উচিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকল নাগরিকের জন্যে অত্যাবশ্যক। এ ধরনের ব্যাপক সামরিক শিক্ষা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্যে হানিকর কিনা, তা নিয়ে খানিকটা আলোচনা হয়েছিল, তবে, মোটের উপর, কর্নেল ওসমানীর ধারণা সমর্থনলাভ করেছিল। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন মূলত রাষ্ট্রায়ত্তকরণের বিষয়ে সরকারের ধারণা ব্যাখ্যা করেছিলেন। ত্রাণমন্ত্রী কামরুজ্জামান তাঁর নিজের ক্ষেত্র অর্থাৎ শরণার্থী–পুনর্বাসনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামও কোনো কোনো বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন এবং প্রশ্ন করেছিলেন। আমরাও কমিশনের কী কী প্রয়োজন মন্ত্রিসভাকে তা অবহিত করি। কেবল পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ আগাগোড়া চুপচাপ বসেছিলেন। সভা থেকে বেরিয়েই তাঁর এই নীরবতা সম্পর্কে মুশারফ হোসেনের কাছে আমি মন্তব্য করেছিলাম।

আমাদের ওপরে যে–ধরনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, তা পালনের জন্যে প্রয়োজন ছিল লোকবল এবং উপাত্ত–সংগ্রহ। সরকার আমাদের ওপরে সহকর্মী নিয়োগের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং এ ভারটা নিয়েছিলেন মুশারফ হোসেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক সনৎকুমার সাহা নিযুক্ত হয়েছিলেন অর্থনীতিবিদ। কিছু কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল। বিশেষজ্ঞ–পর্যায়ে আমরা আরো কিছু নিয়োগ আশা করেছিলাম, তা যে হয়নি তার জন্যে সরকার দায়ী ছিলেন না। তবে আমাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করে সরকার হঠাৎ করে নভেম্বর মাসের গোড়ায় রেলওয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী আবদুল গফুরকে পরিকল্পনা–কমিশনের প্রকৌশল বিভাগের (যদিও ওরকম কোনো বিভাগই আমাদের ছিল না) প্রধান হিসেবে নিয়োগদান করেন। বিপদের দিনে গফুর সাহেব আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং কাউকে কাউকে এই ভয়ংকর সময়ে ভারতে চলে আসতে সাহায্য করেছিলেন। প্রধানত সেই কারণে তাজউদ্দীন নিজেই এই নিয়োগের উদ্‌যোগ নিয়েছিলেন। গফুর হাতেকলমে কাজের মানুষ, পরিকল্পনায় তাঁর অতোটা উৎসাহ ছিল না। আমাদের সঙ্গে তাঁর পূর্ব–পরিচয় ছিল না, ভাব–তরঙ্গের মাত্রাও এক ছিল না।

উপাত্ত–সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা খুব অসুবিধেয় পড়েছিলাম। যেমন, পুনর্গঠন–সংক্রান্ত যে–কোনো পরিকল্পনার জন্যে আমাদের প্রথম প্রয়োজন ছিল ক্ষয়ক্ষতির হিসাব পাওয়া। আমরা প্রতিরক্ষা–মন্ত্রণালয়কে লিখিত অনুরোধ জানালাম যে, তাঁরা যেন এ–বিষয়ে আমাদের সাহায্য করেন। আমাদের যোদ্ধারা দেশের মধ্যে যেসব সেতু বা বাড়িঘর, বিদ্যুৎ–সরবরাহ–ব্যবস্থা বা অন্য কিছু আক্রমণ করছে কিংবা ধ্বংস করে দিচ্ছে তার বিবরণ নিশ্চয় তাঁরা পাচ্ছেন। পাকিস্তানিরা যা ধ্বংস করছে, গোয়েন্দা–সূত্রে তার খবরাখবরও তাঁদের কাছে পৌঁছোনোর কথা। এসব থেকেই তাঁরা আমাদের জন্যে তথ্য সংকলন করে দিতে পারেন। তাঁদের কাছ থেকে সাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না পাওয়ায় পরিকল্পনা–কমিশনের সভাপতি একদিন আমাকে পাঠালেন প্রতিরক্ষা–সচিবের কাছে। তিনি জানালেন, আমাদের চিঠি যথারীতি পাঠানো হয়েছে প্রধান সেনাপতির দপ্তরে। তাঁদের প্রতিক্রিয়া মোটামুটি এরকম : রণাঙ্গন থেকে কমান্ডারদের পাঠাতে হয় দুটি রিপোর্ট—একটি প্রধান সেনাপতির দপ্তরে, একটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট দপ্তরে। এ সবই গোপনীয়। এর ওপরে যদি আবার পরিকল্পনা–কমিশনের জন্যে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ লিখে পাঠাতে হয় তাহলে যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে তাঁদের কেবল রিপোর্টই লিখতে হবে। প্রতিরক্ষা–সচিব আমাকে তথ্য–সচিবের সঙ্গে আলোচনা করতে বললেন। কথাটা আমার মনেও ছিল। বিভিন্ন রণাঙ্গনে আমাদের সংবাদদাতা ছিলেন : তাঁদের কাজ ছিল যুদ্ধের খবরাখবর নিয়মিত পাঠানো, তা প্রচারিত হতো স্বাধীন বাংলা বেতার–কেন্দ্র থেকে। আমরা জানতাম, বেতারে প্রচারিত বিবরণ অতিরঞ্জিত হতো—কেননা শ্রোতাদের মনোবল বৃদ্ধি করা বা অক্ষুণ্ন রাখা ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। তথ্য–সচিবের সঙ্গে আলাপ করতে গেলাম, নিজস্ব সংবাদদাতার সূত্র থেকে আমরা সাহায্য পেতে পারি কিনা। দেখা গেলো, সেখানেও খুব সুবিধে হচ্ছে না।

আসলে সামরিক বা বেসামরিক আমলাদের অনেকেই পরিকল্পনা–কমিশনের কাজকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখেননি। অনেকের মনে হয়েছিল, অধ্যাপকশ্রেণীর এই কয়েকজন লোককে একটা সম্মানজনক কাজে জড়িত রাখাই হয়তো সরকারের উদ্দেশ্য। হয়তো কমিশনের সদস্যরূপে আমার মতো সাহিত্যচর্চাকারীর নিয়োগলাভ তাঁদের এ ধারণাকে পুষ্ট করেছিল। যে-বিভাগ নেই, তার প্রধান হিসেবে গফুরের নিযুক্তি সে–ধারণা দূর করতে সাহায্য করেনি। তাছাড়া অনেকেই ভেবেছিলেন, কবে দেশ স্বাধীন হবে, কবে এ–পরিকল্পনা কাজে লাগবে এবং আদৌ কাজে লাগবে কিনা, কে জানে! ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তো প্রতিদিনই বাড়ছে, তার কতোই বা জানানো যায়!

সুতরাং সরকারের অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ যে সুদৃঢ় ছিল, তা বলা যায় না। সরকার একবার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, শত্রুকবলমুক্ত এলাকায় সরকারি উদ্‌যোগে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হবে। পরিকল্পনা–কমিশনকে বলা হলো, এর জন্যে একটা ছোট পরিকল্পনা তৈরি করে দিতে। আমরা জানতে চাইলাম, মুক্তাঞ্চলগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যা, সেখানে যাতায়াতের ব্যবস্থা, সেখানকার প্রশাসনের অবস্থা, সেখানে বেসরকারি উদ্‌যোগে লভ্য খাদ্যদ্রব্যের আনুমানিক পরিমাণ, খাদ্যদ্রব্য কাদের দেওয়া হবে, তাঁরা এসব কিনে নেবেন না বিনা পয়সায় পাবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার মনে হয় না, এসব প্রশ্নের জবাব আমরা পেয়েছিলাম। হয়তো যাঁদের কাছে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম তাঁরা বিরক্তই হয়েছিলেন। কথাটা মনে হলো এই জন্যে যে, মুক্তাঞ্চলের বেসামরিক প্রশাসনের কাঠামো প্রথমে যখন তৈরি হয়, তখন পরিকল্পনা–কমিশনের পরামর্শ চাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়নি। পরে অবশ্য এ–সংক্রান্ত কমিটিতে কমিশনের প্রতিনিধি হিসেবে মুশারফ হোসেনকে রাখা হয়েছিল। তেমনি আবার কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট–রচনার দায়িত্ব পরিকল্পনা–কমিশনকে দেওয়া হয় এবং মোজাফফর সাহেব তা যথারীতি প্রণয়ন করেন। তার আগেই কিন্তু রংপুরের মুক্তাঞ্চল রওমারির জন্যে বিশেষভাবে আরেকটি প্রকল্প তৈরি করা হয় মাহবুবুল আলম চাষীর নেতৃত্বে। শেষেরটির সঙ্গে অবশ্য আমাকেও যুক্ত করা হয়েছিল গণসাক্ষরতা–কর্মসূচি সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে।

অন্যপক্ষে, পাকিস্তান সরকারের যেসব প্রকাশনা আমাদের কাজে আসতে পারতো, তার সামান্যই লভ্য ছিল কলকাতায়। সুতরাং স্মৃতির ওপর নির্ভর করে আমাদের কাজ শুরু হয়েছিল। আমি একবার পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, ওয়াশিংটনে আমাদের যেসব বন্ধু আছেন তাঁদের কাছে কিছু দলিলপত্র চাওয়া যাক। তখন কথাটা দাঁড়ালো এই যে, আগে ঘরের কাছে দিল্লিতে কী পাওয়া যায়, সেটা খোঁজ করা দরকার।

ভারতীয় প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য (এখন প্রয়াত) ড. সুখময় চক্রবর্তী (তাঁর পিতা সোমনাথ চক্রবর্তী ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি) যেদিন আমাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা বলতে আসেন, সেদিন আমরা কথাটা তুলি। তিনি কিছু কাগজপত্র পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং পরে পাঠিয়েও দেন। তবে পাকিস্তান সরকারের যেসব প্রকাশনা তিনি পাঠিয়েছিলেন তা খুব সাম্প্রতিককালের ছিল না।

সুখময় চক্রবর্তী প্রথমেই জানতে চেয়েছিলেন, সিলেটে তাঁর স্কুলজীবনের সহপাঠী এ এম এ মুহিতকে আমরা চিনি কিনা। আমরা যখন বললাম যে, তিনি আমাদের সকলেরই ঘনিষ্ঠজন, তখন সুখময় তাঁর ও তাঁর পরিবারের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সম্পর্ক কতটা গভীর, তা বুঝতে চাইলেন। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হলো : যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের পুনর্গঠনে ভারতের বস্তুগত সাহায্যের সম্ভাব্য মাত্রা এবং উভয় দেশের সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্র সম্পর্কে আমরা আলাপ করেছিলাম।

মোজাফফর আহমদ চৌধুরী বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে দীর্ঘ একটি পরিকল্পনা রচনা করেন অফিসে বসে, পেন্সিলে, একাকী এবং অসম্ভব দ্রুতগতিতে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সংবিধানের একটা রূপরেখাও তিনি তৈরি করেছিলেন বলে মনে পড়ে। সারওয়ার মুরশিদ রচনা করেছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ডিমবিলাইজেশন, বেসামরিক অথচ জনকল্যাণমূলক কাজে তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পৃক্তকরণ, এবং নির্যাতিতা ও সহায়হীনা নারীদের পুনর্বাসন সম্পর্কে পরিকল্পনা। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনের নানাদিক নিয়ে মুশারফ হোসেন এবং স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে জরুরি জিনিসপত্রের সরবরাহ সম্পর্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বদেশ বসু বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমি গোটাকয়েক কাগজ তৈরি করি।

আমরা খবর পাচ্ছিলাম যে, পাকিস্তান সরকার বিদেশে বহু বাঙালি ছাত্রের বৃত্তি বন্ধ করে তাঁদের দেশে ফেরার আদেশ দিয়েছেন। আমার একটি প্রস্তাব ছিল এই ছাত্রদের বিষয়ে। আমি বলেছিলাম, যেসব বাঙালি ছাত্র পাকিস্তান সরকারের বৃত্তি ভোগ করছেন, তাঁরা যেন তা ছেড়ে না দেন; যাঁদের বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাঁদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অর্থ ওসব দেশের নাগরিকদের গঠিত বিভিন্ন সংস্থার তহবিল থেকে পাওয়া যায় কিনা সে-চেষ্টা করা যেতে পারে। দেশে বিধ্বস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-পুনর্গঠনে সরকার এবং স্থানীয় জনগণের মিলিত উদ্‌যোগের ওপরে আমি জোর দিয়েছিলাম। তরুণ বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের এবং মুক্তিযোদ্ধা নয় এমন স্থানীয় তরুণদের এ ধরনের কাজে জড়িত করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছিলাম। শরণার্থী শিক্ষক যাঁরা দেশে ফিরে যাবেন তাঁদের কাছে দায় স্বীকার করে আংশিক সময়ের বেতন নগদে দিয়ে বাকিটা পরে পরিশোধ করার প্রস্তাব ছিল। বিজয়লাভের অব্যবহিত পরে আমি প্রস্তাব করি যে, ১৯৭২ সালের ১ মার্চ থেকে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হোক; ১৯৭১ সালের ১ মার্চে যে যে-ক্লাসে পড়তো ১৯৭২-এর ১ মার্চে সে সেই ক্লাসে থাকবে; মধ্যবর্তী এক বছর সময় জাতীয় ক্ষতি হিসেবে গণ্য হবে, এবং সরকারি চাকরির নিম্নতম বয়ঃসীমা এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

আমাদের এ-সকল প্রস্তাবই কমিশনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে আলোচিত ও অনুমোদিত হয়ে সরকারের কাছে পাঠানো হয়। তবে সকল পরিকল্পনাপত্র দ্রুততার সঙ্গে পাঠানো হয়নি। আমাদের আলোচনার ভিত্তিতে কাগজগুলো সংশোধিত হলো কিনা তা দেখার ভার নিয়েছিলেন মুশারফ হোসেন। শেষদিকে তিনি কাগজপত্র ছাড়তে খুব বিলম্ব করছিলেন। এ নিয়ে কমিশনের সভাপতি এবং অন্য সদস্যেরা একটু উদ্বেগও প্রকাশ করেছিলেন। আমার মনে হয়, মন্ত্রিসভার মধ্যে উপদলীয় সংঘাত এ-সময়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। মুশারফ হোসেনের সঙ্গে মন্ত্রী কামরুজ্জামানের পূর্ব-পরিচয় তাঁর উপরে প্রভাব ফেলে থাকতে পারে।

তবে আমরা দ্রুত কাগজ পাঠালেই যে তা মন্ত্রিসভায় তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপিত হতো, তা নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর জাতীয় পরিষদ-সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী একটি জনসভায় সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছিলেন যে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে গণ-উন্নতি দেওয়া হলো; ১৯৭১এ যে যেখানে পড়ছে, ১৯৭২এ তার পরবর্তী শ্রেণীতে সে উন্নীত হবে। এই খবর পড়ার পরে আমি যখন প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, পরিকল্পনা-কমিশনে অনুমোদিত আমার প্রস্তাবটির কী হলো, তিনি বললেন, তা বিবেচনার সময় হয়নি এবং ইউসুফ আলী ঘোষণা দিয়েছেন কারো সঙ্গে পরামর্শ না করে; এ-ধরনের ঘোষণা একবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলে তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না (এর ফলে পরবর্তীকালে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বড়োরকম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়)।

স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে কেবল শরণার্থী–পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করতে গিয়ে দেখা গেলো, বিষয়টি কতো দুরূহ। ভারতে যদি এক কোটি শরণার্থী এসে থাকে তাহলে প্রাথমিক জরিপ–অনুযায়ী এর ৬০ শতাংশ ছিল কৃষিজীবী পরিবারের সদস্য। গড়পড়তা ছয়জনের পরিবার ধরলে হয় ১০ লাখ পরিবার। প্রতি পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য যদি একজোড়া হালের বলদ দিতে হয় তাহলে প্রয়োজন হবে ২০ লাখ বলদের। ঘর বাঁধতে হলে যতো বাঁশ ও আনুষঙ্গিক সামগ্রীর প্রয়োজন হবে, সংসার চালাতে হলে যতোটা কেরোসিন তেল লাগবে, তার পরিমাণ বিস্ময়জনক। জরুরি ভিত্তিতে সেতু মেরামত, হাসপাতাল চালু, বাজারে খাদ্যদ্রব্য রাখা—এর জন্যেও বিপুল আয়োজনের দরকার। আমরা যখন এইরকম হিসেব নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি, তখন অধ্যাপক আনিসুর রহমান চলে এলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। তিনিও প্রয়োজনের এই তালিকা করতে সাহায্য করলেন।

ভারতের কাছে ছাড়া এসব জিনিস চাওয়ার ক্ষেত্র আমাদের ছিল না। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছেও তালিকায় বর্ণিত সামগ্রীর পরিমাণ অপ্রত্যাশিত ছিল। তাঁরা প্রথমে প্রস্তাব করেছিলেন যে, শরণার্থী–পুনর্বাসনের বিষয়টি সমন্বয় করার জন্যে প্রতি জেলায় বাংলাদেশের জেলা–প্রশাসকের সঙ্গে ভারতীয় প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা যুক্ত থাকবেন। রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার এতে সম্মত হননি। পুনর্বাসন–পুনর্গঠনের জরুরি কাজে মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার বিষয়ে যেসব কাগজপত্র তৈরি হয়েছিল তাও ভেসে গেলো। মন্ত্রিসভা ঢাকায় এসে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে আমাদের পরিকল্পনা–কমিশনের কোনো নথিপত্র আর পাওয়া যায়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭.

জুলাই মাসের প্রথমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা ড. হেনরি কিসিন্জার দিল্লি সফরে এলেন। তাঁর আসবার খবর জানাজানি হলে তাঁর কাছে কীভাবে বাংলাদেশের বক্তব্য পৌঁছোনো যায় তা নিয়ে সবাই ভাবতে লাগলাম। জানা গেল, অধ্যাপক মযহারুল ইসলামের পরিচয় আছে তাঁর সঙ্গে। দিল্লিতে গিয়ে কিসিন্জারের কাছে লবিংয়ের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে, আমার জানামতে, মযহারুল ইসলামের আলাপ হয়েছিল বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক অজয় রায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সম্পাদক দিলীপকুমার চক্রবর্তী ও পররাষ্ট্র-সচিব মাহবুবুল আলম চাষীর সঙ্গে। চাষীর কথায় আমার ধারণা হয়েছিল যে, বাংলাদেশ মিশনের পক্ষ থেকে মযহারুল ইসলামকে দিল্লি পাঠানো হয়েছে এবং যাওয়ার সময়ে তাঁর উপযুক্ত বেশভূষার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম জানিয়েছেন যে, পোশাক-আসাকের বিষয়টা ঠিক নয় এবং তাঁকে দিল্লি পাঠিয়েছিলেন—বাংলাদেশ মিশন নয়—প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন। প্রধানমন্ত্রীর দুই ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক উপদেষ্টা আমীরউল ইসলাম এবং মঈদুল হাসান বলেন যে, মযহারুল ইসলামকে প্রধানমন্ত্রীর উদ্‌যোগে দিল্লি পাঠানোর বিষয়ে তাঁরা কখনো কিছু জানতেন না। যাইহোক, কিসিন্জারের সঙ্গে যোগাযোগের এই প্রয়াসের পরিণাম সম্পর্কে পরে আর আমরা কিছু জানতে পারি নি।

কিসিন্জার ভারত সরকারকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য-সমর্থনদান থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী পালটা চেয়েছিলেন বাংলাদেশের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেন পাকিস্তানকে চাপ দেয়। কেউ কারো কথায় সম্মত হননি। ভারত থেকে কিসিন্জার গেলেন পাকিস্তানে। আমরা মনে করলাম, তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা করতেই সেখানে যাচ্ছেন। পরে জানা গেল, পাকিস্তানের ব্যবস্থাপনায় তিনি সেখান থেকে

চীনে যান। পরবর্তী বছরে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের চীন সফরের সকল আয়োজন তখন সম্পূর্ণ হয়।

ওই জুলাই মাসেই বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে তিন-সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল মধ্যপ্রদেশ সফরে যান। এই দলে ছিলেন অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, ড. অজয় রায় ও শামসুল আলম সাঈদ। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মৃন্ময় ভট্টাচার্য, বোধহয় দু-একজন শিক্ষক আরো দলে যোগ দিয়েছিলেন। এঁরা গিয়েছিলেন জব্বলপুর, ভূপাল, উজ্জয়িনী, রিয়া ও রায়পুর প্রভৃতি জায়গায়।

জুলাই মাসের মধ্যভাগেই বোধহয় সর্বোদয়-নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ এসেছিলেন কলকাতায়। তিনি তখন দেশবিদেশ ঘুরে বাংলাদেশের জন্যে সমর্থন আদায়ের প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ড. মল্লিক ও আমি দেখা করতে যাই। জয়প্রকাশ তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। আমাদের যুদ্ধ ও কূটনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন এবং বিশেষ করে কথা বলেছিলেন দিল্লিতে অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ সম্মেলন সম্পর্কে।

জয়প্রকাশ নারায়ণ ও আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্‌যোগে নয়াদিল্লিতে ১৪ থেকে ১৬ আগস্টে আহ্বান করা হয়েছিল বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। জুলাই মাসের গোড়ায় বাংলাদেশ মিশনে সম্মেলনের আয়োজকদের পক্ষ থেকে দুজনের সঙ্গে বৈঠক হয় ড. মল্লিক আর আমাদের মিশনের প্রথম সচিব আর আই চৌধুরীর। তাতে স্থির হয়, সম্মেলনে সম্ভাব্য যোগদানকারী অধ্যাপক ও শিল্পীর একটা তালিকা করবেন মল্লিক সাহেব ; রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকদের মধ্যে থেকে নাম বাছাই করবেন তাহেরউদ্দীন ঠাকুর ও মওদুদ আহমদ ; আর ব্যারিস্টার সুব্রত রায়চৌধুরীকে অনুরোধ করা হবে একটি বিশেষ প্রবন্ধ পড়ার জন্যে। জুলাইয়ের শেষে বাংলাদেশ মিশনে আবার বৈঠক হলো সৈয়দ আলী আহসানের নেতৃত্বে—শুধু আমাদের নিয়ে। আর আই চৌধুরী ছাড়া এতে উপস্থিত ছিলেন খান সারওয়ার মুরশিদ, বিলায়েত হোসেন, আলী আনোয়ার, মতিলাল পাল ও মওদুদ আহমদ; আমিও ছিলাম। সভায় কুড়িজনের একটি প্রতিনিধিদল বাছাই করা হয় এবং যেসব প্রবন্ধ সম্মেলনে উপস্থাপন করা হবে, তাও মোটামুটি ঠিক করা হয়। কুড়িজন প্রতিনিধি হলেন : এ আর মল্লিক (প্রতিনিধিদলের নেতা ; প্রবন্ধ : বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের রাজনৈতিক পটভূমি) ; সৈয়দ আলী আহসান (প্রবন্ধ : মুক্তি-আন্দোলনের ঘটনাধারা); খান সারওয়ার মুরশিদ (প্রবন্ধ : বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি) ; সাদেক খান (প্রবন্ধ : বাংলাদেশে গণহত্যা) স্বদেশ বসু (প্রবন্ধ : ভারতে বাংলাদেশের শরণার্থী-প্রবাহ এবং সমস্যাটির মানবিক দিক); মতিলাল পাল (প্রবন্ধ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অস্তিত্বরক্ষার সামর্থ্য); মওদুদ আহমেদ (প্রবন্ধ : আন্তর্জাতিক আইন ও প্রচলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের স্বীকৃতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়); ওসমান জামাল (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়); এ এ জিয়াউদ্দীন আহমদ (পদার্থবিজ্ঞানী); আলমগীর কবির (চিত্রনির্মাতা ও সাংবাদিক); তাহেরউদ্দীন ঠাকুর (সংসদ-সদস্য); আমীরউল ইসলাম (জাতীয় পরিষদ্-সদস্য); আবদুল মুনতাকিম চৌধুরী (জাতীয় পরিষদ্-সদস্য); সৈয়দ আবদুস সুলতান (জাতীয় পরিষদ্-সদস্য); আবুল খায়ের (জাতীয় পরিষদ্-সদস্য); সমর দাস (সংগীতশিল্পী); সন্‌জীদা খাতুন (সংগীতশিল্পী); কল্যাণী ঘোষ (সংগীতশিল্পী); আবদুল জব্বার (সংগীতশিল্পী); ও আপেল মাহমুদ (সংগীতশিল্পী)। এছাড়া, ব্যারিস্টার সুব্রত রায়চৌধুরীকে অনুরোধ করা হয় আন্তর্জাতিক আইন ও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ ও আওয়ামী লীগ সরকারের বৈধতা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে। আমাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে যাঁরা প্রবন্ধ পড়বেন না, তাঁরা আলোচনায় অথবা সংগীতানুষ্ঠানে অংশ নেবেন। জাতীয় পরিষদ্ জনপ্রতিনিধিদের নাম বাছাই করা হয় সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন-সাপেক্ষে। এই কুড়িজন ছাড়া আরো পাঁচজন প্রতিনিধি মনোনয়নের ভার রয়ে যায় সরকারের হাতে। শেষ পর্যন্ত এঁদের সবাই গিয়েছিলেন কিনা, আজ আর তা মনে নেই।

নানাকারণে নির্ধারিত তারিখের পরে, ১৮ থেকে ২০ সেপ্টেম্বরে, অনুষ্ঠিত হলেও সম্মেলনটি খুব সফল হয়। জয়প্রকাশ নারায়ণ মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এতে অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ডেনমার্ক, নরওয়ে, নাইজিরিয়া, নেপাল, ফ্রান্স, মিশর, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, যুগোশ্লাভিয়া ও সিংহল প্রভৃতি ২৪টি দেশের প্রায় ৭০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগ দেন। ভারতের প্রতিনিধিদলে অনেকের মধ্যে ছিলেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, আচার্য কৃপালনী, সুচেতা কৃপালনী, শেখ আবদুল্লাহ, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ও এম সি চাগলা। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন বাণী পাঠিয়েছিলেন ভি ভি গিরি, এডওয়ার্ড কেনেডি, মেনদেস ফ্রাঁস, আঁদ্রে মলরো, ইয়েহুদি মেনুহিন ও আরো অনেকে। সম্মেলনের আলোচ্য-বিষয় ছিল বাংলাদেশের ঘটনাবলি-পর্যালোচনা, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও সরকারের প্রতি সমর্থনদান, এবং এই মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্বসম্প্রদায়ের দায়িত্ব। জয়প্রকাশ নারায়ণ ও নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বি পি কৈরালা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে একটি আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠনের প্রস্তাব করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তবে সম্মেলন-অনুষ্ঠানের সময়ে এর একটা বড়ো আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় বঙ্গবন্ধুর জীবনরক্ষার উপায়-নির্ধারণ।

আগস্ট মাসের গোড়ায় পাকিস্তানের বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত এক ভাষণে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করলেন যে, রাষ্ট্রদ্রোহ, প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার দায়ে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার হবে। পরবর্তী ঘোষণায় জানানো হলো যে, এই বিচার অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ সামরিক আদালতে ও গোপনে, তবে অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়া হবে। আরো পরে জানা গেল যে, এ কে ব্রোহীকে শেখ মুজিবের কৌসুলি নিযুক্ত করা হয়েছে।

এই সংবাদে আমরা খুব বিচলিত হলাম। আমাদের সকলেরই ধারণা হলো যে, বিচারের প্রহসন করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করাই হচ্ছে পাকিস্তানের শাসকচক্রের আসল উদ্দেশ্য। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বেতার-ভাষণ ও সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে এই চক্রান্তের প্রতিবাদ করলেন এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানালেন বিশ্বের নেতৃবৃন্দের কাছে। কলকাতায় বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির যৌথ উদ্‌যোগে ১৩ আগস্ট সকালে বাংলাদেশ মিশনের সামনে বিশাল প্রতিবাদ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং বড় মিছিল বের হয় সেখান থেকে। আমরা পাকিস্তান সরকারকে ধিক্কার দিই, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবি করি এবং বিশ্ববিবেকের কাছে আবেদন জানাই।

এরই মধ্যে জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে সংযম প্রদর্শন করতে এবং মুজিবের জীবনরক্ষা করতে অনুরোধ জানিয়ে এক বার্তা পাঠান। এতে পাকিস্তান সরকার ভয়ানক ক্ষিপ্ত হন। কিন্তু বিশ্বের নানা অংশ থেকে তাঁদের কাছে ক্রমাগত এমন দাবি ও অনুরোধ আসতে থাকে। ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিস্ট ইয়াহিয়ার কাছে একটি তারবার্তায় সামরিক আদালতে মুজিবের গোপন বিচারের নিন্দা করেন। অপর তারবার্তায় তাঁরা বিশ্ববাসীর এই আশঙ্কাজ্ঞাপন করেন যে, এই বিচারের ফলে যেনতেন প্রকারে মুজিবের জীবননাশ করা হবে। ৭ আগস্ট কলকাতায় মুজিব-মুক্তি দিবস পালিত হয় এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক বড়ো সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের সর্বত্রই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রত্যেক সরকারপ্রধানের কাছে বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচারের উদ্‌যোগে তাঁর দেশের জনগণ, সংবাদক্ষেত্র, পার্লামেন্ট ও সরকারের গভীর উৎকণ্ঠার কথা জানান এবং বিরাজমান পরিস্থিতির আরো অবনতি-রোধের লক্ষ্যে এই বিচার বন্ধের জন্যে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করতে অনুরোধ করেন।

আগস্ট মাসে ঘটনা খুব দ্রুত ঘটতে থাকে। ৯ তারিখে দিল্লিতে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সকলকে চমকে দিয়ে। এই মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করার পশ্চাতে উভয় দেশের দীর্ঘকালের কূটনৈতিক বিবেচনা নিশ্চয় কাজ করেছিল, কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়লে ভারতের যে রক্ষাকবচের প্রয়োজন হবে, এই চুক্তির মধ্যে অনেকে সে রক্ষাকবচ দেখতে পেয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, বাংলাদেশ মিশন তা দেখতে পাননি। খুব সম্ভব *স্টেটসম্যানের* একজন সাংবাদিক যখন এই চুক্তি সম্পর্কে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলীর প্রতিক্রিয়া জানতে চান, তখন তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই চুক্তি কোনো অনুকূল প্রভাব বিস্তার করবে বলে তাঁর মনে হয় না। তাঁর এই বক্তব্য প্রকাশিত হলে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন খুব ক্ষুব্ধ হন। এতবড় একটা বিষয় সম্পর্কে বাংলাদেশের মুখপাত্র সাংবাদিকদের কাছে মুখ খোলার আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করবেন না, একথা তিনি ভাবতে পারেননি। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে আলোচনা করেই নিশ্চয় মিশন-প্রধান এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান যে কত বেড়ে গেছে, তাজউদ্দীনের কথা থেকে তা আমি সেইদিনই প্রথম স্পষ্ট করে অনুভব করি। তাজউদ্দীন চুপ করে বসে রইলেন না। তিনিও প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানালেন যে, বাংলাদেশ সরকার ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীকে স্বাগত জানায়; বাংলাদেশ মিশনের প্রধান তাৎক্ষণিকভাবে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তাতে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি; বস্তুত যেসব দেশ বাংলাদেশকে নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছে, তাদের মধ্যে দুটি দেশের মধ্যে এ ধরনের চুক্তি-সম্পাদন একটা ইতিবাচক ঘটনা বলে বাংলাদেশ সরকার মনে করে।

বাংলাদেশ সরকার এ সময়ে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করারও উদ্যোগ নেন। আফগানিস্থান, নেপাল ও সিংহলে সরকারকে আমাদের পক্ষে আনার এবং জনমতগঠনের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয়। সংসদ-সদস্য আখতারুজ্জামান বাবু ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে যান। আরেকজন সংসদ-সদস্য মোল্লা জালালউদ্দীন ও আমাদের ফরাসিভাষী সহকর্মী ড. মাহমুদ শাহ্ কোরেশী বৈরুতে কেন্দ্র স্থাপন করে মধ্যপ্রাচ্যে প্রচারকার্য চালান। এডওয়ার্ড কেনেডি কলকাতায় এলে বাংলাদেশের শরণার্থী বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষকদের পক্ষ থেকে আমাদের ৪৪ জনের স্বাক্ষরযুক্ত একটি স্মারকপত্র তাঁকে দেওয়া হয়।

AMARBOI.COM

এদিকে বাংলাদেশ সরকার যে-একটা নতুন সংকটের মুখে পড়েন, তা আমি তাজউদ্দীনের কাছ থেকে জানতে পারি এই আগস্ট মাসেই। ছাত্রলীগের তরুণ নেতাদের সঙ্গে তাজউদ্দীনের বিরোধের কথা আগে বলেছি। এর একটা সাময়িক সমাধান হয় মুক্তিবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির জন্যে তরুণ স্বেচ্ছাসেবক বাছাইয়ের ব্যাপারে চার ছাত্রনেতার— শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমদ ও আবদুর রাজ্জাকের— ওপরে দায়িত্ব-অর্পণে। এই চার নেতা ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর-জেনারেল এস এস উবানের (প্রকৃতপক্ষে তিনি ভারতের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং বা রয়ের সামরিক অঙ্গের প্রধান ছিলেন) সঙ্গে যোগাযোগ করেন। উবানের তখনকার স্মৃতিকথা *ফ্যান্টমস অফ চিটাগং* (নয়াদিল্লি, ১৯৮৫) থেকে জানা যাচ্ছে যে, মুক্তিযুদ্ধ-পরিচালনার জন্যে তিনি তাঁদেরকে খুব উপযুক্ত বিবেচনা করেন, কিন্তু বাংলাদেশ সরকার তাঁদেরকে সে-দায়িত্ব প্রদানে ইচ্ছুক ছিলেন না দেখে অবাক হন। এঁদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(পরে মুজিব–বাহিনী নামে সুপরিচিত) একটি পৃথক সশস্ত্র বাহিনীর গঠন, প্রশিক্ষণ ও পরিচালনার পক্ষে উবান মত দেন। কিন্তু তাজউদ্দীন ও ওসমানী তাতে আপত্তি করেন, ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাও সে আপত্তি যুক্তিসংগত বিবেচনা করেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ডি পি ধর ছিলেন একটু দোমনা এবং সেই সুযোগে ক্যাবিনেট সচিব আর এন কাওকে দিয়ে মেজর জেনারেল উবান মুজিব–বাহিনীর স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নেন। উবান ও অরোরার মধ্যে এই মর্মে আপোসরফা হয় যে, মুক্তিবাহিনী সীমান্তের ২০ মাইলের মধ্যে সামরিক তৎপরতা চালাবে, আর মুজিব–বাহিনীর সদস্যেরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গিয়ে অভিযান চালিয়ে আবার ফিরে আসবে। জুন মাসে বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্টের (বিএলএফ) সদস্যদের প্রশিক্ষণ শুরু হয় দেরাদুন অঞ্চলে, আগস্টে এদের তৎপরতা শুরু হয়। তখন এটা আরো স্পষ্ট হয় যে, এই বাহিনীর ওপরে বাংলাদেশ সরকার বা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। স্পষ্টতই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এক ঝুড়িতে সব ডিম রাখতে চাননি—বৈধ সরকার ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন সেনাবাহিনীর সমান্তরালে সেই সরকারের প্রকাশ্য সমালোচক একটি সশস্ত্র বাহিনীও তাঁরা গড়ে তুললেন। আগে থেকে কিছু কিছু খবর পেলেও আগস্ট মাসে তাজউদ্দীন এ বিষয়ে খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। আমার কাছে তিনি নিজের মর্মবেদনার কথা প্রকাশ করেন এবং একথাও বলেন যে, এই একটি বিষয়ে জানতে চেয়েও ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে তিনি যথোপযুক্ত সাড়া পাননি। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁকে আশ্বাস দেন যে, ক্যাবিনেট–সচিব তাঁকে সবটা ব্যাখ্যা করবেন, কিন্তু তাজউদ্দীন এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে কাও এড়িয়ে যান। একজন সচিবের কাছে একই প্রশ্ন বারবার তুলতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আত্মসম্মানে বাধে।

মুজিব–বাহিনী শুধু যে বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, তা নয়। সরকারি সেনাবাহিনীর সঙ্গেও তাদের সংঘাত ঘটে। মুক্তিবাহিনী ছেড়ে কেউ কেউ মুজিব–বাহিনীতে যোগ দেয়, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সামরিক বিধি–অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। অল্পকাল পরে মুজিব–বাহিনী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় সমাজতন্ত্রী সিরাজুল আলম খান ও সমাজতন্ত্রবিরোধী শেখ মণির নেতৃত্বে। দুই অংশই মুজিব–বাহিনীর মধ্যে ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে প্রভাববিস্তারের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে এবং জীবনহানিও হয়। প্রধানমন্ত্রী হয়ে এই অবস্থা শুধু নীরবে দেখে যেতে তাজউদ্দীনের আত্মমর্যাদা ও বিবেকে বাধে—তাঁর ক্রমবর্ধমান বিষণ্নতার আমি সাক্ষী হয়ে থাকি মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০.

আগস্টের একেবারে শেষে কি সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় নয়াদিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ মিশন। আনুষ্ঠানিকভাবে সেখানে কাজ করার সুবিধে হলো। আপাতত এই মিশনের প্রধান হলেন কে এম শাহাবুদ্দীন ; আমজাদুল হক থাকলেন তথ্যসংক্রান্ত দায়িত্বে। অক্টোবর মাসে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দিলে দিল্লির মিশন-প্রধান হলেন তিনি।

তার চেয়েও বড়ো কথা, বহু আকাঙ্ক্ষিত সর্বদলীয় নেতৃ-সম্মেলন হলো কলকাতায়, তাজউদ্দীনের সভাপতিত্বে এবং ৮ সেপ্টেম্বরে গঠিত হলো সর্বদলীয় উপদেষ্টা-পরিষদ্। এর অন্তর্ভুক্ত হলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (ন্যাপ-ভাসানী), অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (ন্যাপ-মোজাফফর), মণি সিংহ (কমিউনিস্ট পার্টি) ও মনোরঞ্জন ধর (জাতীয় কংগ্রেস); আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরূপে থাকলেন খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও আবদুস সামাদ আজাদ; আর মন্ত্রিসভার সদস্যরূপে থাকলেন এ এইচ এম কামরুজ্জামান (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) ও তাজউদ্দীন আহমদ (প্রধানমন্ত্রী, আহ্বায়ক)। গঠিত হওয়ার পরপরই উপদেষ্টা-পরিষদ্ সম্পর্কে দুটি সমালোচনা শোনা গেল। মূলত ভাসানী ন্যাপের—এবং অংশত মোজাফফর ন্যাপের—রাজনৈতিক কর্মীরা বললেন, জনগণের চাপে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকার কারণে আওয়ামী লীগ এমন একটা পরিষদ্ গঠন করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সবটাই হয়েছে লোক-দেখানো ব্যাপার, এই পরিষদের তো কোনো ক্ষমতাই নেই। পরিষদের যে ক্ষমতা ছিল না, তা সত্য; নীতিগত ব্যাপারে তাঁরা কিছু উপদেশ দিতে পারতেন মাত্র। কিন্তু এটুকু করতেই তাজউদ্দীনের অনেক কষ্ট হয়েছিল। কারণ, আওয়ামী লীগের মধ্যে একটা বড়ো গোষ্ঠী— তার মধ্যে খোন্দকার মোশতাক ও তাঁর অনুসারীরা ছিলেন, কামরুজ্জামান-ইউসুফ আলীর অনুগামীরাও অনেকে ছিলেন, শেখ মণির অনুগতরা ছিলেন—সত্যি সত্যি মনে

করতেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বদানের একটা বড়ো আইনগত দিক ছিল, ১৯৭০এর নির্বাচনে তাঁদের নিরঙ্কুশ বিজয়লাভ। সেই নির্বাচন যাঁরা বর্জন করেছিলেন অথবা যাঁরা তাতে পরাজিত হয়েছিলেন, এখন তাঁদের ডেকে নিয়ে উচ্চমঞ্চে বসাতে হবে কেন? তাজউদ্দীন এবং তাঁর পক্ষাবলম্বীরা যুক্তি দিচ্ছিলেন যে, মুক্তিযুদ্ধ যে দলমত-নির্বিশেষে সকল বাঙালির যুদ্ধ এবং সকল দলমতের মানুষ যে এই যুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব মানেন, এ ধরনের একটি সর্বদলীয় সংগঠন থাকলে দেশ ও বিদেশের মানুষকে তা জানানো সহজ হয়। প্রতিপক্ষ পালটা যুক্তি দিচ্ছিলেন যে, এর ফলে বৈধ নেতৃত্বের ক্ষমতা চলে যাবে অনধিকারীর কাছে। অবশ্য, আগেই যেমন বলেছি, উপদেষ্টা-পরিষদের ক্ষমতা বলতে কিছু ছিল না। তবু এর গঠন যে আমাদের মতো মানুষের পক্ষে স্বস্তিকর হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আওয়ামী লীগ-বহির্ভূত তরুণদের পক্ষে এর পরে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান অনেক সহজ হয়ে যায়। তবে উপদেষ্টা-পরিষদ্ নিয়ে আওয়ামী লীগে মতানৈক্য দূর হয়নি।

একই সময়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে আরেকটি বিষয়ে মতবিরোধ প্রবল হলো। বঙ্গবন্ধুর বিচারের যে-ঘোষণা পাকিস্তান সরকার দিয়েছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাজউদ্দীন-বিরোধী আওয়ামী লীগের কোনো কোনো উপদল এক ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। তাঁদের মতে, বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার জন্যে বাংলাদেশ সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করছেন না, অথচ এটাই হওয়া উচিত আমাদের প্রথম লক্ষ্য। বাংলাদেশ সরকার যে যথেষ্ট চেষ্টা করছেন না, তার কারণ, বঙ্গবন্ধু মুক্ত হলে কারো কারো নেতৃত্ব আর থাকবে না। যেহেতু যা করণীয়, তাঁরা তা করছেন না, সুতরাং অন্যদের তা করতে হবে। প্রয়োজন হলে পাকিস্তানের সঙ্গে গোপনে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে এবং তার জন্যে দরকারমতো পাকিস্তানের মুরুব্বি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধরতে হবে। ভারত-সোভিয়েত বলয়ের সঙ্গে আমরা বেশি জড়িয়ে পড়ায় চীন-মার্কিন বলয় থেকে আমরা অনেক দূরে সরে পড়েছি। সেটা কতদূর সংগত হয়েছে, তা পুনর্বিবেচনা করা দরকার।

এর পরবর্তী ধাপের যুক্তিমালা দাঁড়িয়েছিল এ রকম : এখন তো বোঝা যাচ্ছে, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের অখণ্ডতা সমর্থন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নও পাকিস্তান ভাঙতে চায় বলে মনে হয় না। ভারত পাকিস্তান ভাঙতে চায় বটে, কিন্তু তার জন্যে দরকারি ঝুঁকি নিতে তারা দ্বিধাগ্রস্ত। এই অবস্থায় দেশের ভেতরে ও বাইরে ক্রমাগত প্রাণ ও সম্পদ্‌হানি না ঘটিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার পথে অগ্রসর হওয়া যায় কিনা, তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে এসব বিষয় যে যুক্তিতর্ক ও ভাবনাচিন্তার স্তর অতিক্রম করে বাস্তব কর্মধারার পথে অগ্রসর হয়েছিল, তা জানতে আমাদের কিছু সময় লেগেছিল।

আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বক্তৃতায়-বিবৃতিতে বারে বারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে যাচ্ছিলেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো সমঝোতা নয়; বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনই আমাদের লক্ষ্য; বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্যে আমরা বিশ্বজনমত দিয়ে পাকিস্তানকে চাপ দেবো। টিক্কা খানের জায়গায় ড. মালিকের নিয়োগও পাকিস্তানের জঙ্গি রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তনের সূচনা করে না। পাকিস্তানের একটি সৈন্যও বাংলাদেশে থাকবে না—তা না হওয়া পর্যন্ত অবিশ্রাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

সেপ্টেম্বরে কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সেখানে বক্তৃতা দিতে যান অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম। এই সফরের সময়ে পালঘাট জেলা কর্মরত সাংবাদিক ইউনিয়নের দেওয়া এক সংবর্ধনা-সভায় তিনি বলেন যে, যদি শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, তবে বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানের সঙ্গে বড়োজোর একটা শিথিল কনফেডারেশন গঠন করতে পারে। একথা জেনে তাজউদ্দীন খুব রুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, এরকম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তব্য যেন আমরা কেউ আর না দিই, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে। সরকার থেকে সংবাদপত্রেও এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় যে, বাংলাদেশের নাগরিকেরা নানা সময়ে নানা বিষয়ে কথা বলে থাকেন, তবে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কেউ না বললে তা বাংলাদেশ সরকারের মত বলে ধরে নেওয়া যাবে না।

AMARBOI.COM

এই সেপ্টেম্বরে শিক্ষকদের যে-প্রতিনিধিদল মহারাষ্ট্র-সফরে গিয়েছিলেন, তাতে ছিলেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির হয়ে এ আর মল্লিক ও সৈয়দ আলী আহসান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির পক্ষ থেকে সুবিমল মুখোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এঁরা বোম্বাই ও অন্যান্য শহরে নানা সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং মহারাষ্ট্রের গবর্নর নবাব আলী ইয়ার জঙ্গের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন।

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা জোরদার করার জন্যে সেপ্টেম্বরের শেষে জাতিসংঘে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী প্রতিনিধিদলের নেতা নিযুক্ত হন। সদস্য হিসেবে এতে থাকেন জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত তিনজন সদস্য—আবদুস সামাদ আজাদ, ড. মফিজ চৌধুরী ও সৈয়দ আবদুস সুলতান; প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত চারজন সদস্য—ফণিভূষণ মজুমদার, ফকির শাহাবুদ্দীন আহমদ, আসহাবুল হক ও সিরাজুল হক; উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ন্যাপ-নেতা মোজাফফর আহমদ; ড. এ আর মল্লিক; এবং পাকিস্তানের পক্ষত্যাগকারী দুই রাষ্ট্রদূত এ এফ এম আবদুল ফতেহ ও খুররম খান পন্নী। এঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত জাতীয় পরিষদ্-সদস্য ও বাংলাদেশ মিশন-প্রধান এম আর সিদ্দিকী, রেহমান সোবহান, এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী পররাষ্ট্র-কর্মকর্তা এস এ করিম ও এ এম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ মুহিত। এঁরা উদ্দেশ্যসাধনে সফল হয়েছিলেন। পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে খুব চেষ্টা হয়েছিল যাতে এঁদের কেউ জাতিসংঘ-ভবনে প্রবেশ করতে না পারেন। সে-চেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে এঁরা সমর্থ হওয়ায় আমরা খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিলাম।

বাংলাদেশ সরকার উচ্চতম পর্যায়ে যখন ভেতরে-বাইরে এইসব সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত, তখন আমরা নিজের নিজের বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে আছি। আমার মনে পড়ে, এ সময়ে প্রতিরক্ষা ও তথ্য-মন্ত্রণালয়ের মধ্যে যেন একটু দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। তথ্য মন্ত্রণালয় মনে করছিলেন যে, প্রচারের জন্যে যথাযথ মালমশলা তারা পাচ্ছেন না প্রতিরক্ষা-মন্ত্রণালয় থেকে। আর প্রতিরক্ষা-মন্ত্রণালয় মনে করছিলেন যে, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের দায়িত্ব তাঁদেরই, তথ্য-মন্ত্রণালয় শুধু তাঁদের তৈরি-করা রচনা প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য-সচিব আবদুস সামাদ আমার কাছে এমন লোকের সন্ধান করেন, যিনি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের উপযোগী কথিকা রচনা করতে পারবেন। আমি তাঁর কাছে আল মুজাহিদীকে নিয়ে যাই। আল মুজাহিদীর তখন কোনো নিয়োগ ছিল না। সে অবিলম্বেই কাজে যোগ দেয়, কিন্তু প্রতিরক্ষা-মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ তার অনুকূল মনে না হওয়ায় কিছুকাল পরে সে কর্মত্যাগ করে।

আমার দুই অনুজপ্রতিম আহরার আহমদ ওরফে বাবলু এবং আবুল বারক আলভী (প্রথমজন এখন যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডায় শিক্ষকতা করে, অপরজন খ্যাতনামা চিত্রী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক) পশ্চিমবঙ্গ-ত্রিপুরা-বাংলাদেশে হরদম যাতায়াত করতো গেরিলাযুদ্ধের প্রয়োজনে—যুদ্ধের জোগান দিতে অথবা খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া করতে। বেশ কিছুকালের ব্যবধানে এবারে আলভী এলো আমাদের আস্তানায় (বাবলুও সঙ্গে ছিল কিনা মনে নেই)। জিজ্ঞেস করলাম, এতোদিন পরে কেন? আলভী বললো : ঢাকায় সে ধরা পড়েছিল, কিন্তু সে-যে আলভী এ কথা স্বীকার না করায় শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায়। তার আইডেনটিটি কার্ডও ছিল ভিন্ন নামে। তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল। যখন আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় তখনো তার আঙুলগুলো থেতলানো। আমি সহানুভূতিসূচক ধ্বনি করায় আলভী আমাকে থামিয়ে বললো : এর চেয়ে খারাপ খবর আছে। বাসায় অস্ত্রসহ ধরা পড়েছেন সংগীতশিল্পী আলতাফ মাহমুদ। বন্দীশিবিরে আলভীর পাশের ঘরেই তাঁর ওপরে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। দরজা খুলে যাওয়ায় সে এক ঝলক দেখতে পেয়েছিল : মাথা নিচে দিয়ে ফ্যানের সঙ্গে হাত-পা বেঁধে আলতাফ মাহমুদকে ঘোরানো হচ্ছে। তারপর সে বুঝতে পারে যে, আলতাফ মাহমুদ আর নেই।

আলতাফ মাহমুদের সঙ্গে ১৯৫২ সালে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়লো, তাঁর সুন্দর পোস্টার আঁকার কথা মনে হলো, তন্ময় হয়ে তিনি সুরসৃষ্টি করছেন, সেই দৃশ্য চোখে ভাসলো। সেই অমর সুরকার, দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ রাজনৈতিক কর্মী শহীদ হয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১.

বিনয় সরকার নামে একজন উদ্‌যোগী পুরুষ কলকাতা কৃষ্টি সংঘ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয়ার্ধে ওই সংগঠনের উদ্‌যোগে কলকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের হলে 'এপার বাংলা-ওপার বাংলার সাহিত্যিকদের' এক 'প্রীতি সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বনফুল, মনোজ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, ড. রমা চৌধুরী, বাণী রায়, জরাসন্ধ, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং শওকত ওসমান, সৈয়দ আলী আহসান, ফয়েজ আহমদ, আল মাহমুদ, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, আসাদ চৌধুরী, গোলাম মুরশিদ ও মাহবুব তালুকদারের মতো অনেক যশস্বী সাহিত্যসেবী। যতদূর মনে পড়ে, শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বক্তৃতা দিয়েছিলেন ড. রমা চৌধুরী, বনফুল ও মনোজ বসু; আমাদের দিক থেকে শওকত ওসমান, সৈয়দ আলী আহসান ও আমি। শেষে শ্রোতাদের কেউ একজন হাসান মুরশিদের (গোলাম মুরশিদের ছদ্মনাম) কথা শুনতে চাইলেন। গোলাম মুরশিদ সকলের বক্তব্যের সুর কেটে যা বললেন, তার মর্ম এই যে, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতো, কলকাতা শহরের মতো, পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য বার্ধক্যভারে পীড়িত—তার আর নতুন কিছু দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সে ক্ষমতা আছে পূর্ব বাংলার—যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নবীন, ঢাকা শহর নতুন—তার মানুষ ও সাহিত্যের যে-প্রাণস্পন্দন আছে, তাতে নতুন সৃষ্টি সেখানেই সম্ভবপর। মুরশিদের বলার মধ্যে এমন একটা তীব্রতা ছিল যা অনেককে আহত অথবা অপ্রস্তুত করেছিল—তাঁদের মধ্যে পূর্ব বাংলার লেখকেরা ছিলেন এবং পূর্ব বাংলার সাহিত্যকর্মের পশ্চিমবঙ্গীয় অনুরাগীরাও ছিলেন।

পরদিন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার দেখা করার কথা ছিল। কথাবার্তা

সেরে তিনি আমাকে বললেন, 'প্রেমেন মিত্রের কাছে আমাকে যেতে হবে—তুমিও চলো।' প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা পরিচয়পর্ব সাঙ্গ হওয়ামাত্র তিনি আমাকে বললেন, 'দেখুন, আপনাদের লেখার অল্পই এখানে এসে পৌঁছোয়। যেটুকু পাই, তার মধ্যে প্রশংসাযোগ্য অনেক কিছু থাকে। আমরাই তো সেকথা বলি—আপনাদের কেন নিজেদের প্রশংসা করতে হবে?' শুধু কথায় নয়, তাঁর কণ্ঠে এমন বেদনার একটা সুর ছিল যে এটা স্পষ্টই বোঝা গেল, আগের রাতের ঘটনা কাঁটার মতো বিঁধে আছে। আমাকেও তিনি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারছিলেন না।

প্রসঙ্গ ও পরিবেশে পরিবর্তন আনার জন্যে হঠাৎ করে বললাম, 'আমি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র।'

একটি বাক্যই ভোজবাজির কাজ করলো। তাঁর অপ্রসন্নতা ও ঔদাসীন্যের জায়গায় দেখা দিল আগ্রহ ও কৌতূহল, স্বজনের প্রতি স্নেহময় দৃষ্টিপাত। আমার প্রায় ত্রিশ বছর আগে তিনি ওই কলেজে পড়েছিলেন, তাঁর শিক্ষকের পুত্রের কাছে আমি পড়েছি। প্রেমেন্দ্র মিত্র মুহূর্তের মধ্যে চলে গেলেন বিশের দশকের ঢাকায়, জগন্নাথ কলেজের সীমানার মধ্যেকার বাড়ি ও বাগানে। কলেজের সামনের রাস্তা, লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরির খোঁজ নিলেন। যেন একটু দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'ঢাকা অনেক বদলে গেছে, তাই না?'

হ্যাঁ, সেই ঢাকা থেকে শুধু প্রেমেন্দ্র মিত্র নন, আমরাও তো অনেক দূরে ছিটকে পড়েছি।

এরই মধ্যে, আকস্মিকভাবে, দিন তিনেক ধর্মঘট হয় স্বাধীন বাংলা বেতার-কেন্দ্রে—সকল অনুষ্ঠানের প্রচার বন্ধ থাকে। কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা নিজেদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা নির্দিষ্ট বেতন-স্কেল ও পদমর্যাদা দাবি করে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন এবং অন্যদেরও প্ররোচিত—কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাকি বলপ্রয়োগও—করেন। বাইরের অনেকের ধারণা হয় যে, সম্ভবত পাকিস্তানিদের আক্রমণের ফলে আমাদের সম্প্রচার-যন্ত্র বিকল হয়ে যায় সাময়িকভাবে। বি এস এফের এক ছোট কর্মকর্তা আমার কাছে জানতে চান যে, স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান আর শোনা যাচ্ছে না কেন। আমি বলি, বোধহয় যন্ত্রপাতি মেরামত হচ্ছে। সরকারের ভেতরের অনেকে ধারণা করেন যে, বেতারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আওয়ামী লীগ-বিরোধীরা সরকারকে বিব্রত করার জন্যে এই ধর্মঘট আহ্বান করেছেন। যাহোক, সরকারি প্রতিনিধি ও বেতার-কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। তবে বেতারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকের পদবি ও দায়িত্বের বদল হয় এবং চুক্তির ধারায়ও পরিবর্তন আসে।

সেপ্টেম্বরের আরেকটা ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক জয়নাল আবেদিন এবং নিউরো-সার্জন রশীদউদ্দিন আহমেদের কলকাতায় পৌঁছোনো। তাঁদের কাছ থেকে দেশের অনেক খবর পেয়েছিলাম। রশীদউদ্দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক গিয়াসউদ্দিন আহমেদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং সেই হিসেবে আমার অনুজপ্রতিম। ঢাকায় তিনি সংকটে পড়েছিলেন : একদিকে তাঁকে পাকিস্তানি সেনাদের চিকিৎসা করতে হতো, আবার গোপনে অস্ত্রোপচার করতে হতো আহত মুক্তিযোদ্ধাদের—সেটাও সর্বদা গোপন থাকতো না। এই অবস্থায় তিনি ঢাকা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর মারফত মৌখিকভাবে গিয়াসউদ্দিন আমাকে জিজ্ঞেস করে পাঠান যে, মুক্তিযুদ্ধের কাজে তাঁকে প্রয়োজন কিনা—তাহলে তিনি সীমান্ত পার হয়ে আসবেন। গিয়াসউদ্দিন ঢাকায় গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে অর্থ, খাদ্যসামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র ও ওষুধপত্র সংগ্রহ করতেন এবং তা নিয়মিত জোগান দিতেন, তা আমি জানতাম। কলকাতায় যে তাঁকে বিশেষভাবে কাজে লাগাবার সুযোগ পাওয়া যাবে, তা আমার মনে হয় নি। ফলে আমি বললাম, কাজের জন্যে নয়, কিন্তু নিজের নিরাপত্তার জন্যেই গিয়াসের চলে আসা উচিত এপারে। একথা জেনে গিয়াস আর ঢাকা ছাড়েন নি। তিনি শহীদ হওয়ার পরে আমার কেবলই মনে হয়েছে, তাঁকে যদি তখন চলে আসতে বলতাম, তাহলে হয়তো তিনি প্রাণে বেঁচে যেতেন।

রশীদউদ্দিন কদিন কলকাতায় থেকে এডিনবরায় চলে যান। জয়নাল আবেদিন রয়ে যান কলকাতায়। আওয়ামী লীগ-নেতা ও আইনজ্ঞ ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদ ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু, সেই সূত্রে তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গেও তাঁর বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। ১৯৭২ সালে দুরারোগ্য ব্যাধিতে জয়নাল আবেদিনের মৃত্যু হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২.

পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসন অনেকদিন ধরে দাবি করে আসছিল যে, দেশের অভ্যন্তরে সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থায় চলছে। এবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বন্ধুরাষ্ট্রের পরামর্শে তারা ঘোষণা করলো যে, পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তারপরে জনপ্রতিনিধিদের কাছে সারা পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে। এর প্রথম ধাপ হলো, সেপ্টেম্বরের গোড়ায় জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে ড. এ এম মালিককে পূর্বাঞ্চলের গভর্নর হিসেবে নিযুক্তিদান। দ্বিতীয় ধাপ হলো, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে দেশদ্রোহী বলে যাঁরা গণ্য, তাঁদের আসন বাতিল করে, সেখানে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা। এসব উদ্‌যোগ–আয়োজনও শুরু হলো সেপ্টেম্বরে, বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেকে নির্বাচিত হলেন অক্টোবরে। ভোটগ্রহণের তারিখ স্থির হলো ডিসেম্বরে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের সময়ও নির্ধারিত হয়ে গেলো ডিসেম্বরে।

উপনির্বাচনের সম্ভাবনায় আমরা যতোটা উদ্‌বিগ্ন হয়েছিলাম, তার চেয়ে বেশি উৎকণ্ঠিত হয়েছিলাম জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসতে পারে, এই আশঙ্কায়। একবার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসলে ইয়াহিয়া খান নিজের সরকার বা তাঁর পুতুল সরকারের বৈধতা দাবি করতে শুরু করবেন। তখন পাকিস্তানের মুরুব্বিদের চেষ্টায় বিশ্বজনমতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা সম্ভবপর হবে।

আমার এই আশঙ্কা ব্যক্ত করলে তাজউদ্দীন বলেছিলেন : 'যত খুশি ইলেকশন করুক, কিন্তু ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি বসতে দেবো না।' এর থেকে আমার স্পষ্টই ধারণা হয় যে, ডিসেম্বরেই বড়ো কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার পর ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি চাওয়া হয়েছিল। তারপরে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্যে সরকার আবার ভারতের কাছে অনুরোধ করলেন অক্টোবরে। আমার কাছে এটাও তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল।

এই অক্টোবরেই আমার চাচাশ্বশুর আবদুল আহাদের শহীদ হওয়ার সংবাদ পেলাম।

আবদুল আহাদ ছিলেন বেবীর একমাত্র চাচা, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সম্ভবত তৃতীয় সলিসিটর। অর ডিগনাম অ্যান্ড কোম্পানি নামে প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক আইন-প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপন করেছিলেন তিনি—প্রথমে চট্টগ্রামে, পরে ঢাকায়। এখানে কোনো না কোনো সময়ে তাঁর সহকর্মী ছিলেন মরহুম কামরুদ্দীন আহমদ, মরহুম বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন ও ড. কামাল হোসেন। আহাদ সাহেব পরে শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং পূর্ব পাকিস্তান চেম্বার অফ কমার্সের ও পাকিস্তান ফেডারেল চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে তাঁর চালচলন ছিল খুব সাহেবী, পরে বাঙালি সংস্কৃতি ও পাকিস্তানের রাজনীতি সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। সোহরাওয়ার্দীর সূত্রে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, অন্যদিকে এ কে এম আহসান, সানাউল হক, শওকত ওসমান ও সিকান্দার আবু জাফরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। কাজী আরেফ আহমদ লিখেছেন যে, স্বাধিকার আন্দোলনের জন্যে তিনি অর্থ জোগাতেন। এসব খবর সামরিক শাসকদের অজানা থাকেনি। মে মাসে মতিঝিলের অফিস থেকে তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে যায় এবং প্রচুর অত্যাচার করে ও অর্থ আদায় করে দুদিন পর তাঁকে ছেড়ে দেয়। দিনতিনেক পর আবার তাঁকে অফিস থেকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। তিনি আর ফিরে আসেননি। তাঁকে যাঁরা শেষবারের মতো দেখেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর সহবন্দি— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার ও তখন জাতীয় পরিষদ-সদস্য আবদুল হাদী তালুকদারের জ্যেষ্ঠপুত্র— আবদুল বাকী ছিলেন একজন। অনুমান করা হয় যে, তাঁকে এবং সিলেটের চা-বাগানের মালিক নির্মল চৌধুরীকে বন্দিশালা থেকে বের করে নিয়ে শহীদ আনোয়ারা স্কুলের পেছনে হত্যা করা হয় ওই মে মাসেই।

ঢাকা থেকে সেপ্টেম্বরে বেবীর ফুপাতো ভাই সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন (তখন অ্যাডভোকেট, পরে বিচারপতি) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভারে চলে যান সপরিবার এবং দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। অক্টোবরে তিনি চিঠি লিখে কলকাতায় আমাদের জানান যে, চাচা শহীদ হয়েছেন। খবর পেয়ে ছোটফুপু ও বেবীর যে অবস্থা হয়, তা অবর্ণনীয়।

তবে এমন অবর্ণনীয় অবস্থা শুধু দুএকজনের ছিল না। সেজন্যে ভয় ছিল, দেশের মধ্যে মৃত্যুপুরীতে বসে মানুষের ধৈর্য কতদিন থাকবে!

অক্টোবরে আমি আবার আগরতলায় যাবো বলে মনস্থ করলাম। মূলত আমার গাড়ি আনতে। আমার পরিচয় দিয়ে গাড়িটা কলকাতায় আনার সুযোগ দেওয়ার জন্যে মন্ত্রিসভা-সচিব এইচ টি ইমাম একটা আধা-সরকারি চিঠি লিখে দিলেন ত্রিপুরা সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিবকে। সেই চিঠি এবং একজন পেশাদার চালক

AMARBOI.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগ্রহ করে এবারে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস–যোগে আগরতলায় পৌঁছোলাম অক্টোবর মাসের ২০ তারিখ নাগাদ।

যাওয়ার আগে কাউকে চিঠি দিয়েছিলাম। সেই সুবাদে জানতে পারলাম, ক্র্যাফটস হস্টেলে আমার জায়গা হয়েছে। ক্র্যাফটস হস্টেলে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বা শুভার্থীদের বাস। ওখানে তখন থাকেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জ্ঞান চক্রবর্তী। সকলে ওঁকে জিজ্ঞেস করেই সব কাজ করতো। জ্ঞানদা বলে দিলেন, উনি যে ঘরে থাকেন, সে–ঘরেই যেন আমার থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। ক্র্যাফটস হস্টেলে ঘরে ঘরে ঢালাও বিছানা। যতজন পারছেন, যে যেখানে পারছেন, শুয়ে পড়ছেন। বেশির ভাগেরই বাঁধা কোনো জায়গা নেই থাকার। সুতরাং আমি কাকে স্থানচ্যুত করলাম, তা বুঝতে পারলাম না।

অক্টোবরের ওই সময়ে ক্র্যাফটস হস্টেলে বেশির ভাগেরই মন–মেজাজ ভালো। কমিউনিস্ট পার্টির দু–দুটি দলের আনুষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তি হয়ে গেছে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে মুক্তিবাহিনীর সাফল্য বেড়েছে, গেরিলা–তৎপরতা বেড়েছে। 'মুক্তি' শুনলে পাক–সেনারা ভয় পায়, এমন একটা কথা প্রচলিত হয়ে গেছে। দেশের স্বাভাবিকতা–প্রদর্শনে পাকিস্তানিদের প্রচেষ্টার অসারতা নিয়ে নানারকম কৌতুক মুখে মুখে ছড়াচ্ছে।

তবে আমি আগরতলায় থাকতেই খারাপ খবর শুনলাম : মেজর খালেদ মোশাররফ আহত হয়েছেন। শত্রুসেনার আক্রমণে গুরুতররূপে আহত অবস্থায় তাঁকে চিকিৎসার জন্যে পাঠানো হয়েছে। মস্তিষ্কের অপারেশন অনিবার্য। বাঁচবেন কিনা বলা যায় না। বলা বাহুল্য, মনটা বিষণ্ন হয়ে গেলো। আমার মনে হলো, এ–সময়ে নিউরো–সার্জন রশীদউদ্দিন আহমেদ থাকলে কত না ভালো হতো!

আনন্দ ও বিস্ময়ের সঙ্গে ক্র্যাফটস হস্টেলের বাসিন্দা হিসেবে আবিষ্কার করলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল অফিসার ডা. আবুল বশরকে। ছয় মাসের বেশি সময় পরে দেখা। তিনি পরিবার রেখে এসেছেন সন্দ্বীপে, নিজের বাড়িতে, ঘুরেছেন বিস্তর; আপাতত আগরতলায় আছেন, কিন্তু এখানেই যে থাকবেন তার নিশ্চয়তা নেই। প্রকৃতিগতভাবে ড. বশর একটু সিনিকাল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তিনি আছেন, কিন্তু তার সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত নন। আমি তাঁকে পরামর্শ দিলাম, চিকিৎসক হিসেবে সরকারি কাজে যোগ দিতে। তিনি যে পরামর্শটা মানবেন না, তা বুঝতেও আমার বেগ পেতে হয়নি। অথচ আমাদের চিকিৎসকের প্রয়োজন ছিল।

প্রয়োজনটা কেমন ছিল, তা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হলো এক বিকেলে। আগরতলার কাছেই এক গ্রামে হাবুল ব্যানার্জি নামে এক ভদ্রলোকের বিশাল বাগানে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের ফিল্ড হাসপাতাল। সেখানে সেবিকা হিসেবে কাজ করে বেগম সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে—আমার সহোদরাতুল্য সুলতানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামাল ওরফে লুলু, আর সাঈদা কামাল ওরফে টুলু। ওদের খোঁজেই গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে পেলাম আরেক ঘনিষ্ঠজন ডালিয়া সালাহউদ্দিনকে—ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ও উদীয়মান নৃত্যশিল্পী। ডালিয়ার পিতামহ ছিলেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার স্বনামধন্য স্পিকার জালালউদ্দিন হাশমী। ডালিয়া পরে যাকে বিয়ে করে, শামসুদ্দীন তার নাম, সে-ও ওই হাসপাতালেই কর্মরত ছিল, কিন্তু আমি যখন যাই, তখন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। পরে জানতে পারি যে, ডা. সেতারা বেগম বীরপ্রতীকও এই হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন।

হাসপাতাল বলতে যা বোঝায়, তার সঙ্গে এর বিশেষ মিল ছিল না। বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি কটি ঘর, অনেকগুলো বিছানা, রোগীরা বেশির ভাগ গোলাগুলির আঘাতে আহত। হাসপাতালে ডাক্তার কম, উপকরণ সামান্য, চাহিদার তুলনায় সেবিকা অপ্রতুল। এতোকিছুর অভাব সত্ত্বেও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন। ডাক্তার ও সেবিকারা প্রাণপণে খাটছেন, রোগীরা অসম্ভব ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছেন।

একদিন খবর পেলাম, প্রথিতযশা চিকিৎসক ড. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী এসেছেন আগরতলায়, একটা বাড়ি ভাড়া করে আছেন। খবর পেয়েই দৌড়োলাম তাঁর কাছে, পূর্বপরিচয়ের সূত্রে—দেখলাম সপরিবারে এসেছেন। কুশলবিনিময়ের পর আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম শহীদুল্লা কায়সারের কথা (পাঠকেরা অনেকেই নিশ্চয় জানেন যে, শহীদুল্লা তাঁর ভায়রা ছিলেন)। ডা. চৌধুরী বললেন, 'আমি তো রাজনীতি করি না, শহীদুল্লা করে। আমি যখন বুঝলাম, আর থাকা যাবে না, তখন চলে এসেছি। শহীদুল্লা নিশ্চয় বুঝেশুনেই রয়ে গেছে।' ডাক্তার সাহেব তখন খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন তাঁর পিতা আওয়ামী লীগ–দলীয় জাতীয় পরিষদ্–সদস্য কফিলউদ্দীন চৌধুরীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে। কফিলউদ্দীন সাহেব মুক্তিযুদ্ধের গোড়ার দিকেই ভারতে চলে আসেন, কিন্তু প্রায় প্রথমাবধিই তিনি ছিলেন অসুস্থ। আমরা যখন তাঁর বিষয়ে কথা বলছিলাম, তখন সম্ভবত তিনি হাসপাতালে ছিলেন। ডা. চৌধুরীর কাছে জানতে চাইলাম তাঁর পরিকল্পনার কথা, বাংলাদেশ সরকারে তিনি যোগ দেবেন কিনা। তিনি বললেন, তখনো কিছু স্থির করেননি, ভাববার সময় চান আরো। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি সরকারে যোগ দেন নি, তবে স্বাধীন বাংলা বেতার–কেন্দ্র থেকে কয়েকটি কথিকা প্রচার করেছিলেন। আমরা কথা বলছি, এমন সময় কামান–গর্জনের আওয়াজ হলো, রাস্তায় লোক ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেলো। তাঁর নিষেধ না মেনে দ্রুত বেড়িয়ে পড়লাম তাঁর বাসা থেকে। পূর্ব-অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এ সময়ে রিকশাওয়ালারা নিজের নিজের বাড়ির দিকে ছোটে, তখন একই পথের যাত্রী পেলে তুলে নেয়, পরে রিকশা পেতে বেশ কষ্ট হয়।

আগরতলা থেকে খানিকটা দূরে এক শরণার্থী-শিবিরেও গিয়েছিলাম। ঢাকার টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক মুহম্মদ মুহিয়্যুদ্দীন (সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে ছিলেন পরিবার নিয়ে। তিনি কাউকে বলে রেখেছিলেন যে, আমি আগরতলায় এলে যেন তাঁর আশ্রয়ের খবর জানানো হয় আমাকে। খবর পেয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা নিচে খোলা মাঠের মতো জায়গায় বাঁশের বেড়ার সার সার ঘর। তারই মধ্যে একটায় তিনি আছেন। তাঁর পুত্রেরা—টেলিভিশনের সংবাদ-পাঠক হিসেবে সুপরিচিত—শামীম আহমদ ও ইমতিয়াজ নাসিমউদ্দিন—তখন বেশ ছোট। ঘরের মধ্যে জায়গার অভাব, পুরীষের গন্ধে বসা দুষ্কর। মুহিয়্যুদ্‌দীন সাহেব খুব খুশি হলেন আমাকে দেখে। বললেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছিলেন, পাকিস্তানি বিমানের আক্রমণের পর মূলত পায়ে হেঁটে পালিয়ে এসেছেন। যে-পরিবেশে তিনি থাকতে বাধ্য হচ্ছিলেন, তাতে তাঁর মন স্বাভাবিকভাবেই খুব খারাপ ছিল। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম রোজার দিনে ইফতারের সময়ের কিছু আগে। মুড়ি আর ছোলা দিয়ে ইফতার করলেন তিনি—আমি রোজা নেই জেনেও জোর করে তার ভাগ দিলেন।

প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য নজরুল ইসলাম ছিল আমার শিক্ষকতা-জীবনের একেবারে প্রথম পর্যায়ের ছাত্র। আগরতলার উপকণ্ঠে বাসা ভাড়া করে তখন সে সপরিবার থাকতো। এক রাতে তার বাসায় খেতে গেলাম। হারিকেনের মৃদু আলো ঘরটা যতটুকু আলোকিত করেছিল, আমাদের আশার আলো তার চেয়ে খুব বেশি দীপ্ত ছিল না।

আগরতলায় আমার দেখা হয়েছিল ডা. সারোয়ার আলীর সঙ্গে—সে তখন আলাদা বাসা করে থাকছে। কমরেড অনিল মুখার্জিও কারো বাসায় থাকছিলেন। স্থানীয় শুভার্থীদের মধ্যে দেখা হয়েছিল কে পি দত্ত, অনিল ভট্টাচার্য ও কার্তিক লাহিড়ী প্রমুখ সজ্জনের সঙ্গে। কার্তিক লাহিড়ীর কাছেই জানতে পেরেছিলাম যে, অকস্মাৎ মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমাদের বন্ধু বদরুল হাসানকে রাখতে হয়েছিল জেলখানার ভিতরে মানসিক ওয়ার্ডে—কেননা, বাইরে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তখন একটু ভালোর দিকে—তাকে কলকাতায় পাঠানোর চেষ্টা চলছে।

এদিকে যে কাজে এসেছি, সে কাজের কোনো অগ্রগতি নেই। শরণার্থীদের আধিক্যের ফলে অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হবে মনে করে ভারত সরকার ত্রিপুরা রাজ্য-সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অধিকাল ভাতা (ওভারটাইম অ্যালাওয়েন্স) মনজুর করেছেন। ফলে, কর্মকর্তা যদি সকালে আসেন তো কর্মচারী আসেন সন্ধ্যায়। তৌফিক ইমামের চিঠিটা প্রাপকের হাতে পৌঁছোতেই সময় লেগে গেলো অনেক। তারপর তিনি 'পরদিন' আসতে বলেন নিয়মিত। ২৮ অক্টোবর অনুমতি পাওয়া গেলো। দুপুরে ভাত খেয়েই রওনা হলাম। আগরতলা থেকে কলকাতা সড়কপথে বারো-তেরো শ মাইল দূরে। পথে সামান্য বিশ্রাম করে রাতে না থেমে করিমগঞ্জ ও শিলং হয়ে গৌহাটি পৌঁছালাম পরদিন রাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩০ তারিখে সকালে গৌহাটি থেকে বেরিয়ে কুচবিহার হয়ে শিলিগুড়িতে এলাম সন্ধ্যার আগে। সেখানে আরেকটি রাত কাটিয়ে কলকাতা পৌঁছোলাম ৩১ অক্টোবর রাতের বেলায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩.

শরণার্থী–জীবনের অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তা আমাদের অনেককে কিভাবে সংকটের আবর্তে ফেলছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম এ রকীব, অধ্যাপক মোসলেম হুদা এবং সম্ভবত আরো কেউ কেউ ভারত থেকে ফিরে গেলেন স্বদেশের বন্দীশালায়। এতে আমরা খুব উদ্‌বিগ্ন হয়েছিলাম। কেননা যাদু মিয়ার মতো রাজনীতিবিদ দেশে ফিরে গিয়ে পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের পক্ষে কাজ করেছিলেন; রশীদুল হাসানের মতো সরকারি আমলা ফিরে যাওয়ায় বাংলাদেশ সরকার বিব্রত হয়েছিলেন। তবে ফিরে যাওয়া অধ্যাপকদের যদিও অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে পাকিস্তান–কর্তৃপক্ষ, তবু তাঁদের দিয়ে—আমার জানামতে—বাংলাদেশ–বিরোধী কোনো প্রচারণা করাতে পারেনি।

ওদিকে তাজউদ্দীন খুব উদ্‌বেগ প্রকাশ করে বিবৃত করলেন এক নাটকীয় ঘটনা। সাদেক খান লন্ডনে গেছেন, যাওয়ার পথে হিথরো বিমানবন্দরে ফেলে গেছেন অস্ত্রশস্ত্রের এক তালিকা। কোনো সূত্রে সে-তালিকা পৌঁছে যায় লন্ডনের ভারতীয় হাই কমিশনে। তাঁরা লন্ডনের বাংলাদেশ মিশনকে জিজ্ঞাসা করেন সাদেক খানের মিশন সম্পর্কে, কিন্তু বাংলাদেশ মিশন কিছু জানাতে অপারগ হন। ভারতীয় হাই কমিশন তাঁদের মন্তব্যসুদ্ধ তালিকা পাঠান দিল্লিতে। ভারত সরকার তালিকার একটা প্রতিলিপি পাঠান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে এবং বিষয়টা সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে চান। তাজউদ্দীন খোঁজখবর করে যা জানতে পারেন, তা থেকে দুটি বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হন। তালিকার একজন প্রণেতা ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ; আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামরুজ্জামান লন্ডনে যেতে সাদেক খানকে সাহায্য করেন, তবে সে-বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে তিনি কিছু জানান নি। দিল্লি থেকে কাগজপত্র পাওয়ার পরে কামরুজ্জামানকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে প্রধানমন্ত্রীকে তিনি জানান যে, বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারের কাজে সাদেক খান লন্ডনে যাচ্ছেন

বলে তাঁর ধারণা হয়েছিল; তিনি তাঁর যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন এবং বাংলাদেশ মিশনের কাছে একটা পরিচয়পত্রও লিখে দেন। তবে সাদেক যে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, তা তিনি জানতেন না এবং অস্ত্রের তালিকা কারা তৈরি করেছেন, তাও ছিল তাঁর অজানা। পুরো ব্যাপারটায় তাজউদ্দীন খুব বিব্রত বোধ করেন। তিনি ভারত সরকারকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, বাংলাদেশ সরকার অস্ত্রশস্ত্র-লাভের কোনো বিকল্প সূত্র সন্ধান করছেন না এবং সাদেক খানের সফর ও শপিং লিস্টের সঙ্গে সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি লন্ডনের বাংলাদেশ মিশনকেও সাদেক খানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে নিষেধ করে দেন। তবে যাঁরা সাদেক খানকে তালিকা তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং 'জেনেশুনে' যাঁরা তাঁকে বিদেশ যেতে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদেরকে 'কাজটা অনুচিত হয়েছে' বলা ছাড়া আর কী করতে পারেন, তা বুঝতে পারছেন না।

ঘটনার যে-ভাষ্য সাদেক খানের কাছ থেকে পাই, তা এরকম ঃ যুদ্ধসামগ্রীর অপ্রতুলতাহেতু মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ এবং আরো দু-একজন সেক্টর-কম্যান্ডার সরাসরি কিছু সরঞ্জাম–সংগ্রহের উদ্‌যোগ নিতে সাদেক খানকে অনুরোধ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়টা জানতেন এবং তিনি লন্ডনে আমাদের মিশন–প্রধান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কাছেও সাদেক খানের পরিচয় ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট সেক্টর-কম্যান্ডাররা প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা তৈরি করে দেন এবং নমুনাস্বরূপ কিছু তাজা কার্তুজও (খোসা নয়) সঙ্গে দিয়ে দেন। আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির সক্রিয়তার কারণে তখন ব্রিটিশ কাস্টমস অতিরিক্ত সতর্ক ছিল। ফলে বাক্স তল্লাস করে গুলি উদ্ধার করতে তাদের বেগ পেতে হয়নি। সাদেক খান তখন তাঁর সফরের প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং যুদ্ধসামগ্রীর তালিকা ও বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া পত্র দেখান। গুলিগুলো বাজেয়াপ্ত করে কাস্টমস তাঁকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু বাক্স বন্ধ করার সময়ে তালিকাটা সেখানেই রয়ে যায়। কাস্টমসের মধ্যে হোক, বাইরে হোক, ভারতের কোনো 'চর' সেটা নিয়ে লন্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনে পৌঁছে দেয় এবং তাঁর সম্পর্কে খবর দেয়। হাই কমিশন বাংলাদেশ মিশনের কাছে এ-বিষয়ে জানতে চাইলে তাঁরা কিছু জানাতে পারেননি। পরে সাদেক খান যখন বাংলাদেশ মিশনে যান, তখন বিচারপতি চৌধুরী তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি, তবে মিশনের কারো কারো সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলেন। তালিকা সঙ্গে না থাকায় এবং মিশনের সহযোগিতা না পাওয়ায় তিনি আর কেনাকাটা করতে সমর্থ হননি। লন্ডন থেকে তিনি তখন চলে যান প্যারিসে এবং সেখানে আঁদ্রে মলরোর সঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলাপ করেন। সাদেক খান বলেন যে, বাঙালিদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই বিশিষ্ট মনীষীকে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা অবহিত করেন। একথা এখন সকলেরই জানা যে, আঁদ্রে মলরো ওই বয়সেও বাংলাদেশের মুক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

ঈদের কদিন আগে তাজউদ্দীন আমাকে ডেকে পাঠালেন। স্বভাবতই বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা হলো। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বিদেশ-সফরের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি কিছুটা ধারণা দিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, বঙ্গবন্ধুর বিচারের ফল যাই হোক, বিশ্বজনমতের কারণেই, পাকিস্তানিরা তাঁকে হত্যা করতে পারবে না। মুক্তিযুদ্ধ যে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না।

কথাবার্তার শেষে উঠে গিয়ে ঘরের মধ্যে রাখা আয়রন সেফ থেকে একটা খাম বের করে তিনি আমার হাতে দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম : 'কী এটা?' তিনি বললেন । 'সামনে ঈদ, তাই।' খামে পাঁচশ টাকা ছিল—তখন আমার এক মাসের মাইনের সমান। আমি নিতে চাইলাম না। তিনি বললেন : 'ঈদে আপনার বাচ্চাদের তো আমি উপহার দিতে পারি, নাকি-।' কথাটা বলতে গিয়ে তিনি নিজেই ভাবাবেগপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন, আমিও খুব অভিভূত হয়ে কিছু আর বলতে পারিনি।

তাঁর এ ধরনের ভাবাবেগের পরিচয় আমি আরো পেয়েছিলাম। এক সকালে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি, তাঁর চুল উসকো-খুসকো, চোখদুটি লাল। জানতে চাইলাম, শরীর খারাপ কিনা। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, 'না'। তারপর যা বললেন, তা এই : আগের রাতে তুমুল ঝড়বৃষ্টিতে তাঁর ঘরের জানালার পাল্লা খুলে গিয়েছিল। জানলা বন্ধ করতে গিয়ে তিনি ঝড়বৃষ্টির প্রবলতা অনুভব করলেন। বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, জানলা লাগিয়ে, তিনি শুয়ে পড়লেন, কিন্তু সারারাত আর ঘুমোতে পারলেন না। তাঁর কেবল মনে হচ্ছিল, যারা শরণার্থী-শিবিরে আছে, এই রাত কী দুর্দশার মধ্যেই না তারা কাটাচ্ছে!

মানুষের প্রতি এ-ধরনের ভালোবাসা ও কর্তব্যবোধ থেকে তাঁকে রাগ করতেও দেখেছি। একবার আমার উপস্থিতিতেই তাঁর কাছে নালিশ এলো, আমাদের তরুণ মুক্তিযোদ্ধার একটি দল বাংলাদেশের ভেতরে অপারেশনে এসে এক গৃহস্থের ছাগল জোর করে নিয়ে জবাই করে খেয়ে ফেলেছে এবং তাতে ওই এলাকায় একটু বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি তক্ষুনি তাঁর সামরিক লিয়াজোঁ অফিসার মেজর নূরুল ইসলাম (শিশু)-কে ডেকে পাঠালেন। নূরুল ইসলাম এলে তিনি ঘটনাটা বিবৃত করে বললেন প্রধান সেনাপতিকে তা জানাতে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে। আমরা যতই তাঁকে বলি যে, এসব ছেলে যে-অবস্থায় থাকে, তাতে এটুকু করা অস্বাভাবিক নয়, তিনি কিছুতেই শুনতে চান না। তাঁর যুক্তি : দেশের মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তারা এমনিতেই তাদের সাহায্য করবে। মুক্তিযোদ্ধারা সামান্যতম জিনিসও কেন জোর করে নেবে? তাহলে পাকিস্তানিদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য রইলো কোথায়? ওই গৃহস্থের ক্ষতিপূরণ করতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের ওই দলকেই, নইলে তাদের ডিসব্যান্ড করে দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। কর্নেল ওসমানীকে অবহিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেজর নূরুল ইসলাম চলে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী বললেন, এর আগেও এমন দু-একটি ঘটনার কথা তিনি জেনেছেন এবং যথারীতি জানিয়েছেনও, কিন্তু প্রতিকার হয়নি। দেশের মানুষকে ভালোবাসতে না শিখলে কি কেউ মুক্তিযুদ্ধ করতে পারে?

নভেম্বরের শেষদিকে কয়েকদিনের জন্যে মেয়েদের নিয়ে বেবী মামাবাড়ি মুর্শিদাবাদের সালারে যেতে চাইলো। স্থির হলো, আমি ওদের সেখানে রেখে চলে আসবো, আবার কদিন পরে নিয়ে আসবো। এমনি সময়ে তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তিনি যখন শুনলেন, আমি কলকাতার বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি, তখন বললেন, 'সময়টা ঠিক বাছেন নি। সামনেই একটা-কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তখন কলকাতার বাইরে থাকাটা ঠিক হবে না।'

তবু গেলাম। নিয়মমাফিক কলকাতায় পুলিশকে জানালাম বাইরে যাওয়ার কথা এবং সালারে গিয়ে পৌঁছোনোর সংবাদ থানায় দাখিল করলাম। সেখানকার থানার ও সি খুব কৌতুক অনুভব করলেন। বললেন, 'এ সময়ে এত লোক আসছে-যাচ্ছে, কে কার খবর রাখছে! আপনি অনর্থক নিজেও কষ্ট করলেন, আমাদেরও কাজ বাড়ালেন।' পরিকল্পনামাফিক পরিবার রেখে এলাম সালারে, পরে আবার আনতে গেলাম। বহুকাল পরে ঢাকা বেতার-কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনলাম সালারে। সেখানে অনেকেই নিয়মিত ঢাকা শোনেন। বেতারের খবর যা শুনলাম, তাতে মিথ্যের ভাগই বেশি।

AMARBOI.COM

এই সময়েই চৌগাছার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা যাতে দেশের মধ্যে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়, তার জন্যে অনেক সময়ে ভারতীয় বাহিনীর কামান থেকে গোলাবর্ষণ করে তাদের কভার দেওয়া হতো। অনেক সময়ে পাকিস্তানিরা পালটা আক্রমণ করতো। এভাবে সীমান্তে যার যার এলাকা থেকে সংঘর্ষ চলতো, কখনো কখনো নিজের এলাকায় কিছু পিছু হটতে হতো কিংবা আরো এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হতো। ২১ নভেম্বরে বয়রা–চৌগাছায় স্থল ও আকাশপথে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ হয়। সীমান্ত–সংঘর্ষের সূত্র ধরে পাকিস্তানিদের পশ্চাদ্ধাবন করে কয়েকটি ভারতীয় ট্যাংক বাংলাদেশের সীমান্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং জলাভূমিতে আটকে যায়। পাকিস্তান দাবি করে যে, আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে ভারত প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান আক্রমণ করেছে এবং এই সুবাদে সারা পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ঘটনাকে পাক–ভারত যুদ্ধের সূচনা হিসেবে গণ্য করে।

বস্তুতপক্ষে, সম্মুখযুদ্ধের ক্ষেত্রে চৌগাছার যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও দিক্‌পরিবর্তনকারী ঘটনা। এ-সময় থেকে সীমান্তের নানা এলাকায় ভারতীয় ও পাকিস্তানি সেনাদের সংঘর্ষ ব্যাপক হতে থাকে এবং তার সুযোগে মুক্তিবাহিনীও দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক হারে প্রবেশ করে শত্রুকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঘাত করতে সমর্থ হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে মুক্ত অঞ্চলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এমন একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে আমরা সালার থেকে কলকাতায় ফিরে আসি। আমার অনুপস্থিতিতে আমাদের প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গে ডি পি ধরের একটি বৈঠক হয়। এতে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তীকালে বাংলাদেশের পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হয়। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল, মুক্তি নিকটতর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুক্তরাজ্য হয়ে ড. মল্লিক এ-সময়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। তিনি আমাকে একটা কার্ডিগান উপহার দেন। হয় তিনি এটা আমার কথা মনে করে কিনেছিলেন, নয়তো তাঁর এক প্রবাসী আত্মীয়া তাঁর পরিবারের সদস্য ও সঙ্গীদের জন্যে উপহারস্বরূপ যে-অনেকগুলো নতুন গরম কাপড় দিয়েছিলেন, এটা ছিল তার একটা।

তবে তার আগে নিজের খরচে আমাকে একটা গরম ট্রাউজার বানাতে হয়েছিল। সেটাও একটা ঘটনা বই কি!

কদিন ধরে দাঁতের ব্যথায় ভুগছিলাম। সুবা ভাইকে সঙ্গে নিয়ে দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাবো। তার আগে ট্রাউজারের জন্যে গরম কাপড় কিনবো। ট্রামে করে পার্ক সার্কাস থেকে ধর্মতলার মোড়ে নামলাম। তারপর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর দোকান ঘুরে ঘুরে শস্তায় এক টুকরো কালো কাপড় কেনা গেল। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে ডেন্টিস্টের চেম্বারে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে টের পেলাম, কেনা কাপড় ট্যাক্সিতেই ফেলে এসেছি। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে দাঁতের ব্যথা ভালো হয়ে গেল—আরেকদিন যেতে বলেছিলেন, যাওয়া হয়নি। কিন্তু সেই কাপড়ের দোকানে আরেকদিন এসে কাপড় কিনে দরজিকে দিয়ে ট্রাউজার বানাতে হলো। দুই পিস কাপড়ে একটা ট্রাউজার।

সেই ট্রাউজার আর কোথেকে-পাওয়া একটা হাত-কাটা সোয়েটার পরে কলকাতার শীত কেটে যাচ্ছিল। মল্লিক সাহেবের দেওয়া কার্ডিগানটা পেয়ে ভারি আরাম বোধ হলো। আর তিনি ফিরে আসায় আমাদের পুরোনো আড্ডাটা আবার ভালো করে জমে উঠল। মাঝখানে বেশ কিছুদিন অনিরুদ্ধ রায় আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে লেখাপড়ায় মনোযোগ দিয়েছিল। ব্যারি মরিসনের কাজ করার চেষ্টা যে দু-একদিন করেছিলাম, তখন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। অনিল সরকার অবশ্য ক্লান্তিহীনভাবে আমাদের সঙ্গে ছিল। এতদিন পরে অনিরুদ্ধ আবার ফিরে এলো। আমরা তিনজন এবং মাঝে মাঝে মল্লিক সাহেবকে নিয়ে চারজন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জল্পনাকল্পনা করে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতে থাকলাম।

১ ডিসেম্বর গভীর রাতে টেলিফোন এলো মাহমুদ শাহ্ কোরেশীর। তার স্ত্রী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাসরীন সন্তানসম্ভবা ছিল। কোরেশীকে বলে রেখেছিলাম, নাসরীনকে স্থানান্তর করার সময় এলে যেন আমাকে খবর দেয়। টেলিফোনে সেই বার্তাই জানলাম। গাড়ি নিয়ে গেলাম গোবরার দিকে ওদের বাসায়, সেখান থেকে ওদের তুলে নিয়ে পার্কভিউ নার্সিং হোমে। ২ তারিখ সকালে তাদের প্রথম সন্তানের জন্ম হলো। সৈয়দ আলী আহসান নাতির নাম রাখলেন পূষণ। পূষণ সূর্যের এক নাম। কোরেশীর ঘরে পূষণ এলো, আমরা জাতির জীবনে সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় রইলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪.

ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় আসবেন ৩ ডিসেম্বর, ময়দানের জনসভায় বক্তৃতা দেবেন। চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। তিনি কলকাতায় এসে কী করবেন এবং তাঁর ভাষণে কী বলবেন, দেখা গেল, এ–সম্পর্কে অনেকের কাছেই নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর আছে। কেউ বললেন, তিনি বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি জানাবেন; কেউ বললেন, তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন; কেউ বললেন, আরে যুদ্ধ ঘোষণা নয়—বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, এ কথাই তিনি প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করবেন। যদি জিজ্ঞেস করি, এসব কথা লোকসভায় জানান না দিয়ে জনসভায় বলবেন কেন, তার উত্তরে গূঢ় তত্ত্বজ্ঞেরা মুচকি হেসে বলেন, ওটাই তো স্ট্র্যাটেজি—যেখানে লিস্‌ট এক্‌স্‌পেক্‌টেড, সেখানে কিছু–একটা করে শত্রুকে আউটউইট করে দেওয়া।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের লোককে কী বলবেন, সেকথা তো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা যায় না। তাছাড়া তিনি খুব ব্যস্ত—ব্রিগেডিয়ার, ততদিনে মেজর–জেনারেল, বি এন সরকার ঘন ঘন আসা–যাওয়া করছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব-অনুযায়ী যেন জাতিসংঘ-পর্যবেক্ষক দল সীমান্ত এলাকায় তদারকি করার সুযোগ না পান, সেটাই তাজউদ্দীন নিশ্চিত করতে চান প্রথমে। তারপর গেরিলা–কার্যকলাপ ও সম্মুখ–যুদ্ধের তীব্রতা বাড়ানোর প্রশ্ন তো রয়েছেই।

ড. মল্লিক চাইলেন, আমরা কজন যেন তাঁর সঙ্গে বসে বেতারে ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ শুনি। সেইমতো ৩ তারিখ দুপুরের পরই অনিল সরকার, অনিরুদ্ধ রায় ও আমি তাঁর সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউর ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলাম। মল্লিক সাহেব উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছেন না। লোকের কথায় তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, ইন্দিরা যুদ্ধের ঘোষণা দেবেন। সভা আরম্ভ হওয়ার আগে থেকেই ট্রানজিস্‌টর

রেডিও সামনে নিয়ে বসে আছেন তিনি, যুদ্ধঘোষণার সম্ভাবনা সম্পর্কে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলেও বিরক্ত হচ্ছেন।

যথাসময়ে বক্তৃতা হলো। ইন্দিরা অনুত্তেজিত কণ্ঠে সমগ্র পরিস্থিতির বর্ণনা দিলেন। কথা বললেন খুব দৃঢ়তার সঙ্গে, কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা করলেন না; বরঞ্চ বললেন, তিনি যুদ্ধ চান না, শান্তি চান। তাঁর বক্তব্যের একটি অংশ আমার কাছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল, কিন্তু সে-সম্পর্কে তখন আর কথা বলার সুযোগ পাইনি। তিনি বলেছিলেন, শুধু ধর্ম বা ভাষার বন্ধনে মানুষ এক হয় না; মানুষের ঐক্যের জন্যে দরকার হয় উচ্চতর আদর্শবোধ। আমার মনে হয়েছিল, বাংলাভাষী অঞ্চলের বৃহত্তর ঐক্য সম্পর্কে ১৯৭১ সালে যে নানারকম কল্পনাজল্পনা হয়েছিল, পাকিস্তান খণ্ডিত হলে ভারতও খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী কিংবা আশঙ্কাপ্রকাশ করা হয়েছিল, সেকথা স্মরণ করেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ওই উক্তি করেছিলেন।

ইন্দিরার বক্তৃতায় চমকপ্রদ কিছু ছিল না। মল্লিক সাহেব খুব হতাশ হলেন। তিনিই প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বললেন : 'কিছু মনে কোরো না, অনিরুদ্ধ, গোরুর গোশ্‌ত না খেলে বোধহয় রক্ত গরম হয় না।'

সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ থেকে বেরিয়ে আমরা তিনজন এলাম মনোহরপুকুরে—অনিলের শ্বশুরবাড়িতে। হাজরা রোডের হস্টেল ছেড়ে সে কিছুকাল সপরিবার সেখানেই থাকছিল। ওখানে পৌঁছেই রোমহর্ষক খবর পেলাম : আকাশবাণীতে নাকি বলা হয়েছে যে, সন্ধ্যায় পাকিস্তানি বিমানবাহিনী ভারতের বারোটি বিমানঘাঁটি আক্রমণ করেছে এবং ময়দানের জনসভায় বক্তৃতাকালে এই আক্রমণের সংবাদ পেয়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী দিল্লি ফিরে গেছেন। আমরা ও-বাড়িতে বসেই আকাশবাণীর সংবাদ-বুলেটিন এবং বিশেষ ঘোষণা শুনলাম। আক্রান্ত বিমানঘাঁটির মধ্যে ছিল অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, আম্বালা, আগ্রা ও যোধপুর। পশ্চিম সীমান্তে কয়েকটি রেলওয়ে জংশন আক্রান্ত হয়েছে এবং অমৃতসর ও পাঠানকোটসহ কাশ্মীর ও পাঞ্জাব এলাকায় স্থলপথেও আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে। ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। কলকাতাসুদ্ধ অনেক জায়গায় নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। জাতির উদ্দেশে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী রাতেই ভাষণ দেবেন।

পাকিস্তান যে নিজে থেকেই প্রথমে এমন ব্যাপক আক্রমণ করল, তাতে একটু অবাকই হলাম। যদিও এটা সুস্পষ্ট যে, এই আক্রমণের উদ্দেশ্য হলো সমগ্র পরিস্থিতির আন্তর্জাতিকীকরণ, তবু এমন পরিকল্পনা সহজ বুদ্ধির কাছে স্বাভাবিক মনে হয় না। একটা যুদ্ধ বাধিয়ে, তারপর যুদ্ধবিরতি মেনে নিয়ে, জাতিসংঘের শান্তিবাহিনী আনিয়ে পাকিস্তান কি শেষরক্ষা করতে চায়, না বাংলাদেশে তাদের পরাজয় অবধারিত জেনে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে হার না মেনে—চিরশত্রু হলেও অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী—ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর কাছে পরাজয় স্বীকার করে সম্ভ্রম রক্ষা করতে চায়, এ প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকলো। ঘটনা যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনদিকে মোড় নেবে, তা কে বলতে পারে! পরিস্থিতি তো আর কেবল ভারত ও পাকিস্তান নির্ণয় করবে না, বিশ্বশক্তির নানারকম লীলাখেলা তা নিয়ন্ত্রণ করবে।

মনোহরপুকুরে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকেও ইন্দিরার ভাষণ শুনতে পেলাম না। তিনি যে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন, সে-কথাই বেতারে বারবার ঘোষণা করা হচ্ছিল। সুতরাং যতদ্রুতসম্ভব গাড়ি চালিয়ে নিজের ডেরায় ফিরে এলাম। পথঘাট ততক্ষণে অনেকখানি ফাঁকা হয়ে গেছে। ফিরে দেখি, এ-বাড়িতেও প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই রেডিও-সেটের সামনে বসে। মধ্যরাত্রি বা তার একটু পরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বেতার-বক্তৃতা শুনলাম। তাতে অপ্রত্যাশিত কিছু ছিল না, তবে তার একটি কথা এখনো মনে আছে : এতকাল ধরে যে যুদ্ধ চলছিল বাংলাদেশে, এখন তা ভারতের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। সে-রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময়ে মনে হয়েছিল, শেষ পালা শুরু হলো।

৪ তারিখের প্রচার-মাধ্যমে প্রাধান্য পেয়েছিল পশ্চিম রণাঙ্গণের খবর। পাকিস্তানের বিমান-আক্রমণের জবাবে করাচি-লাহোরে ভারতীয় বিমানবাহিনীর হামলা; সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে স্থলপথে যুদ্ধ শুরু; পাকিস্তানের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি। কিছুটা ভারতীয় প্রচারমাধ্যমের সূত্রে, কিছুটা আমাদের দায়িত্বশীল লোকের মুখে, কিছুটা স্বাধীন বাংলা বেতার-কেন্দ্রের সংবাদে জানা গেল যে, মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনী সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, যশোর ও দিনাজপুর সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জায়গা করে নিয়েছে; বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ছোট বিমান নিয়ে চট্টগ্রাম ও গোদনাইলে আক্রমণ চালিয়েছে; ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকা ও যশোরে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর সম্পূর্ণ শক্তি নষ্ট করে দিয়েছে; ভারতীয় নৌবাহিনীর আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কক্সবাজার বিমানবন্দর।

ওদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন কোনো সামরিক উদ্‌যোগ নেবে কিনা, সে-সম্পর্কে আমরা সবাই চিন্তিত। সেই সঙ্গে উদ্‌বিগ্ন জাতিসংঘে কী হয়! সম্মুখ-যুদ্ধের পাশাপাশি চলছে কূটনৈতিক লড়াই। সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সহযোগিতা পাবে পাকিস্তান। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যান্ডের সাহায্য নিয়ে ভারত কতটা পেরে উঠবে তার সঙ্গে? ব্রিটেন ও ফ্রান্স কী ভূমিকা পালন করবে শেষ পর্যন্ত, তাও অনিশ্চিত।

৫ ডিসেম্বর ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিল বাংলাদেশকে। আমাদের আনন্দ দেখে কে! এর প্রতিক্রিয়ায় ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে ছিন্ন করলো পাকিস্তান, আর যুক্তরাষ্ট্র নিন্দা করলো ভারতের। কিন্তু তখন আমাদের প্রত্যেকের ভাবটা এই যে, আমরা ওসবের পরোয়া করি না। ৭ ডিসেম্বর ভুটান স্বীকৃতি দিল বাংলাদেশকে।

বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিদানের পরপরই (তারিখটা খুব সম্ভব ৮ ডিসেম্বর) আনুষ্ঠানিকভাবে ও নতুন করে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম্যান্ড গঠিত হয় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং-ইন-চিফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোর নেতৃত্বে। শুনেছি, যৌথ কম্যান্ড-গঠনের এই দলিলে ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী উভয়েই স্বাক্ষরদান করেন।

সেইসঙ্গে আরো কিছু শুনেছিলাম, কিন্তু তার সত্যাসত্য নির্ধারণ করা সহজ নয়। তবু কথাগুলি লেখা যাক।

ভারত ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যৌথ কম্যান্ড প্রকৃতপক্ষে গঠিত হয় অক্টোবর মাসের দিকে। স্বভাবতই বৃহত্তর সামরিক শক্তি হিসেবে, বড় দেশ হিসেবে, এবং আমাদের আশ্রয়দাতা হিসেবে, এই যৌথ কম্যান্ডের নেতৃত্বভার অর্পিত হয় ভারতীয় সেনানায়কদের ওপরে। আমাদের প্রধান সেনাপতি তা পছন্দ করেননি। তাঁর মনে হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধটা যেহেতু বাংলাদেশের, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী সেখানে সহায়ক শক্তিমাত্র। তাই যৌথ কম্যান্ডের নিয়ন্ত্রণভার থাকা উচিত বাংলাদেশের হাতে। তত্ত্বের দিক দিয়ে এ ভাবনা যতই যুক্তিপূর্ণ হোক না কেন, বাস্তবে তার প্রয়োগ সম্ভবপর ছিল না। একটা বড় সামরিক বাহিনীর পক্ষে তার প্রতি নির্ভরশীল একটা ছোট সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব মেনে নেওয়া স্বাভাবিক নয়। ভারতীয় সেনা-কর্মকর্তাদের অনেকেই কর্মজীবনে কর্নেল ওসমানীর কনিষ্ঠ ছিলেন; জেনারেল মানেকশকে ওসমানী মানেক বলে সম্বোধন ও উল্লেখ করতেন। ফলে যৌথ কম্যান্ডের নেতৃত্বের ব্যবস্থায় তিনি আহত বোধ করেন এবং দ্বিতীয়বার পদত্যাগের কথা বলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিরস্ত করা যায় এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী আর বাংলাদেশের নিয়মিত ও গেরিলা বাহিনীর কর্মপদ্ধতির যে নীতি স্থিরীকৃত হয়, তাতেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। ডিসেম্বরে যখন যৌথ কম্যান্ডের আনুষ্ঠানিক গঠন হলো উচ্চতম পর্যায়ে, তখন কর্নেল ওসমানী আবার অসন্তোষ প্রকাশ করেন, আবার তাঁকে পদত্যাগে নিবৃত্ত করেন তাজউদ্দীন। ১৩ ডিসেম্বরে কলকাতা ছেড়ে ওসমানী চলে যান রণাঙ্গন পরিদর্শন করতে, সঙ্গে নিয়ে যান জাতীয় পরিষদ-সদস্য এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অফ জেনারেল স্টাফ অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট-কর্নেল (পরে মেজর-জেনারেল) আবদুর রবকে। অপারেশন হেডকোয়ার্টার্স থেকে ওসমানী যে এভাবে দূরে চলে যাবেন, তা কেউ ভাবেন নি। তাঁর চলে যাওয়ার খবরও তাজউদ্দীন জানতে পারেন নি, কেননা তিনি তখন শত্রুমুক্ত যশোর-অঞ্চল সফরে গিয়েছিলেন।

এ কয়দিনে আমাদের সময় কাটছে পাগলের মতো। তীব্র উত্তেজনা, অসম্ভব স্নায়বিক চাপ; কখনো কখনো মনে হয়, ঘুমের মধ্যে হাঁটাচলা করছি। একটার পর একটা খবর আসছে। কোনটা খবর, কোনটা গুজব, তা বলার উপায় নেই—সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। শমসেরনগর, সিলেট, মৌলভীবাজার, যশোর, ঝিনাইদহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া—এক-এক করে এসব শহর মুক্ত হওয়ার কথা শুনছি। মুক্তিবাহিনী

ও ভারতীয় সেনাবাহিনী ঢাকার দিকে ধাবমান। অন্যদিকে নিয়াজী বলেছেন, ঢাকার রাস্তায়–রাস্তায় বাড়ি–বাড়ি যুদ্ধ হবে। কত স্বজন যে আমরা হারাবো, তার নিশ্চয়তা নেই। আবার জানছি, মার্কিন সপ্তম বহর রওনা হয়ে গেছে, ভারত মহাসাগর পেরিয়ে ছুটছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। ভারতীয় নৌবাহিনী ওই এলাকায় বিদেশী জাহাজের চলাচল অবরোধ করবে বলে ঘোষণা করেছে। পাকিস্তানিরা নিশ্চিত, উত্তর দিক দিয়ে চীনা সৈন্য আসছে—তবে তা উত্তর–পশ্চিম না উত্তর–পুব দিয়ে, তা বলা যাচ্ছে না। জাতিসংঘে দ্বৈরথ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

মল্লিক সাহেব অস্থির হয়ে গেছেন ঢাকা মুক্ত হচ্ছে না বলে। একবার তিনি মুগলদের দূরদর্শিতার তারিফ করেন—ঢাকাকে তারা সাধে রাজধানী বানায় নি, এত নদীপথ পেরিয়ে ঢাকায় পৌঁছোনো চাট্টিখানি কথা নয় ; আবার ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর রণকৌশলের সমালোচনা করেন—এত আধুনিক সমরাস্ত্র, প্রকৌশল ও প্রযুক্তির অধিকারী হয়েও তারা ঢাকায় তাড়াতাড়ি পৌঁছোতে পারছে না কেন? তাদের উচিত, বড় শহর ও পাকিস্তানি সেনাদের শক্ত সমাবেশ এড়িয়ে সোজা ঢাকায় চলে যাওয়া। একবার ঢাকায় পৌঁছে গেলেই তো হয়ে গেল! পথে তারা যত দেরি করবে, বাঙালির প্রাণহানি তত বেশি হবে। পাকিস্তানিরা যে পোড়ামাটি–নীতি অবলম্বন করবেই, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

এসব কথা যে মিত্রবাহিনীর বিবেচনায় ছিল না, তা নয়। প্রথম থেকেই দেখা গেছে, ভারতীয় সেনারা মেহেরপুর পাশ কাটিয়ে চলছে ঝিনাইদার দিকে, কুমিল্লা সেনানিবাস এড়িয়ে যাচ্ছে দাউদকান্দির লক্ষ্যে, ফেনীর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে চট্টগ্রামের অভিমুখে। আসলে আমাদেরই ধৈর্য থাকছিল না। দ্রুত মুক্তিলাভের আশায় আমরাও প্রত্যেকে রণনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলাম।

বস্তুত মিত্রশক্তির অবলম্বিত রণনীতির মধ্যে প্রায় সকলরকম কৌশলগত উপাদান ছিল। কোথাও কেবল আমাদের মুক্তিবাহিনী নিজের শক্তিতে অধিকৃত এলাকা মুক্ত করেছে—যেমন, কুড়িগ্রাম বা সুনামগঞ্জ। কোথাও আমাদের গেরিলারা অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে শত্রুকে বিব্রত করেছে—যেমন, ঢাকায় বিভিন্ন অপারেশনে। কোথাও ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেছে—যেমন, কুমিল্লা অঞ্চলে। কোথাও ভারতীয় বাহিনী গ্রহণ করেছে একক ভূমিকা—যেমন, ময়মনসিংহে। পাকিস্তান বাহিনীর সমাবেশের পেছনে হেলিকপ্টার থেকে ভারতীয় সেনারা নামে—যেমন, সিলেট ও ঢাকার অদূরে রায়পুরায়। আবার বিমান থেকে ভারতীয় ছত্রীবাহিনী নামানো হয়—যেমন টাঙ্গাইল–মধুপুরে। এই ছত্রীসেনারা বেসামরিক বাঙালিদের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য ও সমর্থনে বিমান থেকে ফেলে দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র দ্রুত সংগ্রহ করে সম্মুখ–যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়। ট্যাংক নিয়ে মেঘনা নদী অতিক্রম করাও হয়েছিল ঠিক এভাবে। ট্যাংকগুলো নিজের ক্ষমতায় সাঁতার দিয়েছিল। কিন্তু তাদের পথ দেখিয়ে অন্য পারে জায়গামতো নিয়ে গিয়েছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতাকাবাহী শত শত নৌকো। আর তা সম্ভবপর হয়েছিল কেবল এ দেশের সাধারণ মানুষের সহায়তায়। ভারতীয় সেনারা নদী পার হয়েছে যেমন হেলিকপ্টারে, তেমনি স্টিমার ও নৌকোয়। এসব স্টিমার ও নৌকো চালিয়েছে সেই সাধারণ মানুষেরা। খাল–বিল–জলাভূমির বাধা অতিক্রম করতে তারাই সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে মিত্রবাহিনীকে। অজস্র মানুষ কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেছে ভারতীয় সেনাদের কামান–বন্দুক গোলা–বারুদ। তাদের কাছে সেদিন কিছুই অসাধ্য ছিল না, কিছুই অদেয় ছিল না, কেননা মুক্তিলাভের স্বপ্ন ছিল তাদের চোখে।

ভারতীয় বিমানবাহিনীর আক্রমণে প্রথম রাতেই পাকিস্তানিদের অর্ধেক বিমানবহর শেষ হয়ে যায়, বাকিটা হয় পরের দিনরাত মিলে। মাত্র তিনটি বিমান অক্ষত অবস্থায় ঢাকা বিমানবন্দরে রয়ে যায়। ভারতীয় বিমান থেকে সামরিক ঘাঁটির ওপরে আঘাত হানা হয়, রাস্তাঘাট বিধ্বস্ত করে শত্রুপক্ষের যোগাযোগ–ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। তাছাড়া মুক্ত এলাকায় বিমানে করে আরো সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনা সম্ভবপর হয়েছিল। ভারতীয় নৌবাহিনীর বিমান–আক্রমণে ক্ষতি হয় চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের, তবে তাদের আরো বড় সাফল্য ছিল বোধহয় 'গাজি' নামের পাক–সাবমেরিন ডুবিয়ে দেওয়া। উপকূল–অঞ্চলে তাদের তৎপরতা পাকিস্তানিদের যানবাহন নিষ্ক্রিয় করে দেয় এবং জলপথে পালাবার পথও বন্ধ করে দেয়। আমাদের নৌ–কম্যান্ডোরা আগেই সাহস ও সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিল। ছোট বিমানে করে আমাদের বৈমানিকেরাও যে সফল আক্রমণ পরিচালনা করেছিল, তা আগে বলেছি।

স্থলপথে শত্রুর ঘাঁটি জয় করার জন্যে কোথাও যুদ্ধ হয়েছে সামনাসামনি, কোথাও তেমন ঘাঁটি এড়িয়ে অগ্রসর হয়েছে মিত্রবাহিনী। এড়িয়ে যাওয়ার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সম্মুখ–যুদ্ধের বড়রকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল যশোর ও ময়মনসিংহ মুক্ত করার জন্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর কোথাও যুদ্ধ করতে হয়নি। যশোর সেনানিবাস থেকে পাক বাহিনীর সদর দপ্তর নভেম্বরের শেষেই সরিয়ে নেওয়া হয় মাগুরায়। তবু এই সুরক্ষিত সেনানিবাসের পতন না হলে যশোর মুক্ত হবে না, এটাই ধারণা করা হয়। ভারতীয় বাহিনী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, অনেক প্রস্তুতি নিয়ে, অগ্রসর হতে থাকে এবং বাধা না পেয়ে বিস্মিত হয়। বাধা না পাওয়ার কারণ, পাকিস্তানিরা আগেই সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে একদল ঢাকার দিকে, একদল খুলনার দিকে এবং অপেক্ষাকৃত ছোট একটি দল কুষ্টিয়ার দিকে পালিয়ে যায়। যশোর সেনানিবাস যে শূন্য, তা বুঝতে ভারতীয়দের সময় লাগে। তখন পলায়নপর পাকিস্তানিদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়। ময়মনসিংহেও একই ঘটনা ঘটেছিল। ময়মনসিংহ থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের যে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ভৈরবে, মিত্রবাহিনী সে খবর পায়নি। তারা অপেক্ষা করতে থাকে নদীর ওপারে। কোনো প্রতিরোধ হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না দেখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে তারা ময়মনসিংহ মুক্ত করলো পরে।

তবে বড়রকম সম্মুখ-যুদ্ধও হয়েছিল—লাকসামে, ঝিনাইদায়, জামালপুরে, সিলেটে; আখাউড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়ও যুদ্ধ হয়েছিল মন্দ নয়। কিন্তু পাকিস্তানিদের যুদ্ধ-পরিকল্পনার ত্রুটি ছিল বলে বিশেষজ্ঞেরা বলেন। তার চেয়ে বড় কথা, সাধারণ মানুষের ওপরে অকল্পনীয় অত্যাচার চালাবার পরে তাদের মধ্যে থেকে যুদ্ধ করে জয়লাভ অসম্ভব। সমস্ত পরিস্থিতি ছিল পাকিস্তানিদের প্রতিকূলে।

ডিসেম্বরের ৭ তারিখে যশোর ও সিলেট দুইই মুক্ত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যশোরের মুক্তি পাকিস্তানিদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। যশোরে পাকিস্তানিদের লোকবল, সমরাস্ত্র ও রসদের অভাব ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা দুর্গসদৃশ সেনানিবাস ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মুক্ত যশোরে জনসমাবেশে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন ১১ ডিসেম্বরে—এই ছিল শপথগ্রহণের পরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাঁর প্রথম বক্তৃতা।

ওইদিনই ঘোষণা করা হয় যে, বিদেশীদের ঢাকাত্যাগের সুবিধের জন্যে ভারতীয় বিমানবাহিনীর আক্রমণ স্থগিত থাকবে। একই উদ্দেশ্যে ঢাকা বিমানবন্দর খানিকটা মেরামতও করা হয়। ১২ ডিসেম্বর বিদেশীরা তিনটি বিমানযোগে ঢাকা ত্যাগ করে। তার আগে মিত্রবাহিনীর আহ্বানে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর থেকে বিদেশী সকল জাহাজ সরে যায়। এই দুই ঘটনায় সারা বিশ্বের কাছে প্রমাণ হয়ে যায় যে, বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের কোনো কর্তৃত্ব আর অবশিষ্ট নেই।

১৩ তারিখে ঢাকা সেনানিবাসে একদিকে বিমান হামলা হলো, অন্যদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কামানের গোলা এসে পড়তে লাগল তার আশেপাশে। পরদিন গভর্নমেন্ট হাউজে বিমান-আক্রমণ হওয়ায় গভর্নর ড. এ এম মালিক ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ এলাকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নিলেন। সেইসঙ্গে পরিবার নিয়ে সেখানে আশ্রয় নিলেন বহু পাকিস্তানি বেসামরিক কর্মকর্তা। জেনারেল নিয়াজী বাইরের সাহায্যের ভরসায় যুদ্ধ চালিয়ে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছিলেন এতদিন। এখন তাঁর চৈতন্যোদয় হলো। ৮ ডিসেম্বর থেকে ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যাম মানেকশ পাকিস্তানিদের আহ্বান জানাচ্ছিলেন আত্মসমর্পণ করতে। তার এক সপ্তাহ পরে জেনারেল নিয়াজী ঘোষণা করলেন, তিনি আত্মসমর্পণ করবেন।

বড়রকম বিপর্যয় এড়ানো গেল মনে করে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। কিন্তু একটা খবর পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মুক্ত হবার আগে সামরিক বাহিনী ও আল-বদর বাহিনীর সদস্যেরা শহরের কিছু বিশিষ্ট নাগরিককে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। তাঁদের মধ্যে অন্তত একজন আমার পরিচিত— ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজের অধ্যাপক লুৎফর রহমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫.

ডিসেম্বরের ১৫ তারিখে আমরা ধারণা করেছিলাম যে, পরদিন সকাল নটার মধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু ১৬ তারিখ সকালে আকাশবাণী থেকে আত্মসমর্পণের খবর পাওয়া গেল না। জানা গেল যে, সাময়িক যুদ্ধবিরতির সময় দুপুর তিনটে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

আসল ঘটনা কী হয়েছিল, তা জানা যায় পরে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডার এবং খ অঞ্চলের সামরিক আইন-প্রশাসক লেফটেন্যান্ট-জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি রাওয়ালপিন্ডির একটি বার্তা পেয়ে ১৪ ডিসেম্বর বিকেলে স্থির করেন যে, আর যুদ্ধ করা বৃথা। তবে তিনি আত্মসমর্পণের বদলে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়ে একটি বার্তা রচনা করতে বলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলিকে। তাঁরা দুজনে মিলে বার্তাটি হস্তান্তরিত করেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল-জেনারেল স্পিভাকের কাছে, যাতে তিনি তা ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ জেনারেল স্যাম মানেকশর কাছে পাঠিয়ে দেন। স্পিভাক বার্তাটি প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেন ঠিকই, তবে তা দিল্লিতে না পাঠিয়ে পাঠান ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে। মার্কিন প্রশাসন সেটি ভারত সরকারের কাছে পাঠাবেন কিনা, তা জানতে চান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মুহম্মদ ইয়াহিয়া খানের কাছে। প্রেসিডেন্টকে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়নি। ওয়াশিংটন থেকে বার্তাটি দিল্লিতে প্রেরণ করা হয় ১৫ তারিখে। মানেকশ তৎক্ষণাৎ জবাব পাঠান রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খানের কাছে। তাতে বলা হয় যে, পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলেই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হতে পারে। বেতারে যে ফ্রিকোয়েন্সিতে যোগাযোগ করতে হবে, তারও বিবরণ তিনি দিয়ে দেন। পাকিস্তানি চিফ অফ স্টাফ ওই শর্তে যুদ্ধবিরতি করার পরামর্শ দেন নিয়াজিকে।

পাকিস্তানিরা নির্দিষ্ট বেতার-ফ্রিকোয়েন্সিতে যোগাযোগ করতে পারেনি, কেননা, ভারতীয় বিমান-আক্রমণে তাদের যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। ফলে, সাময়িক যুদ্ধবিরতির সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে ঢাকায় নিযুক্ত জাতিসংঘের প্রতিনিধি জন কেলি ও পল মার্ক হেনরির মাধ্যমে রাও ফরমান আলি আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্যে আরো কিছু সময় চেয়ে নেন। সেই অনুযায়ী ১৬ তারিখ বেলা তিনটে পর্যন্ত সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়। এদিকে ১৬ তারিখ সকালে কাদের সিদ্দিকীকে সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর-জেনারেল গন্ধর্ব নাগরা উপস্থিত হন মিরপুরে। তাঁর আগমন-বার্তা জানিয়ে নিয়াজিকে তিনি আহ্বান করেন প্রতিনিধি পাঠাতে। সঙ্গীসহ জেনারেল নাগরাকে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে আসেন ঢাকার প্রতিরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত পাকিস্তানি মেজর-জেনারেল জামশেদ। দুপুরের পর আত্মসমর্পণের দলিলের খসড়া নিয়ে ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছোন ভারতীয় ইস্টার্ন কম্যান্ডের চিফ অফ স্টাফ মেজর-জেনারেল জ্যাকব। তাঁকে অভ্যর্থনা জানান পাকিস্তানি চিফ অফ স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকি। দলিলে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল আরোরাকে অভিহিত করা হয়েছিল পূর্ব রণাঙ্গনে ভারতীয় ও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং ইন চিফ বলে এবং তাঁর কাছেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের কথা। রাও ফরমান আলি এতে আপত্তি জানিয়ে বলেন যে, তাঁরা ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে প্রস্তুত, বাংলাদেশ বাহিনীর কাছে নয়। জ্যাকব বলেন, ওই খসড়া দিল্লি থেকে এসেছে—ওতে পরিবর্তনের অধিকার তাঁকে দেওয়া হয়নি। দলিলটা নিয়াজির দিকে এগিয়ে দিয়ে ফরমান আলি বলেন, এটা মেনে নেওয়া-না নেওয়া কম্যান্ডারের ব্যাপার। নিয়াজি এক পলক খসড়াটা দেখে নিয়ে ফরমান আলির দিকে ঠেলে দেন কোনো কথা না বলে। এটাই তাঁর সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়।

এরপর ঢাকা বিমানবন্দরে হেলিকপ্টারে করে এসে পৌঁছোন সস্ত্রীক জেনারেল অরোরা, আসেন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খোন্দকার। অরোরাকে অভ্যর্থনা জানান স্বয়ং নিয়াজি। সেখান থেকে তাঁরা আসেন রমনা রেস কোর্সে। আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করাতে যে কজন কর্মকর্তা নিয়াজিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যান, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর এ টি এম হায়দার (১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে নিহত)—ক্র্যাক প্ল্যাটুনের সঙ্গে ওদিন সকালে তিনি ঢাকায় প্রবেশ করেছিলেন। ঢাকার সময় বিকেল চারটের কিছু পরে আবেগাপ্লুত হাজার হাজার বাঙালির উপস্থিতিতে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দেন নিয়াজি ও অরোরা।

এসবের কিছু না জেনে কলকাতায় সকাল থেকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সময় কাটাচ্ছি আমি। যুদ্ধবিরতির সময়সীমা কেন বাড়ানো হলো, ১৬ তারিখেই আত্মসমর্পণ হচ্ছে কিনা, পাকিস্তানিরা নতুন কোনো চাল চাললো কিনা, ঢাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণ নাগরিকদের অবস্থা কী, নিশ্চিতভাবে কিছুই জানতে পারছিলাম না। নটার পরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছি। কথা ছিল, অনিল সরকার আর অনিরুদ্ধের সঙ্গে মিলে আত্মসমর্পণের খবর শুনবো। তাছাড়া রেডিও সেটের সামনে বসে থাকার মতো স্থৈর্য ছিল না। আবার ছুটোছুটি করছি বলে বেতারের সর্বশেষ সংবাদও শুনতে পারছিলাম না। শরীর-মনকে গ্রাস করেছে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য, এক অনাস্বাদিত অনুভূতি। এক ফাঁকে বাসায় এসে শুনি, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে আমার ডাক এসেছিল। আবার সেখানে ছুটলাম। গিয়ে শুনলাম, প্রধানমন্ত্রী ব্যস্ত—একটু অপেক্ষা করতে হবে। বললাম, পাশের বারান্দায় অপেক্ষা করছি, তাঁর অবসর হলে আমাকে ডেকে দেবেন।

বারান্দায় একটা টেবিল ঘিরে জটলা। আমি সেখানে যোগ দিলাম। আত্মসমর্পণের খসড়ায় নিয়াজির সম্মতির পরে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়ে দেন, পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণে সম্মত হয়েছে—আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন চলছে। কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে যায়। ওই জটলায় যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই তা জানতেন। সুতরাং তাঁরা সব খোশমেজাজে নানারকম গল্প করছেন। আমি কেবল উদ্‌বিগ্ন, চিন্তাক্লিষ্ট—গালগল্প ভালো লাগছে না।

এক সময়ে গ্রুপ ক্যাপ্টেন খোন্দকারের খোঁজ করলাম। তখনই জানতে পারলাম, আত্মসমর্পণ-অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে তিনি ঢাকায় গেছেন। আত্মসমর্পণ হচ্ছে তাহলে, জানতে চাই আমি।—সে তো ঘন্টাখানেক আগে হয়ে গেছে।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন খোন্দকারের ঢাকা যাওয়ার বৃত্তান্ত পরে শুনেছিলাম। কর্নেল ওসমানী সেই যে ১৩ তারিখে কলকাতার বাইরে চলে যান, তারপরে তিনি আর ফিরে আসেন নি। ১৬ তারিখ সকাল থেকে তাঁর সঙ্গে বেতার-যোগাযোগের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন মন্ত্রিসভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত-অনুসারে আত্মসমর্পণ-অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে গ্রুপ ক্যাপ্টেন খোন্দকারকে নিযুক্ত করা হয়। জেনারেল অরোরার সঙ্গে তিনি বিমানে করে আসেন আগরতলায়, সেখান থেকে হেলিকপ্টারে ঢাকায়।

কর্নেল ওসমানী তখন সিলেট অঞ্চলে ছিলেন। শোনা যায়, তাঁর হেলিকপ্টার নিচ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময়ে পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে বিদ্ধ হয়। তাঁরা নেমে পড়তে বাধ্য হন। কর্নেল রব সামান্য জখমও হয়েছিলেন।

এদিকে আত্মসমর্পণের খবর শুনে আমি দ্রুত যাই প্রধানমন্ত্রীর অফিসঘরে। তাঁর অবসর হলে আমাকে ডেকে দিতে বলেছিলাম যাঁকে, ঘটনাধারার উত্তেজনায় তিনি তা ভুলে গিয়েছিলেন। এবারে সরাসরি প্রবেশ করলাম প্রধানমন্ত্রীর শয়নকক্ষে। সেখানে ব্যারিস্টার আমীরউল ইসলাম ও অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদকে দেখলাম, আরো কেউ কেউ ছিলেন। তাজউদ্দীন আমাকে দেখে বললেন, 'এতক্ষণে

AMARBOI.COM

এলেন!' আমি যে আগে থেকে এসে বসে আছি, সে কথাটাও তাঁকে ঠিকমতো বলতে পারলাম না। মুহুর্মুহু টেলিফোন আসছে, আমাদের লোকজন ও ভারতীয় বন্ধুরা আসছেন—অভিনন্দন জানাতে। সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন এসে দেখা করে গেলেন। বসলেন না বেশিক্ষণ।

এক ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'আমার বক্তৃতা লিখে দেবেন না?'

ওই ঘরের মধ্যেই একটা টেবিলের ধারে চেয়ার টেনে লিখতে বসলাম।

ঢাকা যে মুক্ত হয়েছে, বাংলাদেশ যে স্বাধীন হয়েছে, সেকথা কেউ মুখ ফুটে বলেননি আমাকে। আশপাশ থেকে আভাসে-ইঙ্গিতে আমি তা জেনে নিয়েছিলাম। এই বাস্তবতা একটু একটু করে সঞ্চারিত হয়েছিল আমার মনে এবং লেখায়। আমি অল্প কয়েকটি শব্দের বাক্যে, অল্প কয়েকটি বাক্যের অনুচ্ছেদে, অল্প কয়েকটি অনুচ্ছেদের একটি বক্তৃতার খসড়া তৈরি করলাম। বেশি কথা বলিনি। সবটা মিলে ফুলস্ক্যাপ সাইজের এক পৃষ্ঠার কম।

লেখা শেষ করে মুরশিদ সাহেবকে দিলাম। তিনি পড়ে তাজউদ্দীনকে দিলেন। তাজউদ্দীন অস্ফুটস্বরে বললেন, 'বেশি ছোট হয়ে গেল না?'

আমি বললাম, 'আমার তো মনে হয়, প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্যে ওই যথেষ্ট। দেশবাসীর উদ্দেশে আপনাকে তো অনেক কাজের কথা বলতে হবে। দু-একদিন পরে না হয় বড় বক্তৃতা দেবেন একটা। আজ বরঞ্চ কম কথা বলুন।'

প্রধানমন্ত্রী আর কিছু বললেন না। কী যেন ভাবতে থাকলেন। তারই মধ্যে লোকের আনাগোনা। খসড়া চূড়ান্ত হলো না।

খানিকক্ষণ পরে একটা টেলিফোন এলো—দিল্লি থেকে। তাজউদ্দীন কথা বললেন। তারপর আমার হাতে রিসিভার দিয়ে বললেন, 'লিখে নিন।'

বোঝা গেল, ওই প্রান্ত থেকে একজন লিখিত কাগজ পড়ছেন। তিনি যেমন বললেন, আমি তেমনি লিখে নিলাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের খসড়া।

খুব অবাক হলাম। এতকাল তো আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ভারতীয়দের কেউ লিখে দেননি, তাহলে এখন কেন? তাছাড়া, ওতে এমন কোনো কথা নেই, যা আমরা কেউ লিখতে পারতাম না।

লেখা শেষ করে ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিফোন রেখে দিলাম। খসড়াটা দিলাম তাজউদ্দীনের হাতে। তিনি তাতে একবার চোখ বুলোলেন, খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লেন বলে মনে হলো না।

আমার খসড়টা পকেটে ঢুকিয়ে ফেললাম। খানিক পরে সারওয়ার মুরশিদ ও আমি একসঙ্গে বেরিয়ে এলাম। ঘরের বাইরে পা দিয়ে উনিই প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন ইংরেজিতে : তবে কি আমরা নতুন বন্ধনে জড়াতে যাচ্ছি নিজেদের?

পরে মনে হয়েছিল, আমরা একটু বেশি দুশ্চিন্তা করেছিলাম এবং বৃথাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধানমন্ত্রী ভাষণে দিল্লির খসড়াটা ব্যবহার করেন নি। করলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। নিজের বক্তৃতা হয়তো নিজেই তিনি লিখেছিলেন, তবে অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়ার সম্ভাব্যতাই ছিল বেশি। কিন্তু এর ফলে যা হয়েছিল তা এই যে, ১৬ তারিখে আর জাতির উদ্দেশে তাঁর ভাষণ দেওয়া হয়নি। সে-রাতে শুধু অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রচারিত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা দেন ১৭ তারিখে।

আনন্দ-উত্তেজনা-চিন্তায় অবসন্ন দেহ মন নিয়ে অনেক রাতে বাসায় ফিরলাম। আমরা স্বাধীন, নিজবাসভূমে ফিরে যাবো নিঃশঙ্কায়—এই উপলব্ধি নিয়ে ঘুমোতে গেলাম।

বোধহয় ১৮ ডিসেম্বর সকালে ঘুম ভেঙেছিল বেবীর চিৎকারে : 'মুনীর ভাই নেই, গিয়াস ভাই নেই।' প্রথমে *স্টেটসম্যানে*, পরে *আনন্দবাজার পত্রিকায়* বেরিয়েছিল এই ভয়াবহ খবর—আল-বদরের হাতে ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যার বৃত্তান্ত। খানিক পরে মুনীর চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ সন্তান ভাষণ এলো—বাড়ি থেকে পালিয়ে সে যোগ দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে, কিন্তু সেখানে টিকতে পারেনি—সঙ্গীসাথীরা অনেকে সমালোচনা করেছে তার বাবার। এ কমাস বাবার জন্যে তার চিন্তার অবধি ছিল না। ভাষণের চোখ লাল, চুল উসকো-খুসকো। সে কী বলবে, কী করবে, কিছুই ঠিক করতে পারছিল না। তাকে কিছু বলার মতো শক্তি আমারও ছিল না। পরের দিন কাগজে বেরিয়েছিল রায়েরবাজারের বধ্যভূমির বিস্তৃত বর্ণনা। পাকিস্তানিদের পৈশাচিকতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরও তাদের দোসর আল-বদর বাহিনীর এই নৃশংসতার বিবরণ পড়ে শিউরে না উঠে পারিনি।

১৯ তারিখ দুপুরে অনিল সরকারের বাসায় বিজয়োৎসব পালনের জন্যে মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন ছিল। অনিল ডেকেছিল অনেককে। সেখানে গেলাম বটে, কিন্তু বিজয়ের আনন্দানুভূতি কেউ আর প্রকাশ করতে পারছিল না।

পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করলেও বাংলাদেশের শত্রুরা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন, বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার নিরাপত্তাবিধান তাঁরা করতে পারছেন না তখনো। চারদিকে অস্ত্রশস্ত্রের ছড়াছড়ি, বাংলাদেশবিরোধীরা তখনো সক্রিয়। ঢাকায় মন্ত্রিসভার আসন গ্রহণ করা জরুরি, অথচ তা হচ্ছে না। মুক্ত এলাকায় যতশীঘ্রসম্ভব বাংলাদেশের প্রশাসন চালু করা হয়েছিল। ১৮ তারিখের মধ্যে সব জেলায় প্রশাসক বা ডি সি নিয়োগ করা হয়। ওইদিন, ৭ ডিসেম্বরে নিয়োগপ্রাপ্ত, বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী মুখ্য সচিব (অ্যাকটিং সেক্রেটারি জেনারেল) রুহুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে সচিবদের একটি দল ঢাকায় আসেন বেসামরিক কেন্দ্রীয় প্রশাসন চালু করতে। মন্ত্রিসভা ঢাকায় আসেন ২২ ডিসেম্বর।

তার দিন দুই আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে পরিকল্পনা-কমিশনের সদস্যপদ ত্যাগ করে লেখা আমার চিঠিটা তাঁর হাতে দিই। তাতে লিখি যে, আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পূর্বপদে ফিরে যেতে চাই। আমার পদত্যাগপত্রে চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুলিয়ে একটু হেসে তাজউদ্দীন বলেন, 'এত তাড়া কেন, ঢাকায় গিয়েও পদত্যাগ করা যাবে।' আমি বললাম, 'ঢাকায় যেয়ে একবার প্রশাসনের মধ্যে ঢুকে পড়লে বের হওয়া কঠিন হবে।'

তাঁর সঙ্গে সেদিন আরো দুটো বিষয়ে কথা হয়েছিল। একটি ছিল বুদ্ধিজীবী-হত্যার প্রসঙ্গ ধরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দোসরদের শাস্তি দেওয়ার বিষয়। তিনি বলেছিলেন, চেষ্টার ত্রুটি হবে না, তবে কাজটি সহজ হবে না। আমি জানতে চাই, কেন। তিনি বলেন, যুদ্ধবন্দি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাউকে বিচার করা সম্ভবপর হবে বলে তিনি মনে করেন না। আমি আবার জানতে চাই, কেন। তিনি বলেন, মার্কিনদের চাপ আছে। তারা পাকিস্তানকে চাপ দিচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দিতে, ভারতকে চাপ দিচ্ছে যুদ্ধবন্দিদের ছেড়ে দিয়ে উপমহাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তুলতে। তিনি আরো বলেন, 'যুদ্ধবন্দিদের বিচারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইচ্ছুক নয়, এমন কি, ভারতও উৎসাহী নয়। এই অবস্থায় কার জোরে আপনি বিচার করবেন? আর মূল অপরাধীদের বিচার না করতে পারলে তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের বিচারের প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে যেতে বাধ্য।'

এদিকে যশোর মুক্ত হওয়ার পর থেকে সীমান্তের দুদিকে যে লোক-চলাচল শুরু হয়েছিল, ১৬ ডিসেম্বরের পরে তা বাড়তে থাকে। খুলনা থেকে আসা পরিচিতজনেরা কেউ কেউ অভিযোগ করলো, ভারতীয় সেনারা কলকারখানার যন্ত্রপাতি কিংবা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণসামগ্রী খুলে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের ইচ্ছে, আমি বিষয়টা যেন আমাদের সরকারের গোচরে আনি। প্রধানমন্ত্রীকে বললাম সেকথা। তিনি বললেন, এরকম অভিযোগ পেলে আমি যেন বিস্তৃত বর্ণনাসমেত বাংলাদেশ সরকারকে লেখা একটি চিঠি নিয়ে রাখি। পরে, আমার কাছে যারা অভিযোগ করেছিল তাদের বলেছিলাম, লিখিত অভিযোগ পেশ করতে। তারা আমার পরামর্শ নেয়নি।

তখন আমার একটা কথা মনে হয়েছিল, এখনো মনে হয়, ভারতীয় সেনাদের সম্পর্কে সম্পদ-অপহরণের বর্ণনা অনেক শুনেছি, কিন্তু তাদের প্রাণদানের কথা কি বীরত্বগাথার কথা শুনেছি খুব কম।

দেশ স্বাধীন হয়েছে—এবার আমার ঘরে ফেরার পালা। রাস্তাঘাট মেরামতের জন্যে কিছু সময় দিতে হবে, নিজেরও কিছু গোছগাছ করতে হবে। অনিল আর অনিরুদ্ধ বলল, আমরা ফিরে যাওয়ার আগে একবার একসঙ্গে বাংলাদেশ দেখে আসতে চায়।

২৩ ডিসেম্বর সকালে রওনা হলাম যশোরে। আজিজের গাড়িতে আজিজ, সুবা ভাই এবং অনিরুদ্ধের ছোট ভাই চন্দন। আমার গাড়িতে অনিল, অনিরুদ্ধ আর আমি। সীমান্ত পেরোবার মুহূর্তে কী যে রোমাঞ্চ আমাদের! যশোরে গিয়ে উঠলাম সার্কিট হাউজে। জায়গা পেতে অসুবিধে হলো না। খাওয়ার ব্যবস্থা আরো চমৎকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিথি তিনজনই খুশি। তাদের আতিথেয়তার সুযোগ পেয়ে খুব ভালো লাগল।

যশোরে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে গেলাম। যতদূর মনে পড়ে, ক্যাপ্টেন নূরুল হুদা (যিনি ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে নিহত হন) সেখানকার দায়িত্বে ছিলেন। আমার পরিচয় দেওয়ায় চিনলেন। আমি খুলনায় যেতে চেয়েছিলাম। তিনি সন্ধ্যার পরে দূর পাল্লার যাত্রা নিষেধ করলেন। কোথায় কখন কী ঘটে, বলা যায় না। তারপর বললেন, তিনি অপেক্ষা করছেন মেজর আবদুল জলিলকে ধরার জন্যে—তিনি এই পথে আসতে পারেন।

চমকে উঠলাম। মেজর জলিলকে জানি সেক্টর কম্যান্ডার হিসেবে। মাত্র সাতদিন হলো আমরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছি। এখনই সেক্টর কম্যান্ডারদের একজনকে বন্দি করার আদেশ দেওয়া হয়েছে তাঁর অধস্তন কর্মকর্তাকে! ক্যাপ্টেন হুদা বললেন, ১০/১১ তারিখের দিকে এ আদেশ দিয়েছেন প্রধান সেনাপতি—মেজর জলিল তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছেন বলে।

রাতটা মন খারাপ করেই কাটলো। পরদিন সকালে একাই খুলনা রওনা হলাম। সেখানে আমার মেজ বোন, দুলাভাই ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা আছে। যুদ্ধের ক মাসের মধ্যে বড় ভাগ্নিটির বিয়েও হয়েছে। তাদের একবার দেখে আসবো।

গেলাম। এ যেন পরিবারের নিরুদ্দিষ্ট সদস্যদের পুনর্মিলন!

খুলনায় নতুন জেলা প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছেন কামাল সিদ্দিকী। এক ফাঁকে তাঁর সঙ্গেও দেখা করে এলাম। তাঁর মুখে শুনলাম দুটি অভিযোগ। একটি ভারতীয় সেনাদের সম্পদ-অপহরণের, অন্যটি মেজর জলিল ও তাঁর মুষ্টিমেয় সহযোদ্ধার বিরুদ্ধে অবাঙালিদের সম্পত্তি লুঠপাট ও অবাঙালি মেয়েদের প্রতি অত্যাচারের। কামাল সিদ্দিকী বললেন, এ দুটি বিষয় সম্পর্কে তিনি সরাসরি অবহিত করেছেন ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এড়িয়ে একজন ডি সি-র পক্ষে দেশের ও বিদেশের প্রধানমন্ত্রীকে এরকম চিঠি লেখা পরে শৃঙ্খলাভঙ্গের সামিল বিবেচিত হয়েছিল এবং এ নিয়ে অনেক গোলযোগ হয়েছিল।

আমার কিন্তু হতবাক ও হতোদ্যম হওয়ার পালা! এসব আবার কী আরম্ভ হলো! খুলনা থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম যশোরে। সবাই আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সকলকে নিয়ে বেশ একটু রাত করেই কলকাতা ফিরে এলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির দপ্তরে ভিড় লেগে গেছে। শরণার্থী শিক্ষকেরা দেশে ফিরে যাবেন। তাঁদের বেশির ভাগেরই আর্থিক সাহায্য দরকার। ফিরে যাওয়ার খরচ আছে, গিয়ে ঘরবাড়ি চালচুলোর কী অবস্থা দেখবেন, কে জানে! কিছু সহায়-সম্বল নিয়ে যাওয়া ভালো। সমিতিরও অঢেল টাকা নেই। মাঝে মাঝে দরদস্তুরও হচ্ছে। এন সি সি-র ক্যাপ্টেন পি ডি (প্রিয়দর্শন) সেনশর্মা আর নিতান্ত সাদাসিধে যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এঁদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন।

এরই মধ্যে সেনশর্মা গলা নামিয়ে বললেন, 'কথা আছে আপনার সঙ্গে।' কী কথা? 'বাংলাদেশ থেকে যাঁরা এসেছেন ১৯৭১ সালে, তাঁরা দেশে ফিরে যাবেন— এ তো খুব স্বাভাবিক। কিন্তু তার আগে যাঁরা পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুত্যাগ করে এসেছিলেন, তাঁরা যদি ফিরে যেতে চান, তো আপনারা কী করবেন?'

সেনশর্মা, আগেই বলেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এসসি পাশ করেছিলেন ১৯৫৩ সালে, বোধহয় তাঁরা বাস্তুত্যাগ করেছিলেন ১৯৫৪ সালে। উনি কি নিজের কথাই বলছেন?

আমতা-আমতা করে বলি, 'একটা সময় ধরে তো ডিভাইডিং লাইন টানতে হবে। ৪৭ সালের রিফিউজি তো আর ওই অর্থে রিফিউজি নেই, এ দেশেরই নাগরিক। ৬৪র দাঙ্গায় যাঁরা পীড়িত হয়ে চলে এসেছিলেন, তাঁরা যেতে চাইলে হয়তো ভেবে দেখা যেতে পারে।'

'কেন মশাই? এই যে এক কোটি শরণার্থী এবারে এসেছে, এদের বেশির ভাগ তো হিন্দু। এরা যদি ৬৪র পরে রয়ে যেতে পারে, অন্যেরা পারলো না কেন? যে এসেছে, সে একটা কনশাস চয়েস করে এসেছে। এখানে এসে কান্নাকাটি করেছে, সুবিধে চেয়েছে, কোথাও কোথাও সুবিধে পেয়েছেও। আজ যদি তার ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হয়, আপনারা মানবেন কেন? আপনার সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের

যোগাযোগ আছে, তাই বলছি। ৭১এর আগে–আসা একটি লোককেও ফিরিয়ে নেবেন না। নিলে এমন পরিস্থিতি হবে যে সামাল দিতে পারবেন না। কমিউনাল টেনশন যে কী পরিমাণ বেড়ে যাবে, ভাবতেও পারবেন না। সাবধান, খুব সাবধান। শক্ত হয়ে থাকতে হবে।'

অধ্যাপক এ ডব্লিউ (আবদুল ওয়াহেদ) মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেছিলেন ১৯৩২ সালে। ইতিহাসে অনার্স ও এম এতে প্রথম শ্রেণী অর্জন করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু হয়েছিলেন একাধিক খেলায়। সরকারি কলেজে প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ লাভ করেছিলেন নিতান্ত অল্প বয়সে। বাচ্চু মিয়া নামে সুপরিচিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এই সন্তান দেশবিভাগের সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করতেন— তিনি (এবং তাঁর ছোটভাই, ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের সদস্য এ ডব্লিউ মাসুদ) ভারতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যরূপে তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী সমর্থক। এখন তিনি আমার সামনে ঘোষণা করলেন, বাংলাদেশে ফিরে আসবেন। সুললিত ইংরেজিতে খুব সোজা যুক্তি দিয়েছিলেন তিনি : আমি কখনো পাকিস্তান চাইনি, চাইনি কোনো সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের নাগরিক হতে। তাই দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলাম। এখন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমার জন্মভূমি হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। আমি সেখানে ফিরে যাবো—এ আমার জন্মগত অধিকার।

অনিরুদ্ধ গিয়েছিল পাড়ার সেলুনে চুল ছাঁটাতে। নরসুন্দর খবর রাখে যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে অনিরুদ্ধের একটা সম্পর্ক আছে। চুল ছাঁটতে ছাঁটতে সে জিজ্ঞেস করে, 'বাবু, বাংলাদেশে কি ফিরে যাওয়া যাবে ?' অনিরুদ্ধ বলল, 'সে কি! তুমি যে বাংলাদেশের লোক, তা তো আগে শুনিনি।' নাপিত হেসে বলে, সে বাংলাদেশের বই কি! অমুক জেলার অমুক গ্রামে এখনো তার পৈতৃক ভিটে রয়ে গেছে। অনিরুদ্ধ উপদেশ দেয়, 'শোনো, বাংলাদেশে গিয়ে বাড়িঘর ফিরে পাবার স্বপ্ন দেখো না। ওরা কেমন লোক বুঝতে পারছো না ? জাতভাই হওয়া সত্ত্বেও পাঞ্জাবিদের মেরে তাড়িয়ে দিলে। তুমি যদি এতোকাল পরে ফিরে গিয়ে ভিটেমাটির ভাগ চাও, তোমার কী অবস্থা হবে, বুঝতে পারছো ?'

নাপিত বেচারার আর বাংলাদেশে ফেরা হয়নি। তবে অধ্যাপক মাহমুদ বাংলাদেশে সত্যিই এসেছিলেন, যদিও ভারতীয় হিসেবে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪, বছর দুই ইতিহাস বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপরে কলকাতায় ফিরে যান। এখন তিনি আর নেই। ১৯৯৪ সালের গোড়ার দিকে কলকাতার পি জি হাসপাতালের রোগশয্যায় তাঁকে শেষবারের মতো দেখি।

আমাকে প্রধানমন্ত্রী খবর পাঠালেন ঢাকায় যেতে। থিয়েটার রোডের বাড়িতে তখনো বাংলাদেশ সরকারের একটা ছোটখাটো অফিস ছিল। খবর এলো তাঁদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধ্যমে। ভারতীয় কর্মকর্তাদেরও একজন ফোন করে জানালেন, পরদিন ঢাকাগামী বিমানে একটা আসন রাখা হয়েছে আমার জন্যে।

কিন্তু কলকাতায় পরিবার ফেলে এতোদিন পরে একলা দেশে ফিরতে ইচ্ছে হলো না। মনে একটা ভয়ও ছিল, একা ঢাকায় একবার এসে পড়লে আবার কখন ওদের আনতে কলকাতায় যেতে পারবো, তা অনিশ্চিত হয়ে যাবে। সুতরাং আবারো মাফ চেয়ে নিলাম।

এখন বন্ধুবান্ধব–আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পালা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সম্পাদক দিলীপকুমার চক্রবর্তী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, 'দেশে ফিরে যাচ্ছেন— হাতে কিছু টাকাপয়সা রাখা দরকার। সমিতি যে–সামান্য টাকা দিতে পারে, আপনাকে তা নিতে বলতে পারি না। তাই, এই হাজার পাঁচেক টাকা ঋণ হিসেবে নিন, পরে এক সময়ে পাঠিয়ে দেবেন।' এই বলে হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিলেন।

এরকম পরিস্থিতিতে অভিভূত না হয়ে পারে, এমন পাষণ্ড কে আছে! টাকাটা সমিতিরই ছিল, কিন্তু তিনি ধার দিয়েছিলেন নিজের দায়িত্বে। বোধহয় জুন মাসের দিকে, দিলীপদা ঢাকায় এলে, এই ঋণ পরিশোধ করেছিলাম।

দরকার হতে পারে ভেবে একটা সরকারি আইডেনটিটি–কার্ড করিয়ে নিলাম। বাংলাদেশ মিশনের প্রথম সচিব আর আই চৌধুরীর স্বাক্ষরে এই মর্মে একটা কাগজ লিখিয়ে নিলাম যে, আমি, আমার স্ত্রী ও দুই কন্যা বাংলাদেশের নাগরিক; ভারতে শরণার্থী ছিলাম, এখন দেশে ফিরে যাচ্ছি। বোধহয় আজিজও এমন একটা কাগজ সংগ্রহ করেছিল। সব কাজই সম্পন্ন করেছিলাম, কেবল শরণার্থী হিসেবে যে রেশন–কার্ড করেছিলাম, সেগুলো সানু চাচার হাতে দিয়ে এসেছিলাম জমা দেওয়ার জন্যে। পরে শুনেছি, রেশন অফিসে এতে বাংলাদেশের মানুষজন সম্পর্কে আস্থা একটু বেড়েছিল।

৫ জানুয়ারি সকালে আজিজ ও আমি যার যার গাড়িতে পরিবার নিয়ে কলকাতা থেকে খুলনার পথে রওনা হলাম।

সীমান্ত পেরিয়ে একবার গাড়ি থামালাম। নেমে বেবী ও আমি দেশের মাটি নিলাম দুহাত ভরে।

দুপাশের বাড়িঘরে গোলাগুলির চিহ্ন; ভাঙা পুল; ডাইভারশন; পাকিস্তানিদের তৈরি করা বাংকার; ভারতীয় বা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ছোটখাটো ছাউনি। লোকজন কিছু ফিরছে তখনো। বিধ্বস্ত ঘরের পাশে নতুন ঘর বাঁধছে। দোকানপাট সাজাচ্ছে নতুন করে।

যশোরে নতুন ডি সি ওয়ালিউল ইসলামকে আগের বারে পাইনি— এবারে দেখা করে এলাম কয়েক মিনিটের জন্যে। তাঁর পূর্বাধিকারী রশিদুল হাসানের সঙ্গেও দেখা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যশোর থেকে খুলনার পথে—যতদূর মনে পড়ে, ফুলতলার কাছাকাছি—দেখলাম, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত একটি ট্যাংক তখনো পড়ে আছে।

খুলনায় বোনের বাড়িতে থাকলাম দু দিন। ডি সি কামাল সিদ্দিকীর সঙ্গে আবার দেখা হলো। প্রচণ্ড চাপের মধ্যে কাজ করছেন, মেজাজ ঠিক রাখতে পারছেন না।

৮ তারিখ সকালে আবার দুই গাড়ির বহর ঢাকার পথে। এবারে দুলাভাইও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। ঢাকার পথ অনেক বেশি দুর্গম মনে হলো। ভাঙা হার্ডিন্জ ব্রিজের নিচ দিয়ে ফেরিতে পার হলাম। কোথাও নৌকা জুড়ে পন্টুনের মতো করা হয়েছে, তার উপর দিয়ে গাড়ি পার করার ব্যবস্থা। কোথাও ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে মজুররা কাজ করছে তখনো, ইট জোগাচ্ছে গাড়ির চাকার নিচে। জায়গায় জায়গায় অনেকক্ষণ দেরি করতে হচ্ছে— বেশ ভিড় জমে গেছে। যেসব জায়গায় এমন ভিড়, সেখানে দোকানও খুলে দিয়েছে কেউ কেউ। দোকানে রেডিও বেজে চলেছে সর্বক্ষণ।

তখনো সন্ধ্যা হয়নি। এইরকম অপেক্ষায় আছি অনেকে। হঠাৎ জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য, উল্লাস, 'জয় বাংলা' ধ্বনি।

কী হয়েছে? বেতারের সংবাদ : বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়েছেন পাকিস্তানের কারাগার থেকে। তিনি রাওয়ালপিন্ডি থেকে রওনা হয়েছেন অনির্দিষ্ট গন্তব্যের পথে। সেই মুহূর্তে কী আনন্দ আমাদের! সকলে সকলকে জড়িয়ে ধরছেন। কেউ জয়ধ্বনি করছেন, কেউ কেঁদে ফেলছেন। অনতিবিলম্বে সেই অনির্দিষ্ট গন্তব্যের পরিচয়ও উদ্‌ঘাটিত হলো : লন্ডন।

বঙ্গবন্ধুর মুক্তিলাভের পটভূমিটি পাঠককে সংক্ষেপে মনে করিয়ে দেওয়া হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

যুদ্ধ শুরু করার পরে ইয়াহিয়া খানের আন্তরিক বাসনা যখন পূর্ণ হওয়ার লক্ষণ দেখা দিল না, তখন তিনি বাধ্য হয়েই ৭ জানুয়ারিতে পাকিস্তানে বেসামরিক প্রশাসনের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার ঘোষণা দিলেন। নতুন প্রশাসনে পি ডি পি-নেতা নূরুল আমিন হলেন প্রধানমন্ত্রী, আর পি পি পি-নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জানালেন, যুদ্ধ চলছে বলে কেবল কেন্দ্রেই এখন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলো। এর পরদিন পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে ভুট্টো গেলেন জাতিসংঘে। সেখানে বেশ নাটক করলেন তিনি, কাগজপত্র ছিঁড়তে ছিঁড়তে বেরিয়ে এলেন সাধারণ পরিষদের অধিবেশন থেকে। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের যুদ্ধবিরতি-ঘোষণার পরে পাকিস্তানি সামরিক নেতারা একজোট হয়ে ইয়াহিয়া খানকে পদত্যাগে বাধ্য করলেন এবং ১৭ তারিখেই ভুট্টোকে আমন্ত্রণ জানালেন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা গ্রহণ করতে। জাতিসংঘ থেকে ছুটে এসে ১৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখে ভুট্টো রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং জাতির উদ্দেশে তাঁর ২০ তারিখের ভাষণে বললেন, পূর্ব পাকিস্তান তাঁর দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ২২ তারিখে বঙ্গবন্ধুকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে গৃহবন্দী করা হয়েছে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়। এর দুদিন পরে ভুট্টো সাক্ষাৎ করেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। বঙ্গবন্ধুকে তিনি অনুরোধ করেন, পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে ন্যূনতম যোগসূত্র বজায় রাখতে। বঙ্গবন্ধু তাঁকে বলেন, দেশে ফিরে না গিয়ে, প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ না করে, তিনি কোনো কথা বলতে পারছেন না। জানুয়ারির ৩ তারিখে করাচিতে এক বিশাল জনসভায় ভুট্টো শ্রোতাদের মত চান বঙ্গবন্ধুকে শর্তহীনভাবে মুক্তিদানের বিষয়ে। উপস্থিত জনসাধারণ এতে সম্মতিজ্ঞাপন করেন। ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করেন।

ওই ৮ জানুয়ারি আমরা যখন ঢাকায় এসে পৌঁছোলাম, তখন রাত অনেক হয়েছে। প্রথমে গেলাম স্বামীবাগে—আমার শ্বশুরবাড়িতে। আমার শ্বশুর আবদুল ওয়াহাবকে দেখলাম, কেমন বদলে গেছেন এই ক মাসে। আশ্চর্য নয় যে, ১৯৭১ সম্পর্কে যে-বই উনি লিখেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন, *ওয়ান ম্যান'স অ্যাগনি* (ঢাকা, ১৯৭২) : এটি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর শহীদ ভ্রাতাকে। আজিজরা স্বামীবাগে রয়ে গেল। সেখানেই খবর পেলাম, আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু ও সহকর্মী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক গিয়াসউদ্দিন আহমদের শার্ট দেখে তার লাশের খানিকটা শনাক্ত করা গেছে এবং পরদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ-প্রাঙ্গণে তা সমাধিস্থ করা হবে।

স্বামীবাগ থেকে এলাম ঠাটারিবাজারে— পিতৃগৃহে। দেখি, একতলা লোকে লোকারণ্য। পাড়ার বেশ কয়েকটি এবং পাড়ার বাইরের একটি অবাঙালি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে আমাদের বাড়িতে। আমরা ফিরে এসেছি জেনে, মনে হয়, তাদের দুশ্চিন্তা একটু বেড়েছিল।

এই ন মাসের অনেকখানি সময় আমার ছোট ভাই আখতারকে পালিয়ে থাকতে হয়। আখতারের একটা ছোট প্রেস ছিল বাড়ির নিচতলায়। নির্বাচনের সময় থেকে তাতে আওয়ামী লীগের স্থানীয় কমিটি অনেক কিছু ছাপিয়েছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হলেও, অনেকের মতো, ওই সময়টায় কিংবা অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে আখতারও ঝুঁকেছিল আওয়ামী লীগের দিকে। এপ্রিলের ১ তারিখে তার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই পাড়ার কিছু অবাঙালি লোকজন তার বিরুদ্ধে লেগে যায়। পাড়ার মুরুব্বি হিসেবে আব্বা যদিও তাদের কোপানল এড়াতে সমর্থ হন, কিন্তু আখতারকে পালিয়ে যেতে হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সে বাড়ি ফিরে আসে।

আমাদের বাড়ির পাশে ছিল এক পূজামণ্ডপ। তার পাশের বাড়ি বিহারিদের। সে-বাড়ির সকলেই আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু আখতারেরই প্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমবয়সী সে-বাড়ির বড়ো ছেলে মাহবুব ১৬ ডিসেম্বরের পরে ভয়ে পালিয়ে যায়। তার বিধবা মা নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের জন্যে কেবল অশ্রুবর্ষণ করতে থাকেন।

আব্বার সঙ্গে দেখা হলো এক বছর পর। আখতারের ছেলেকে প্রথম দেখলাম তার আট মাস বয়সে। আব্বা বললেন, স্বাধীন বাংলা বেতার-কেন্দ্রে যেদিন তিনি শোনেন যে, ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে আমি ছিলাম, সেদিন নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ভয় পাওয়ার বদলে তাঁর খুব গর্ব হয়েছিল এই মনে করে যে, তাঁর ছেলে দেশের জন্যে কিছু করছে। আব্বার বয়স তখন ৭৪ বছর। তিনি আমাদের বাড়ির মধ্যে গুলি করার বৃত্তান্ত বললেন; এরফান যে এখনো পঙ্গু হয়ে রয়েছে সে-খবর জানালেন; প্রতিবেশীদের একজনকে পাকিস্তানি সেনারা গুলি করে রাস্তায় ফেলে রেখেছিল এবং তার লাশ সরাতে নিষেধ করেছিল, সে-ঘটনার কথা বললেন; তারপর বাঙালিরা প্রায় সকলেই যে পাড়া ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাও জানালেন।

৯ তারিখ সকালে এলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ-প্রাঙ্গণে। বন্ধু ও সহকর্মী অনেকের সঙ্গে দেখা হলোঃ বাংলা বিভাগের রফিকুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সমাজবিজ্ঞানের সাদউদ্দীন, গণিতের শহীদুল্লাহ। আমাদের বন্ধু ও গিয়াসউদ্দিনের ভগ্নিপতি নূরুল হক তো ছিলেনই, আরেক বন্ধু মশিহুর রহমানও ছিল। যাঁদের লাশ বা মরদেহের অংশবিশেষে পাওয়া গিয়েছিল, তাঁদের জানাজা হলো, তারপর মসজিদ-প্রাঙ্গণে গোর দেওয়া হলো। আমার দুই শিক্ষক মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর লাশ পাওয়া যায়নি। গিয়াসের খণ্ডিত মরদেহ পাওয়া গিয়েছিল; আনোয়ার পাশা, রশীদুল হাসান ও আবুল খায়েরের লাশ পাওয়া গিয়েছিল। সব কিছুর শেষে প্রায় সবাই যখন চলে গেলেন, তখন আমি গিয়াসের কবরের কাছে বসে পড়ে কেঁদে ফেলি। বন্ধুরা কেউ কেউ আমাকে ধরে উঠিয়ে নিয়ে যান।

ওইদিনই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তখন বোধহয় তিনি দেশের সবচাইতে ব্যস্ত মানুষ— সেই ব্যস্ততার মধ্যেও কথা হলো। আমি আগে আসিনি বলে কোনো অনুযোগ করলেন না, তবে তাঁর বিচিত্র অনুভূতির কিছুটা পরিচয় দিলেন : দেশের সমস্যার বিপুলতা, পুনর্বাসন-প্রয়াসের প্রাথমিক সাফল্য, বেআইনি অস্ত্রের ভয়, স্বাধীন দেশের মানুষের বড়োরকম প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার বৈপরীত্য, প্রশাসন ও দলের মধ্যে তাঁর অভিপ্রায়বিরোধী কাজ, বঙ্গবন্ধুর মুক্তিতে স্বস্তি, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুটা উৎকণ্ঠা, কিছুটা সংশয়।

আমি নিজেই দেখলাম, অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কতোজন, নবাবপুরে-ঠাটারিবাজারে দোকান লুঠ হচ্ছে—পুলিশের সাহায্য চেয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। 'দেখে নেবো' ভাবটা বেশ পরিব্যাপ্ত।

আমাদের বাড়ির আশ্রয়প্রার্থীরা সময় ও সুযোগমতো চলে যেতে শুরু করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহবুবের মা আমার সাহায্যে যেতে চান মীরপুরে—আত্মীয়ের বাড়িতে। বিহারি-অধ্যুষিত অঞ্চলে আমার যাওয়াটা বাড়ির কারো অভিপ্রায় নয়। তবু কথা দিলাম, পরিদিন নিয়ে যাবো।

১০ তারিখে সূর্যোদয় হলো অনেক প্রত্যাশা নিয়ে। এদিনে বঙ্গবন্ধু ফিরে আসবেন। একবার ভেবেছিলাম, বিমানবন্দরের দিকে যাবো। পরে ভাবলাম, বেতারেই বরঞ্চ শুনি তাঁর প্রত্যাবর্তনের ধারাভাষ্য, তারপর যাবো তাঁর জনসভায়। তাই করলাম। ৭ মার্চ ঢাকায় ছিলাম না, কিন্তু ১০ জানুয়ারির মতো বড়ো সমাবেশ আমি কখনো দেখিনি। বঙ্গবন্ধুকে দেখলাম দূর থেকে। তিনি যেন এই কমাসে খানিকটা কৃশ হয়েছেন, কিন্তু কণ্ঠের তেজ বিন্দুমাত্র কমেনি। তিনি এই জনসভায় জানিয়ে দিলেন ভুট্টোকে : কোনো বন্ধন নয় আর পাকিস্তানের সঙ্গে; বাংলাদেশ স্বাধীন—এর রাষ্ট্রীয় নীতি ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র।

জনসভায় এতো লোক, কিন্তু কোনো বিশৃঙ্খলা নেই কোথাও। সভাশেষে শেরওয়ানি-টুপি-পরা এক ভদ্রলোককে কিছু ছেলে ঘিরে ধরেছিল—পরিচয় জানতে চায়, তার প্রমাণ চায়। কিন্তু শেষ অবধি বিনা গোলযোগেই ছেড়ে দিল তাঁকে। এতো মানুষের সুশৃঙ্খল আচরণ দেখে ভরসা হলো, আমরা ব্যর্থ হবো না, এতো ত্যাগ বিফল হবে না।

রাত একটু গভীর হলে মাহবুবের মা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের আমার গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে মীরপুরে চললাম। ওই রাতে তরুণ অস্ত্রধারীদের অধিকাংশই বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তনে আনন্দ-উল্লাসে ব্যস্ত। পাড়ায় তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এই সুযোগে আশ্রয়প্রার্থীদের নিয়ে নিরাপদে বের হওয়া গেল। মীরপুরের কাছাকাছি গিয়ে সকল ইন্দ্রিয় সজাগ করে রাখলাম, নিজের নিরাপত্তার চিন্তা মনে এলো। এক জায়গায় ভারতীয় সেনারা গাড়ি থামালেন, গন্তব্য জানতে চাইলেন। ব্যাখ্যা করলাম। তাঁরা আমাকে যেতে দিলেন, তবে বড়ো রাস্তা ছেড়ে ভেতরে যেতে নিষেধ করলেন। বড়ো রাস্তার ওপরেই যাত্রীদের নামিয়ে দিলাম। আর ভেতরে ঢুকতে সাহস হচ্ছিল না, ওঁরাও তেমন জোর করলেন না।

বাসার সামনে পৌঁছে দেখি দোতলার বারান্দায় ওই মধ্যরাত্রিতে উৎকণ্ঠিতচিত্ত আব্বা এবং আর সবাই দাঁড়িয়ে— আমার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায়।

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ঘণ্ট

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~